বঙ্গভূমিকা

খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০—১২৫০ খ্রীষ্টপর

শ্রীসুকুমার সেন

ইস্টার্ন পাবলিশার্স
৮-সি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক
শ্রীশেফালিকা রায়
ইস্টার্ন পাবলিশার্স
৮-সি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৮

মুদ্রাকর
শ্রীঅবনীকুমার দাস
লক্ষ্মীশ্রী মুদ্রণ-শিল্প
৪৫ রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৯

বঙ্গভূমির ইতিহাস-রঙ্গপটে বঙ্গসন্তানের ভূমিকা প্রেক্ষণের চেষ্টা হ'য়েছে এই বইটিতে, তাই নাম দেওয়া হ'ল বঙ্গভূমিকা। নূতন উপাদান এমন কিছু উপস্থাপিত হয় নি, তবে নূতন দৃষ্টিতে পুরানো উপাদানের বিশ্লেষণ কিছু কিছু আছে। অমূলক কিছুই বলা হয় নি, তবে সব সিদ্ধান্তের ও উক্তির মূল সমান পোক্ত না হ'তে পারে।

গ্রন্থ মধ্যে ঋণ-স্বীকার আছে। তবে যে-সব বই বিশেষভাবে কাজে লেগেছে সেগুলির নাম এখানে করা হ'ল।

গৌড়লেখমালা প্রথম খণ্ড, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, রাজশাহী, ১৩১৯

বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম খণ্ড, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৩২১

Inscriptions of Bengal Vol. III, Nanigopal Majumdar, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, রাজশাহী, ১৯২৯

Select Inscriptions, D. C. Sircar, Calcutta University, 1942

The History of Bengal, Vol. I, Ed. R. C. Majumdar, Dacca University, 1943

Copper-plates of Sylhet, Kamalakanta Gupta, Sylhet

দৈবনিবন্ধনবশত নিদর্শনে প্রথম দুটি চিত্র শেষ পর্যন্ত দিতে পারা গেল না

কালের সোপানে	...	৩-১৪২
ধর্মে	...	১৪৫-৯৬
বিদ্যায় সাহিত্যে শিল্পে	...	১৯৯-২৬৪
সমাজে সংসারে	...	২৬৭-৩০৬
নিদর্শনে	...	৩০৮-২৯
সংযোজন-সংশোধন	...	৩৩৩-৩৬
শব্দসূচি	...	৩৩৭
নির্ঘণ্ট	...	৩৩৮-৩৪৩

কালের সোপানে

১

দেশনাম

ভাষা নিয়ে জাতি, জাতি নিয়ে দেশ। বাংলা ভাষার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী জাতির ইতিহাস শুরু। কিন্তু বাংলা ভাষার পূর্ব-ইতিহাস আছে। এ ভাষা পূর্ববর্তী একটু অন্যরকম ভাষা থেকে উৎপন্ন, এবং সে ভাষাও প্রাচীনতর ভাষা থেকে উদ্‌গত হয়েছিল। এইভাবে বাংলা ভাষার সূত্র ধরে পিছিয়ে গেলে আমরা পৌঁছই সংস্কৃত ভাষায়। সংস্কৃত ভাষার সূত্র অনুসরণে পিছু হটলে আমরা পেরিয়ে যাই ভারতবর্ষের সীমানা। তার সঙ্গে বঙ্গভূমির ইতিহাসের সম্পর্ক নেই, বলাই ভালো। সংস্কৃত বাংলা দেশের আদিম ভাষা নয়। (আদিম ভাষা নিশ্চয়ই একটা অথবা অনেকগুলি ছিল কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত নই।) মাতৃভাষা সংস্কৃত নিয়ে (—এখানে 'সংস্কৃত' নামটি সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ পাণিনি-নিয়ন্ত্রিত ভাষা বুঝলেই চলবে না, বৈদিক এবং বৈদিকেতর প্রাচীন রূপও বুঝতে হবে—) যাঁরা এদেশে প্রথম উপনিবিষ্ট হয়েছিলেন তাঁরাই বাঙালীদের সাক্ষাৎ পূর্বতর পুরুষ। তার আগে এদেশে যদি কোন জাতি থেকে থাকেন (—থাকার সম্ভাবনাই সমধিক—) তাঁরা উপনিবিষ্ট দলের মধ্যে মিশে গেছেন। তাঁরাও আমাদের পূর্বপুরুষ, তবে অজ্ঞাতকুলশীল। এঁদের সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদেরা আলোচনা করেছেন। সে আলোচনা আমাদের এই ইতিহাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে কোন কোন স্থানে মাটির ভিতর থেকে খুব প্রাচীন জনবসতির সন্ধান পাওয়া গেছে। সেখানে যে প্রত্নবস্তু মিলেছে তার থেকে অনুমান করা যায়, এঁরা ধান চাষ করতেন এবং মৃৎপাত্র গড়তেন। এঁরা কতদিন আগে বর্তমান ছিলেন তা এখনও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে নির্ধারিত হয়নি। সুতরাং এই

বঙ্গভূমির পূর্বদিকের ভূখণ্ড সেকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে পরিচিত ছিল। কামরূপ প্রাগ্‌জ্যোতিষের অন্তর্ভুক্ত একটি স্বতন্ত্র 'বিষয়' বলে গণ্য হয়েছিল পরবর্তী কালে। প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামটি প্রথমে কোন সুনির্দিষ্ট ভূভাগ বোঝাত না। বোঝাত পূর্বদিগন্তভূমি। তার সঙ্গে অন্য একটু ব্যঞ্জনারও স্পর্শ ছিল। জ্যোতিষ্ (জ্যোতিঃ) শব্দটির একটি অর্থ অগ্নি। (অসমিয়া ভাষায় 'জুই' মানে অগ্নি।) নামটির পিছনে একটি প্রাচীন (বৈদিক) গল্প আছে। পৃথিবীর অধিকার নিয়ে অসুরদের সঙ্গে দেবতাদের একদা যুদ্ধ হয়েছিল। অসুরেরা ছিল মানসিক বলে বলীয়ান্ আর দেবতারা ছিল অগ্নিযজ্ঞ বলে শক্তিমত্তর। যজ্ঞের অগ্নি সামনে রেখে যুদ্ধ করতে করতে দেবতারা অসুরদের পূবদিকে হটিয়ে দিতে থাকে। অবশেষে তারা "সদানীরা" নদীর ওপারে চ'লে যায়। যজ্ঞাগ্নিকে কিন্তু সদানীরার ওপারে নিয়ে যাওয়া গেল না। অতএব সদানীরা নদীর এপার পর্যন্ত ভূমি যজ্ঞাগ্নিপূত আর্যনিবাস ব'লে গণ্য হ'ল। নদীর ওপার রইল যজ্ঞক্রিয়া-বিহীন অসুরদের নিবাসভূমি। "সদানীরা"র এই ওপারই 'প্রাগ্-জ্যোতিষ' অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নির সীমান্তভূমির পূর্বদিগ্‌বিভাগ। "সদানীরা" বলতে কোন্ নদী তা নিয়ে পণ্ডিতেরা কিছু মাথা ঘামিয়েছেন। অনেকে মনে করেন এই নদী গণ্ডক। কিন্তু ঘটনাটি নিছক গল্প, আর সদানীরা বলতে এমন যে কোন নদী বোঝায় যাতে বারো মাস জল থাকে। পূর্বভারতের পক্ষে এ নাম গঙ্গার ও ব্রহ্মপুত্রের পক্ষেই সব চেয়ে বেশি খাটে। কালিদাসের সময়েও এদিকে প্রাগ্‌জ্যোতিষের সীমা ছিল ব্রহ্মপুত্র। রঘু ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে তবে প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতিকে আক্রমণ করেছিলেন। কালিদাসের বর্ণনা থেকে (রঘুবংশ ৪. ৮১-৮৩) জানা যায় যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও কামরূপ একই দেশ, তবে কামরূপ ছিল আসলে জাতিবাচক ("তম্ ঈশঃ কাম-রূপাণাং")।

বৈদিক গল্পটির রেশ বহু কাল পরেও লুপ্ত হয়নি। পুরাণে

বর্ণিত বিষ্ণুর বরাহ-অবতারের কাহিনী বৈদিক গল্পটিরই জের টানার মতো। বেদের কবিরা আদিত্যকে বরাহরূপেও কল্পনা করতেন ("দিবো বরাহম্ অরুষং বৃহন্তং")। সেই অনুসারে বিষ্ণু তাঁর এক রূপে বরাহ। পূর্বদিগন্তে সূর্য ওঠে এবং পৃথিবীকে অন্ধকারসমুদ্র থেকে যেন আলোকের ভূমিতে তুলে আনে। এই কল্পনাছবি বরাহ-অবতার কথাবস্তুর বীজ। (প্রাগ্‌জ্যোতিষের বিশিষ্ট বলশালী জন্তু হ'ল গণ্ডার। গণ্ডার প্রাচীনকালে তার বিশিষ্ট নামটি পায় নি। বরাহ নামেই পরিচিত ছিল। সুতরাং বিষ্ণুর বরাহ-অবতার আসলে তাঁর গণ্ডার-অবতার ব'লেই মনে হয়। বরাহের দাঁতে চ'ড়ে পৃথিবীর সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠে আসা কল্পনার চেয়ে গণ্ডারের শিঙে চড়ে সে কাজ করা সহজসাধ্য ও সঙ্গত।) বেদবাহ্য হওয়ার দরুন প্রাগ্‌জ্যোতিষীয়েরা বিষ্ণুকে বরাহ-গণ্ডার রূপে টেনে এনেছিলেন তাঁদের দেশকে আর্যনিবাসের উপকণ্ঠভূমি রূপে মর্যাদা দেবার জন্যে। বরাহ-গণ্ডাররূপী বিষ্ণু ভূমিকে ভার্যারূপে গ্রহণ ক'রে এদেশের 'ভৌম' রাজবংশের পত্তন করেছিলেন। "বরাহ" বা "নরক" কোন নামটিই রুচিকর নয়। সেইজন্যই হয়ত মাতৃনাম নেওয়া হয়েছিল। হয়ত বা ওদেশে তখন পরিবার পরিচালিত হ'ত মাতৃতন্ত্রে।

পরবর্তী কালে লোকভাবনা বাস্তবমুখী হওয়ায় প্রাগ্‌জ্যোতিষ-কামরূপের রাজবংশ লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নদকে বরাহ-গণ্ডারের প্রতিভূ দাঁড় করিয়েছেন। লৌহিত্যও বরাহরূপী আদিত্যের মতো রক্তবর্ণ বৃহৎ ও দুর্ধর্ষ।

যেসব দেশনাম জাতিনাম থেকে এসেছে সেগুলি সংস্কৃতে বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। পাণিনির ব্যাকরণের ভাষ্যকার পতঞ্জলি (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) বলেছেন, "অঙ্গানাং বিষয়ো ঽঙ্গাঃ", অর্থাৎ অঙ্গদের দেশ (—বিষয় মানে-যে দেশ তা পাণিনি ব'লে গেছেন একটি সূত্রে—) হল 'অঙ্গাঃ'। এই কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কেন্দ্রস্থানীয় বঙ্গভূমির অধিবাসী তিনটি মুখ্য জাতি ও তাদের বিষয়ের নামও করেছেন,

"বঙ্গাঃ সুহ্মাঃ পুণ্ড্রাঃ", অর্থাৎ বঙ্গ জাতি ও তাদের বিষয়, সুহ্ম জাতি ও তাদের বিষয়, পুণ্ড্র জাতি ও তাদের বিষয়। এই তিন বিষয় বা দেশ হ'ল যথাক্রমে ভাটি গাঙ্গেয় বঙ্গভূমি, গঙ্গার পশ্চিমে সুহ্মভূমি, এবং উজান গাঙ্গেয় পুণ্ড্রভূমি। পতঞ্জলি অঙ্গ ও মগধেরও উল্লেখ করেছেন। অঙ্গদের বিষয় ছিল গঙ্গার বাম তীরভূমি, এখন যা ত্রিহুত (গুপ্ত আমলের দেওয়া নাম 'তীরভুক্তি' থেকে), আর মগধদের বিষয় ছিল গঙ্গার দক্ষিণতীর ভূমি যা তুর্কি আক্রমণের সময়ে-বৌদ্ধতীর্থ ও বিহার-মঠে আকীর্ণ ছিল ব'লে—'বিহার (ভূমি)' নামে পরিচিত ছিল। (এখন এই নাম ওপারকেও গ্রাস করেছে।) বঙ্গ বিষয়ের মেরুদণ্ড ছিল গঙ্গা। বঙ্গ জাতি প্রথম থেকে সর্বাধিক বিশিষ্ট ছিল, তাই সমগ্র দেশ পাণিনি-পতঞ্জলির সময় পর্যন্ত উত্তরাপথে বঙ্গ ব'লেই পরিচিত ছিল। সুহ্ম নামটি অপরিচয়ের আবর্তে প'ড়ে পরে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়, শুধু সাহিত্যে মাঝে মাঝে চমকের দেখা দেয়। তবে কালিদাসের কালে (খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দী?) সুহ্ম জাতি ও দেশ প্রবল প্রতাপে বিরাজ করছিল ব'লে অনুমান হয়। পুণ্ড্র বিষয়ের অস্তিত্ব কালিদাসের জানা ছিল কি না জানি না, তিনি এ জাতির বা বিষয়ের কোন নামই করেন নি। তবে পুণ্ড্রদের 'বিষয়' না থাকলেও নগর ছিল। পুণ্ড্রনগরের অস্তিত্ব খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রত্নলেখে মিলেছে। এই পুণ্ড্রনগর পরে পৌণ্ড্রবর্ধন নামে ভারতবর্ষের সর্বত্র বিখ্যাত হয়। গুপ্তদের আমল থেকে মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত ভাগীরথীর বামতীরস্থ সমগ্র ভূভাগ শাসনকার্যে পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি নাম পেয়েছিল।

'বঙ্গ' নামটি সেকালে সর্বত্র বহুজনবিদিত হবার কারণ মনে হয় কাপাস ও কাপাস-শিল্পের সঙ্গে এই নামটির সম্পর্ক। কাপাস গাছ এদেশের যে স্বাভাবিক উদ্‌ভিদ্, একথা বিজ্ঞানসম্মত। 'বঙ্গ' শব্দের এক মানে কাপাস-তূলা। এ অর্থ সংস্কৃত অভিধানে স্বীকৃত এবং এ অর্থ অর্বাচীন নয়! বাংলা ভাষার রেশ না থাকলেও সম্পর্কিত অন্য

কোন কোন ভাষায় আছে।[১] নীচে 'বঙ্গাল' নামের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বঙ্গ জাতি যেমন কাপাস চাষের ও বস্ত্র-শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল পুণ্ড্র জাতি তেমনি আখ চাষের ও গুড় শিল্পের এবং রেশমি বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। 'পুণ্ড্র' শব্দের অর্থ এক জাতের আখ। এখনও দেশি আখের নাম 'পুঁড়ি' (<পৌণ্ড্রিক)। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন 'গৌড়' দেশনামটি 'গুড়' থেকে উদ্ভূত সুতরাং পুণ্ড্র (পৌণ্ড্র) নামের সঙ্গে সম্পর্কিত। তার বিরুদ্ধে বলা যায় 'গৌড়' শব্দ 'গোণ্ড' এই বহুবিস্তৃত জাতিনামের সঙ্গে সম্পর্কিত অনুমান করতেও বাধা নেই। পাণিনি যে গৌড়পুরের নাম করেছেন, তা প্রত্নলিপির পুণ্ড্রনগরের (পরবর্তী কালের পুণ্ড্রবর্ধনের) অপর নাম হতে পারে। কিন্তু 'গুড়' থেকে আগত সংস্কৃতে কোন 'গৌড়' শব্দ থাকলে পাণিনির কোন না কোন সূত্রে তা নিশ্চয়ই গাঁথা পড়ত। পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

অনুমান করি 'সুহ্ম' নামটি প্রাকৃত ভাষার, বৈদিক সংস্কৃত 'শুষ্ম' (মানে বলবান্, দুর্ধর্ষ) থেকে আগত। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী থেকে সুহ্ম নামটি আর সাহিত্যের বাইরে দেখা যায় না, সাহিত্যেও তার সন্ধান ক্বচিৎ মেলে। তার স্থানে দেখা দিলে 'রাঢ়া' (রাঢ়)। এ শব্দটির অর্থ পরে দাঁড়িয়েছিল দুর্ধর্ষ, নিষ্ঠুর। জৈনদের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ আয়রঙ্গসুত্তে (—সংস্কৃতে বইটির নাম হবে আচারাঙ্গসূত্র ; রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী—) বর্ণিত আছে যে মহাবীরকে "দুচ্চর (অর্থাৎ দুশ্চর) "লাল" (লাট অথবা রাঢ়া) দেশ ভ্রমণ কালে "সুব্ভভূমি" (< শ্বভ্রভূমি, খানাখন্দের দেশ) ও "বজ্জভূমি" (<বজ্রভূমি, শক্তমাটির পাথুরে দেশ) বিচরণ করতে হয়েছিল।

[১] ভোজপুরীতে 'বাঁগ' মানে কাপাস গাছ ; মৈথিলীতে 'বাঁগো, বাঁগা' হিন্দীতে 'বাঁগা' মানে কোষস্থ অপরিষ্কৃত তূলা ; ভোজপুরীতে 'বাঁগোর' (<*বঙ্গপুট) মানে কাপাস কোশ। *Turner*-এর *A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages* ১১১৯৬, ১১১৯৮ দ্রষ্টব্য।

যেসব পণ্ডিত "লাল" নামটিকে 'রাঢ়' ধরেন তাঁরা "সুব্‌ভ ভূমি" কে ধরেন সুহ্মদেশ। এই অনুমানের বিরুদ্ধে বলতে হয় যে সংস্কৃত 'সুহ্ম' প্রাকৃতে 'সুম্‌ভ' হতে পারে, 'সুব্‌ভ' হতে পারে না। কেননা এমন ধ্বনিপরিবর্তনের কোন দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। আরও একটি বিরুদ্ধ যুক্তি আছে। রাঢ়-সুহ্ম মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা "বজ্জভূমি"র কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। "রাঢ়" হোক বা "লাট" হোক, মহাবীর যে দুর্গম উঁচু নীচু দেশের মধ্য দিয়ে পর্যটন করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গে এবং গুজরাটে এমন ভূখণ্ডের অভাব নেই।

পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলি অঙ্গ বঙ্গ সুহ্ম পুণ্ড্র মগধ ও কলিঙ্গ এই প্রাচ্য বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। পাণিনির সূত্রে শুধু মগধের ও কলিঙ্গের স্পষ্ট উল্লেখ আছে ("দ্ব্যঞ্‌মগধকলিঙ্গসূরমসাদ্‌ অন্‌" ৪.১. ১৬৮)। সূত্রের প্রথম শব্দ "দ্ব্যচ্‌" থেকেই পতঞ্জলি অঙ্গ বঙ্গ সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামগুলি যে অনুমান করেছিলেন এমন নয়, এই নামগুলি তখন সুপ্রচলিত ছিল। পতঞ্জলি আর্যাবর্তকে তিন অংশে ভাগ করেছিলেন, প্রাচ্য, উদীচ্য ও মধ্যম এবং প্রত্যেক ভাগের তিন বিভাগ ধরেছিলেন, "ত্রয়ঃ প্রাচ্যাঃ ত্রয় উদীচ্যাঃ ত্রয়ো মধ্যমাঃ।" কিন্তু তিনি বিভাগগুলির নাম করেন নি। প্রাচ্যের তিন বিভাগ তাঁর মতে হয়ত ছিল অঙ্গ বঙ্গ ও মগধ। পাণিনি অনেকগুলি সূত্রে "প্রাচাম্‌" পদটি ব্যবহার করেছেন। পদটির সোজা মানে হল পূর্বদেশীয়দের। পূর্বদেশীয় বলতে পাণিনি পূর্বদেশীয় (প্রাচ্য) বৈয়াকরণ ধরেছেন ব'লেই মনে হয়।[১] পাণিনির সূত্রে প্রাচ্যভূমির কোন স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও একটি প্রাচ্য নগরের উল্লেখ আছে বলে অনেকে মনে করেন। স্বরপ্রক্রিয়ার একটি সূত্রে ("পুরে প্রাচাম্‌" ৬ ২.৯৯) বলা হয়েছে যে প্রাচ্য- (বৈয়াকরণ-) দের মতে 'পুর' শব্দ পরে থাকলে নির্দিষ্ট অক্ষরে

[১] যেমন "আচার্যাণাম্‌" অর্থাৎ গুরুদেবের মতে।

স্বরসংস্থান হয়। পরের সূত্রে বলা হয়েছে যে 'অরিষ্ট' ও 'গৌড়' শব্দ পূর্বপদ হ'লেও অনুরূপ স্বরসংস্থান হয় ("অরিষ্ট-গৌড় পূর্বে চ")। এই দুই সূত্র থেকে দুটি বিভিন্ন অনুমান করা যায়: (১) উদ্দিষ্ট স্বর-সংস্থানের শুধু এই দুটি উদাহরণ—অরিষ্টপুর এবং গৌড়পুর—পাণিনির জানা ছিল, তাই অন্য উদাহরণের জন্যে তিনি প্রাচ্য বৈয়াকরণদের দোহাই দিয়েছেন; অথবা (২) 'অরিষ্টপুর' ও 'গৌড়পুর' প্রাচ্যদের জানা নগর নয়, সুতরাং পূর্ব সূত্রটির অধিকারের বাইরে ছিল এই নাম দুটি।

সাহিত্যে এবং লোকব্যবহারে নগর ও দেশ বাচক 'গৌড়' নামটি সেদিন (অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ) পর্যন্ত চলিত ছিল। চৈতন্যের সময়ে 'গৌড়ীয়া' বললে বাঙালী বোঝাত। কিন্তু ঐতিহাসিক দলিলে অর্থাৎ প্রত্নলিপিতে এ নামের ব্যবহার সপ্তম শতাব্দীর আগে দেখা যায় না। পালরাজাদের আগেকার কোন শাসনপট্টে "গৌড়েশ্বর" বা "গৌড়পতি" এই বিরুদ নেই। নামটি বহিরাগত এবং সাহিত্যে ব্যবহৃত। গৌড় নামে নগর মুসলমান ঐতি-হাসিকদের রচনায় প্রথম দেখা গেল। লক্ষ্মণসেনের রাজধানী যে এ নামেও অভিহিত ছিল তার প্রমাণ রয়েছে পুরানো বাংলা সাহিত্যে।

পতঞ্জলির কালে (এবং তারও আগে) বঙ্গ বিষয় বলতে যে গাঙ্গেয়-ভূমি বোঝাত তার অন্যদিক থেকেও সমর্থন পাওয়া যায়। মেগাসথিনিস্ প্রমুখ গ্রীক পর্যটক-ঐতিহাসিকদের উক্তি অনুসারে আলেক্জাণ্ডারের সময়ে ভারতবর্ষের পূর্বভাগে দুটি মাত্র উল্লেখযোগ্য জাতি ছিল,- 'প্রাসিওই' ও 'গঙ্গারিদই' বা 'গঙ্গরিদই'। সংস্কৃতে আক্ষরিক অনুবাদ করলে প্রাসিওই (Prasioi) হয় 'প্রাচ্যাঃ' আর গঙ্গারিদই (Gangaridai) হয় 'গাঙ্গেয়াঃ'। বিদেশী পর্যটক-নাবিক-ঐতিহাসিক-দের উল্লিখিত 'প্রাসিঅই' (বা 'প্রাসিই') এবং 'প্রাসিআ' যথাক্রমে পুরবিয়া ও পূর্বদেশ দ্যোতনা করে। গঙ্গারিদই ছিল তাদেরই এক

দল যাদের বিষয় ছিল গঙ্গা(ভূমি) অর্থাৎ গাঙ্গেয় উপত্যকা।[১] পুরানো লাটিন কবি ওবিদ (Ovid ; খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী) এই পুরবিয়াদেরই বুঝিয়েছেন 'গাঙ্গেটিকুস্', 'গাঙ্গেটিআ' (অর্থাৎ গাঙ্গেয়) বলে। বিখ্যাত জ্যোতিষিক গাণিতিক ও ভূবিদ্যাবিদ টলেমি (খ্রীষ্টপর দ্বিতীয় শতাব্দী) নিম্ন গাঙ্গেয় দেশকে বলেছেন 'গাঙ্গে' আর সেই নামে এই দেশের বন্দরকেও সনাক্ত করেছেন। নামটি সাক্ষাৎ 'গাঙ্গেয়' থেকে এসেছে। একদা এইস্থান পরবর্তী কালের কর্ণসুবর্ণ হওয়া অসম্ভব নয়।

বঙ্গভূমির ও তার অধিবাসীদের সম্বন্ধে খাঁটি, যদিও খুব ক্ষীণ, খবর প্রথম পাওয়া গেল কালিদাসের কাছে। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্‌বিজয় প্রসঙ্গে তিনি সুহ্ম ও বঙ্গ জাতির যে সামান্য পরিচয়টুকু দিয়েছেন তা যথার্থ। যাঁরা কালিদাসকে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি বা সমসাময়িক ব'লে মনে করেন তাঁরা রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনায় সমুদ্রগুপ্তের দিগ্‌বিজয়ের প্রতিচ্ছবি দেখেন। সে কল্পনাদৃষ্টি যে কতটা ব্যর্থ তা বঙ্গভূমির প্রসঙ্গে কালিদাসের উক্তি আর হরিষেণের প্রশস্তি মেলাতে গেলেই ধরা পড়ে। কালিদাস সুহ্মের উল্লেখ করেছেন

[১] প্রাচীন বৈয়াকরণদের উদাহরণ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" থেকে গাঙ্গেয় ভূমি অর্থে গঙ্গা শব্দের প্রয়োগ অনুমান করা যায়। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'গঙ্গারিদই' নামটিকে বঙ্গাল শব্দের সাদৃশ্যে আনুমানিক গঙ্গাল শব্দ থেকে বিদেশীর তৈরি নাম বলে অনুমান করেন (*Studies in Indian Linguistics*, এমেনো (Emeneau) সংবর্ধনা খণ্ড, পৃ ৭০-৭৪ দ্রষ্টব্য)। এঁর পক্ষে বলা যেতে পারে এই যে 'বঙ্গাল' শব্দের সঙ্গে 'বঙ্গ' শব্দের অর্থঘটিত যে যোগ আছে, আনুমানিক 'গঙ্গাল' শব্দের সঙ্গে 'গঙ্গা' শব্দের যোগও কতকটা সেইমত। 'বঙ্গাল' মানে 'বঙ্গ-ঋদ্ধ' অর্থাৎ প্রচুর কার্পাসপুষ্ট দেশ হ'লে, 'গঙ্গাল' মানে 'গঙ্গা-ঋদ্ধ' অর্থাৎ গঙ্গাপুষ্ট দেশ হ'তে বাধা নেই। পণ্ডিতেরা ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষায় একটি ধাতুর অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন 'রেইদ্' (reid), অর্থ "অবলম্বন করা, পোষণ করা" (*Indo-Germanisches Etymologisches Woerterbuch*, Pokorny, 861)। এই ধাতু-উৎপন্ন শব্দ গ্রীক ও লাটিন ভাষায় আছে, এবং সেই শব্দের সাদৃশ্যে Gangaridai (Gangaridi—লাটিনে) পদটি গ্রীক (ও রোমান) পর্যটকদের—কল্পিত নয়—নির্মিত শব্দ ব'লে স্বচ্ছন্দে নিতে পারি।

সমতটের নাম পর্যন্ত করেন নি, সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিকার হরিষেণ সমতটের নাম করেছেন বঙ্গ-সুহ্মের কোন উল্লেখই করেন নি।

এখন কালিদাসের উক্তি আলোচনা করি। দিগ্‌বিজয় প্রয়াণে বার হয়ে রঘু প্রথমেই পূর্ব দেশ জয় করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। (এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তের প্রথম ভৌগোলিক চিত্র পাওয়া গেল।)

পৌরস্ত্যান্ এবম্ আক্রামংস্ তাংস্ তান্ জনপদান্ জয়ী।
প্রাপ তালীবনশ্যামম্ উপকণ্ঠং মহোদধেঃ॥

'এইভাবে পুরবিয়াদের সেই সেই দেশ আক্রমণ ক'রে জয়ী হ'য়ে রঘু সমুদ্রের তালীবনশ্যামল উপকণ্ঠে পৌঁছলেন॥'

অনম্রাণাং সমুদ্ধর্তুস্ তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদ্ ইব।
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্ বৃত্তির্ আশ্রিত্য বৈতসীম্॥

'অবিনীতদের উৎপাটনকর্তা রঘুর থেকে, যেমন সমুদ্রের ঢেউয়ের থেকে, সুহ্মেরা আত্মরক্ষা করলে বেতগাছের ব্যবহার অনুকরণ ক'রে॥'

বঙ্গান্ উৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু চ॥

'নেতা তিনি, নৌবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতে উদ্যত বঙ্গদের সবলে উৎখাত ক'রে গঙ্গাস্রোতের ফাঁকে ফাঁকে জয়স্তম্ভ স্থাপন করলেন॥'

আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্।
ফলৈঃ সংবর্ধয়াম্ আসুর্ উৎখাতপ্রতিরোপিতাঃ॥

'প্রথমে উৎপাটিত তার পরে আবার রোপিত, আমন ধানের মতো, তারা (রঘুর) পা পর্যন্ত মাথা নুইয়ে রঘুকে ফল দিয়ে অভ্যর্থনা করলে॥'

স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্ বদ্ধদ্বিরদসেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখং যযৌ॥

'হাতির পুল বেঁধে তিনি সৈন্যসমেত কপিশা পার হয়ে উৎকলের দাঁড়া পথ ধরে তিনি কলিঙ্গের অভিমুখে গেলেন॥'

গ্রীক ঐতিহাসিকদের উল্লেখ এবং কালিদাসের উক্তি মিলিয়ে দেখলে

সন্দেহ থাকে না যে বঙ্গজাতির বিষয় একদা ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী ভূভাগ নিয়ে বিস্তৃত ছিল। পুণ্ড্রজাতি গঙ্গার পূর্বতীরে অধিক সংখ্যায় বসতি করেছিল এবং তারা উত্তরাপথ-আগত সংস্কৃতিপ্রবাহ সর্বাগ্রে অনুভব করেছিল। (এর একটা প্রধান কারণ অঙ্গ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লেষ এবং সেইহেতু উত্তরাপথের সঙ্গে স্থলবর্ত্মেও সরাসরি যোগাযোগ।) সেইজন্যে ইতিহাসে পুণ্ড্রনগর-পৌণ্ডবর্ধন অত আগে এবং বারবার উল্লিখিত দেখা যায়।

গুপ্তরাজাদের অধিকার কাল থেকে সমগ্র দেশ-অর্থে বঙ্গ নামটির অপ্রচলন ঘটতে থাকে। তার একটা কারণ হল শাসনকার্যের জন্যে দেশকে তুটি "ভুক্তি" বা ভোগপ্রদেশে বিভাগ করা। ভাগীরথী হ'ল এই বিভাগের সীমা-রেখা। গঙ্গার বাম দিকের নাম হ'ল 'পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি', দক্ষিণ দিকের নাম হ'ল 'বর্ধমান ভুক্তি'। অতঃপর সমস্ত প্রত্নলেখে এই তুটি বঙ্গভূমির দ্বৈধ নাম হয়েছে। বঙ্গ নামের অর্থসঙ্কীর্ণতার আর একটা কারণ—বর্ধমান ভুক্তিতে যেসব নদী ছিল তাতে ক্রমশ নাব্যতার হ্রাস হওয়ার ফলে নৌ-ব্যবহারে দক্ষ বঙ্গ জাতির হয়ত অসুবিধা ঘটছিল। তার উপর গাঙ্গেয় ভূমিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং কৃষিবৃত্তির প্রসার হ'তে থাকে। এর ফলে বর্ধমান ভুক্তির জনগণ জলচর বৃত্তিতে পরাঙ্মুখ হয়ে যায়। এই সব কারণে, অনুমান করি যে, বঙ্গেরা ক্রমশ গাঙ্গেয় ভূমি থেকে দূরে দূরে নদীবহুল পূর্ব ও পূর্বদক্ষিণ ভূভাগে সরে যেতে থাকে। এই ভূভাগের কোন কোন অঞ্চল তূলা ও বস্ত্র উৎপাদনের প্রশস্ত কেন্দ্র ছিল। তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে 'বঙ্গ' নামটি এই গঙ্গাপসৃত ভূভাগের পক্ষে নূতন ক'রে রূঢ় হয়।

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তাঁর অধিকারের প্রান্তীয় বিজিত ও আংশিক-অধিকৃত দেশের তালিকা আছে। সে তালিকায় পূর্বাঞ্চলের প্রসঙ্গে সুহ্ম ও বঙ্গ নেই, পুণ্ড্র নেই, আছে 'সমতট', 'ডবাক' এবং 'কামরূপ'। সমতট বিষয়-নামটি এই প্রথম পাওয়া

গেল। নামটির অর্থ, যে ভূভাগে নদীতট সমভূমি, উঁচুনীচু নয়। নিম্ন গাঙ্গেয় ভূমি এবং পূর্ব ও পূর্বদক্ষিণ বঙ্গভূমি সম্পর্কে এই নামটি সম্পূর্ণ খাটে। 'ডবাক' নামটির এখনো কিনারা হয় নি। কামরূপ সমতটের প্রান্তে।

বঙ্গভূমির বিভিন্ন বিভাগের উপযুক্ত কিছু বর্ণনা প্রথম পাওয়া গেল সপ্তম শতাব্দীতে চীনীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙের গ্রন্থে। তিনি তাঁর পর্যটনক্রমে এদেশের বিভাগ লক্ষ্য করেছেন এই কয় অঞ্চলে,—কজঙ্গল (রাজমহলের পার্বত্য ভূমি সংলগ্ন আরণ্য অঞ্চল), পুণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ ও উড্ড (ঔড্র)। পুণ্ড্রবর্ধন, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণ এ তিনটি দেশনাম নয় স্থাননাম, যথাক্রমে উত্তর-পূর্ব বঙ্গভূমি, সুহ্ম, ও দক্ষিণ গাঙ্গেয় প্রদেশের নির্দেশক। সমতট নিম্ন বাম গাঙ্গেয় প্রদেশ, পুণ্ড্রবর্ধনের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল। ময়নামতীতে প্রাপ্ত লডহচন্দ্রের তাম্রশাসনে সমতট পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত একটি মণ্ডল ব'লে উল্লিখিত হয়েছে।[১] সমতটের উত্তরপূর্বে কামরূপ। উড্ড (জাতি-নাম 'উড্র' অথবা 'ঔড্র' হ'তে) হ'ল কালিদাস উল্লিখিত উৎকল, সুহ্মের সীমান্ত পেরিয়ে। সমতটের রাজধানীর নাম জানা নেই, রাজ্য ও রাজধানী দুইই হিউয়েন-সাঙ সমতট বলেছেন। সমতটের সংলগ্ন 'বঙ্গাল' (মানে প্রচুর 'বঙ্গ' অর্থাৎ তূলা উৎপাদনকারী ভূমি)। এই নাম থেকে পরে 'বাঙ্গালা', 'বাঙ্গালী' শব্দ এসেছে। মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালের শাসন-পট্টে বঙ্গাল-বাহিনীর দ্বারা সোমপুর বিহার বিধ্বংসের উল্লেখ আছে। সিলেটের পশ্চিমভাগ গ্রামে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে বঙ্গাল নামটির ব্যাপক (অর্থাৎ "বঙ্গভূমির বিশেষত্বযুক্ত") অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রীচন্দ্র পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত শ্রীহট্ট মণ্ডলে আটটি মঠ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তার মধ্যে চারটি "দেশান্তরীয় মঠ" আর চারটি

---

[১] শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত গুপ্ত প্রণীত *Copper-plates of Sylhet*, সিলেট ১৯৬৭, পৃ ১১১-১১২ দ্রষ্টব্য। লডহচন্দ্র শ্রীচন্দ্রের নাতি ছিলেন।

"বঙ্গাল মঠ"।[১] বঙ্গাল নামে অথবা ছদ্মনামে এক কবির লেখা শ্লোক দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আল্‌বেরুনি (একাদশ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ) "বঙ্গাল" প্রণীত শকুনবিদ্যার গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।

'হরিকাল' বা 'হরিকেল' দেশ-নামটির উল্লেখ হিউয়েন্‌-সাঙের গ্রন্থে নেই ই-সিঙের গ্রন্থে আছে। ইনি বলেছেন এদেশ ভারতের প্রান্তভূমি। দেশনামটির সাহিত্যে ব্যবহার যত আছে তত প্রত্ন-লিপিতে নেই।[২] শ্রীচন্দ্রের পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের তাম্রশাসনে রাজা হরিকেল-রাজচ্ছত্রের অধিকারী বর্ণিত হয়েছেন। "শ্রীহরিকাল-দেব" রণবঙ্কমল্লের তাম্রশাসন (১২২১ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে জানা যায় যে তাঁর রাজধানী ছিল পট্টিকের (আধুনিক শ্রীহট্টের অন্তর্গত)। এই হরিকাল বা হরিকেল দেশেরই নামান্তর ছিল শ্রীহট্ট। 'হরিকাল' বা 'হরিকেল' নামটি 'হরিত', 'হরিক', (মানে শষ্পশ্যাম) শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত। মনে হয় নামটি এসেছে 'হরিক' (অর্থ সবুজ উদ্‌ভিদ) এবং 'কদলক' (কলা) থেকে। এদেশ শস্যশ্যাম এবং প্রচুর কলা ফলায়। মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনীতে, এ দেশ কদলীর রাজ্য ব'লেই উল্লিখিত। এই সূত্রে শ্রীহট্ট নামের সঙ্গেও মিল পাওয়া যায়। "শ্রীহট্ট" মানে লক্ষ্মীর বাগান-হাট।[৩] 'হরিকেল' নামের আরও একটি মানে হয়। বিষ্ণুর বরাহ-গণ্ডার অবতার প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজবংশের জন্মদাতা। হরিকেলের সীমান্তে ব্রহ্মপুত্র নদ। সেই সূত্রে এদেশ হরির ক্রীড়াস্থলী। দেশনামটি 'হরিকোল' রূপেও পাওয়া গেছে।

[১] ঐ পৃ ৯৮ দ্রষ্টব্য।

[২] প্রত্নলিপিতে হরিকেল মণ্ডলের উল্লেখ পাওয়া যায় কান্তিদেবের খসড়া তাম্রশাসনে (আনুমানিক নবম শতাব্দী)।

[৩] 'হট্ট' শব্দের আদিম অর্থ ছিল ফলফুলুরির শাকশব্‌জির নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা বাগান। সংস্কৃতে শব্দটির আনুমানিক মূল রূপ ছিল 'হর্ত'। সংস্কৃত *হর্ত শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত হ'ল লাটিন হর্টুস (hortus) ও ইংরেজী গার্ডেন (garden)।

('কোল' মানে বরাহ।)[১] এখানে প্রথম অর্থের উপর দ্বিতীয় অর্থের আরোপ লক্ষণীয়।

শ্রীহট্ট ভূমির উর্বরতার জন্য এবং কার্পাস-উৎপাদন ও বস্ত্রশিল্পের প্রকর্ষের জন্য বিখ্যাত ছিল। তীরভুক্তির কবিপণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বর (চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ) তাঁর বর্ণরত্নাকর গ্রন্থে "সিলহটি" বস্ত্রের প্রশংসা করেছেন। পট্টবস্ত্র উৎপাদনকারী বিশিষ্ট ভূখণ্ড, অখণ্ড হরিকেলের অঞ্চল বিশেষ 'পট্টিকের' বা 'পাটিকা' নাম পেয়েছিল।

অষ্টম-নবম শতাব্দীতে পাল-সিংহাসন উত্তর গাঙ্গেয় ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে পর গঙ্গার বাম তীরভূমি সমৃদ্ধির প্রাচুর্যে 'বরেন্দ্র ভূমি' বা 'বরেন্দ্রী' নামে প্রসিদ্ধ হয়। নামটির অর্থ—শ্রেষ্ঠ সরসভূমি (উৎকৃষ্ট ইন্দ্রপুরী)। সেই সঙ্গে বাম তীরভূমির সহিত বৈপরীত্য জ্ঞাপন ক'রে দক্ষিণ তীরভূমির নাম হয় 'রাঢ় ভূমি' বা 'রাঢ়া'। (আচারাঙ্গসূত্রে বর্ণিত মহাবীরের পরিভ্রমণ যদি রাঢ়ে ঘ'টে থাকে তবে অবশ্য এ নামটি বরেন্দ্রীর তুলনায় প্রাচীন, এবং তখন বলতে হবে যে রাঢ়ার বৈপরীত্যেই বরেন্দ্রী নামটি গঠিত। সংস্কৃত অভিধানে 'রাঢ়া' শব্দের অর্থ সৌন্দর্য, বৈভব। সম্ভবত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দটি 'রাজ্' ধাতু থেকে উদ্ভূত: রাজ্ + ত > *রাষ্ট, অথবা রাজ্ + ত্র > রাষ্ট্র।) নবম-দশম শতাব্দী থেকে রাঢ় দেশের দুটি বিভাগ স্বীকৃত হয়ে এসেছে। লক্ষ্মণসেনের সময়ে উত্তররাঢ়া একটি "মণ্ডল" অর্থাৎ ভুক্তির বিভাগ ছিল। দক্ষিণরাঢ়া সদাচারী ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠ ব'লে সেকালে পরিচিত ছিল। মনে হয় একদা রাঢ় দেশ বলতে গঙ্গার ওপারেও কিছু অংশ এবং এপারে দামোদরের প্রাচীন খাত বাঁকা-বল্লুকা (বেহুলা) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে এই অংশই রাঢ় দেশ বলে প্রশংসিত হয়েছে ("ধন্য রাঢ় দেশ")। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের অধিকাংশ মূলস্থান ("গাঁঞি") এই ভূভাগে—দক্ষিণপূর্ব বীরভূমে ও উত্তর ও উত্তরপূর্ব

[১] *Dacca History of Bengal* প্রথম খণ্ড পৃ ১৯।

বর্ধমানে—অবস্থিত। 'দক্ষিণরাঢ়া' আসলে রাঢ়া ভূমির দক্ষিণে দেশ বোঝাত, রাঢ়ার দক্ষিণ অংশ নয়। রাঢ়ার (অর্থাৎ উত্তররাঢ়ের) প্রধান নগর ছিল কর্ণস্থবর্ণ। দক্ষিণ রাঢ়া ছিল আগেকার সুহ্মের মধ্যে। তার প্রধান নগর ছিল ভূরিশ্রেষ্ঠী এবং বন্দর তাম্রলিপ্তি।

খ্রীষ্টপূর্ব কালে গঙ্গার ভাটি অংশ ("গাঙ্গ অনূপ") কোথাও কোথাও "উন্মত্তগঙ্গ" এবং "লোহিতগঙ্গ" নামে পরিচিত ছিল। যেখানে গঙ্গা বিস্তীর্ণ ও প্রচণ্ড—বিশেষ ক'রে বর্ষায় ও শরতে—সে অঞ্চল 'উন্মত্তগঙ্গ,' অনুমান করতে পারি। এখনকার দিনের নদীনাম 'মাতলা' এই নামেরই যেন প্রতিধ্বনি। বারাণসীর নীচে থেকে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত সমগ্র গাঙ্গেয় ভূমিকে পতঞ্জলির সময়ে লোকভাষায় 'উন্মত্তগঙ্গ' বলা অযথার্থ ছিল না। শোণ বরাকর অজয় ও দামোদর—প্রধানত এই চার নদীই সেকালের বঙ্গভূমিতে প্রচুর লাল জল ঢেলে এসেছে। সুতরাং উন্মত্তগঙ্গের নিম্নার্ধকে যথার্থই 'লোহিতগঙ্গ' বলা যায়।

সেকালে পাটলীপুত্র ছিল পূর্বভারতের প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ নগর (গুপ্ত তাম্রশাসনে "শ্রীনগর")। পতঞ্জলির সময়ে পাটলীপুত্র নগর ছিল শোণের ধার বরাবর ("অনুশোণং পাটলীপুত্রম্")। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত পাটলীপুত্র ছিল প্রাচ্যভূমির শাসনকেন্দ্র। আর বারাণসী, যেখানে লোকবসতি ছিল গঙ্গার ধার ধ'রে ("অনুগঙ্গং বারাণসী") এবং যেখানে মগধ অঙ্গ বঙ্গ পুণ্ড্র, সুহ্ম প্রভৃতি জাতির বিশিষ্ট জনপদগুলিতে এক সাধুভাষা ও মোটামুটি এক সংস্কৃতি ও জীবনচর্চা নিয়ে বাস ছিল—), সেখানে ছিল এই প্রাচ্যভূমির পশ্চিম সীমান্তের ঘাঁটি। পূর্ব সীমান্তের বাণিজ্যবন্দর ছিল—তাম্রলিপ্তি, এবং তারও আগে —এক 'পুরঃস্থল' (বা 'পূর্বস্থল')। এই বাণিজ্যবন্দরটির নাম পাওয়া গেছে রোমক ঐতিহাসিক প্লিনির বর্ণনায় Portalis (পোর্তলিস্) রূপে। প্লিনির সময় থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় দু হাজার বছর কেটে গেছে। প্রধান বন্দর রূপে "পোর্তলিস্" স্থানচ্যুত হয়েছে

বারবার। বন্দরের নাম পাল্‌টেছে, কখনো 'তাম্রলিপ্তি' কখনো 'সাতগাঁ'। কিন্তু আগেকার নামটি এখনো বিলুপ্ত ও স্থানচ্যুত হয় নি। নবদ্বীপের উজানে 'পুরথল' বা 'পুরস্থল' মুকুন্দরামের বর্ণনায়ও নৌবন্দর ব'লে উল্লিখিত আছে। এখন নাম পূর্বস্থলী। এই স্থানই হয়ত বা টলেমির 'গাঙ্গে'।

সুহ্ম খুব প্রাচীন দেশ। এই দেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চল ছিল দামোদর প্রভৃতি দুটি একটি পূর্ববিন্ধ্য পার্বত্য নদীর পূর্বপ্রান্তীয় উপত্যকা। এখন যেখানে ভাগীরথী বহমান সেখানে আড়াই হাজার তিন হাজার বছর আগেও সমুদ্রের খাড়ি ছিল। বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়ার কাছে জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় দামোদরের ধারে স্থানে স্থানে (যেমন নডিহায়) পুরানো মনুষ্যবাসের প্রত্নচিহ্ন মিলেছে। ইতিহাসের মঞ্চে যবনিকা যখন থেকে উঠেছে তখন সুহ্মের সীমানা গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন দামোদর এবং গঙ্গা ত্রিবেণীর অদূরে মিলিত হ'ত, সেইখান থেকে দু-নদীর মিলিত অংশ ছিল যেন সমুদ্রের খাড়ি। মনসামঙ্গল-কাহিনীতে বেহুলার নৌযাত্রার যে বর্ণনা আছে তার থেকে বোঝা যায় যে কাহিনীটি প্রথম কল্পনার কালে সুহ্মের প্রধান জলপথ ছিল দামোদর এবং তা ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে মিলত। চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীতে ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা-পথের যে বর্ণনা আছে তা পরবর্তী কালের স্মৃতি দিয়ে গড়া। তখন ভাগীরথীর প্রাধান্য বেড়েছে। দামোদরের প্রধান ও প্রাচীন গতিপথ যা উপরে উল্লিখিত হল তার চিহ্ন রয়ে গেছে বাঁকা বল্লুকা (ভাল্‌কো) বেহুলা খড়ি প্রভৃতি নদী ও খালগুলিতে। পাণ্ডুয়া-ত্রিবেণীর মধ্যবর্তী ভূভাগে এখন যে প্রচুর বালি উঠানো হয় সেগুলি পূর্বতন দামোদর-খাতেরই, ভাগীরথী-খাতের নয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে দামোদরে যে বন্যা এসেছিল তাতে নদী যেন হঠাৎ তার বহু পুরাতন খাতেরই অনুসরণ করেছিল॥

২

খ্রীষ্টপূর্ব কাল

ইতিহাস শব্দটিকে ইংরেজী history শব্দের অনুবাদ হিসাবে ব্যবহার করতে গেলে সমসাময়িক বিবরণ অথবা লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য প্রমাণের উপর তাকে খাড়া ক'রতে হয়। কিংবদন্তীর ধারাবাহিত গল্পকথার অথবা ধর্মকাহিনীর মূলে তথ্য আছে কি না তা যাচাই করে সত্য নির্যাসটুকু ছেঁকে বার ক'রে নিলে তবেই সে নিষ্কাশিত সত্যটুকু ইতিহাসের উপাদান হ'তে পারে। কোন সুনির্দিষ্ট কালে লিপিবদ্ধ উক্তি অথবা ইঙ্গিত দ্বারা সমর্থিত না হ'লে মিথলজি থেকে আহৃত বস্তু অথবা ভাব ইতিহাসে ব্যবহারযোগ্য হয় না। এই কারণে মহাভারত ও প্রাচীন পুরাণগুলির কাহিনী ইতিহাস নয়। বড় জোর তা জ্ঞাত ইতিহাসের তলায় যে প্রাক্-ইতিহাস হাজার হাজার বছর পর্যন্ত পিছনে পড়ে আছে সেই বিস্মৃতির অন্ধকার পটে কিঞ্চিৎ খদ্যোতজ্যোতি নিক্ষেপ করতে পারে। সে আলোকে যেটুকু বোঝা যায় বা না যায় তাকে ইতিহাস বলা চলে না। আমাদের দেশে মহাভারত ও পুরাণগুলিই বহুকাল ধ'রে ইতিহাস নাম পেয়ে এসেছে। তদুপরি আমাদের বিশেষ ভক্তি আছে গ্রন্থগুলির উপর। ভক্তিতে বিশ্বাস আনে যুক্তি মানায় না। সেইজন্যে এই মুখবন্ধটুকু করতে হল।

ভারতবর্ষের ইতিহাস-রঙ্গমঞ্চে যবনিকা উঠল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ দশকে আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ফলে। স্পষ্টভাবে, বিদেশীর চোখে আমাদের মানুষ ও আমাদের দেশ এই প্রথম এল। এর দু-এক শতাব্দী আগে পারস্য সম্রাট দারয়বউস্ (Darius) ও তাঁর পুত্র খশ্য়ার্সা (Xerxes) এদেশের উত্তরপশ্চিম ভাগের কোন কোন প্রদেশ পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁরাই আমাদের নামকরণ করেছিলেন 'হিন্দুবিয়' (অর্থাৎ সিন্ধুপারের দেশ, সেখানকার লোক)। এই নামই গ্রীক রোমক ও পরবর্তী কালের ইউরোপীয়দের দ্বারা গৃহীত হয়ে এসেছে

এখনও 'ইণ্ডিয়া (India) রূপে। আমরা আমাদের দেশের নামকরণ করেছি অনেক কাল পরে। একটু অবান্তর হলেও এইখানে একটা কথা বলি। আগেকার অধ্যায়ে বলেছি যে আমাদের পুরানো দেশনামগুলি জাতিনাম থেকে এসেছিল। সেখানে বলা হয় নি যে প্রাচীন গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত একটি ছাড়া সব জাতিদেশনামগুলি অনেককাল আগেই লুপ্ত হয়েছে। লুপ্ত হয়নি শুধু 'বঙ্গ' নামটি। সে নাম এখনও রয়েছে। যখন সমগ্র ভারতবর্ষের এমন কি আর্যাবর্তেরও নামকরণ হয়নি তখনও 'বঙ্গ' এই জাতিনামটি চলিত ছিল।

গ্রীক ঐতিহাসিকদের রচনার যে খণ্ডাংশ পাওয়া গেছে তার মধ্যে থেকে, আলেকজাণ্ডারের অভিযান উপলক্ষ্যে, এদেশের সম্বন্ধে সম-সাময়িক বৃত্তান্ত কিছু কিছু মিলেছে। অশোক তাঁর বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের চতুরন্তে ও মধ্যভাগে স্থানে স্থানে উৎকীর্ণ শিলালেখসমূহে স্বীয় শাসনের অনেক সমাচার লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। প্রধানত এই লেখগুলিই ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপযোগী প্রথম ভালো সমসাময়িক দলিল। অশোকের পর থেকে যেসব রাজশাসনলেখ পাওয়া গেছে তার মধ্যে অনেক ফাঁক থাকলেও এদেশের প্রাচীন ইতিহাসের মোটা-মুটি একটা কাঠামো তার থেকে খাড়া করা যায়।

অশোকের অনুশাসনে সুহ্ম পুণ্ড্র ও বঙ্গের উল্লেখ নেই। আছে কলিঙ্গের। একালের যা বঙ্গভূমি সেখানে অশোকের কোন শিলালিপি অথবা স্তম্ভলিপি পাওয়া যায় নি। তবুও মনে হয় এদেশের সবটা না হোক খানিকটা তাঁর অধিকারমধ্যে ছিল। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হিউয়েন-সাঙ কামরূপ ছাড়া পূর্ব-ভারতের সর্বত্র অশোকের নির্মিত চৈত্যস্তূপ দেখেছিলেন ব'লে লিখে গেছেন। অশোকের কালে—খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে—এবং তার পরেও বহু শতাব্দী ধ'রে বঙ্গ-অঙ্গ-মগধ-পুণ্ড্রের মধ্যে, জনগত বিশিষ্ট আচরণ ও ভৌগোলিক পারিপার্শ্বিক ছাড়া, বিশেষ বিভেদ ছিল না। অশোক নিষ্ঠুর অভিযান চালিয়ে কলিঙ্গ বিজয় করেছিলেন। তিনি কোন্ পথে কলিঙ্গে গিয়েছিলেন?

অন্য নির্দেশের অভাবে স্বচ্ছন্দে অনুমান করতে পারি, তিনি কালিদাস-বর্ণিত রঘুর জয়যাত্রার পথই ধরেছিলেন। তাহ'লে সুহ্ম ও উৎকল তাঁর পথে পড়েছিল। হয়ত সুহ্ম-উৎকলেরা বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন ক'রে অশোকের চণ্ডরোষের দাহন এড়িয়েছিল।

বোধ হয় সেকালে কলিঙ্গ জাতির একটি মাত্র সুনির্দিষ্ট বিষয় ছিল না। গ্রীক-রোমক ঐতিহাসিকদের উক্তি এবং 'ত্রি-কলিঙ্গ' নামের ব্যবহার থেকে অনুমান করা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব কালে কলিঙ্গ বলতে অন্তত তিনটি বিষয় বোঝাত। একটি দক্ষিণপশ্চিম বাংলার সংলগ্ন অঞ্চল অর্থাৎ ঝারিখণ্ড—যা তখন ভাষায় হয় তো নয়, সংস্কৃতিতে সুহ্মের ঘনিষ্ঠ ছিল। দ্বিতীয়টি হ'ল মধ্য কলিঙ্গ অর্থাৎ কালিদাস বর্ণিত উৎকল, এবং তৃতীয়টি হল দক্ষিণ কলিঙ্গ। প্লিনি যাদের বলেছেন "গাঙ্গেয় কলিঙ্গ" (Gangarides Calingae), তারাই মনে হয় মধ্য কলিঙ্গ (কালিদাসের উৎকল, হিউয়েন-সাঙের ওড্ড)। গাঙ্গেয় কলিঙ্গভূমির দাঁড়া পথ ধরেই ("উৎকলাদর্শিতপথ") কাব্যের রঘুর মতো ইতিহাসের অশোকেরও জয়যাত্রা এগিয়েছিল।

কলিঙ্গের অধিবাসীদের আশ্বাস দিয়ে অশোক দুটি বিশেষ অনুশাসন লিখিয়েছিলেন, একটি মধ্য কলিঙ্গে—ভুবনেশ্বরের কাছে ধৌলীতে আর একটি দক্ষিণ কলিঙ্গে আধুনিক গঞ্জাম জেলায় জৌগড়ে। এর থেকে জানা যায় যে অশোকের সময়েও ভাদু-পরব ও পৌষ-পার্বণ অনুষ্ঠিত হত। তবে হয়ত সবটা এখনকার মতো নয়। আমাদের দেশে ফসল ওঠার সময় দুটি, ভাদ্র আর পৌষ, তিথি ধরলে দুইই তিষ্যা (নামান্তর পুষ্যা)। এই দুমাসে এই তিথিতে লোকে উৎসব করত। অশোক বলেছেন যে তাঁর এই অনুশাসন যেন ওই উৎসব উপলক্ষ্যে এবং ইচ্ছা হ'লে যে কোন দিন যেন সকলে মিলে শোনে। এখনকার আরও কোন কোন অনুষ্ঠান অশোকের প্রবর্তিত বলে বোধ হয়। তিন চার তলা রথে দেবমূর্ত্তি বসিয়ে সাজসজ্জা ক'রে শোভাযাত্রা—যা এখন

রথযাত্রায় দেখা যায়—তা অশোকই আরম্ভ করেছিলেন। এই দাবি তাঁর চতুর্থ গিরি অনুশাসনে আছে।

পূর্বভারতের বিশিষ্ট আবাসগৃহে হ'ত মাটির দেওয়াল, বাঁশের মটকা আর খড়ের ছাউনি। দরজা কাঠের। এমনি আবাসগৃহের খাঁটি নমুনা অশোকের তৈরি গুহায় মিলেছে। গয়া থেকে কয়েক মাইল দূরে আধুনিক বরাবর পাহাড়ে—প্রাচীন খলতিক (অর্থাৎ নেড়া) পর্বতে অশোক (এবং তাঁর নাতি দশরথ) কয়েকটি গুহাবাস খোদাই করিয়ে দিয়েছিলেন আজীবিক সাধুদের বর্ষা চাতুর্মাস্য যাপনের জন্যে। এই গুহার একটি দ্বারের চিত্র থেকে সেকালের "বাংলা" গৃহের আদর্শ বোঝা যাবে। বরাবর পাহাড়ের এই গুহাগুলিই ভারতবর্ষে তৈরি বাসগৃহের সবচেয়ে পুরানো নিদর্শন।

অশোকের অনুশাসনের লিপিছাঁদে উৎকীর্ণ এবং সেই কালের প্রাকৃত ভাষায় লেখা অতএব খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর ব'লে নির্ধারিত খুব একটি ছোট খণ্ডিত চক্রকার শিলালেখ ছাড়া আর কোন ঐতিহাসিক দলিল বঙ্গভূমিতে পাওয়া যায় নি, যা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর আগে লেখা বলে নেওয়া যায়। খণ্ডিত ছোট শিলালেখটি আবিষ্কৃত হয়েছিল এখনকার বাংলাদেশের বগুড়া জেলার অন্তর্গত মহাস্থানে। সেইজন্য লিপিটি মহাস্থান শিলালেখ ব'লে পরিচিত। শিলালেখটি এমনভাবে খণ্ডিত যে প্রায় আধাআধি অক্ষর বিলুপ্ত এবং বাকির প্রায় আধাআধির পাঠ সংশায়িত। তবে যে-কয়েকটি শব্দ স্পষ্ট আছে তার থেকে কিছু মূল্যবান্ সংবাদ আহৃত হয়েছে। শিলালেখটির পাঠোদ্ধারে যাঁরা চেষ্টিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজন অগ্রগণ্য, দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, বেণীমাধব বড়ুয়া এবং শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার। দীনেশবাবুর লেখসংগ্রহ গ্রন্থ থেকে মহাস্থান শিলালেখের পাঠ উদ্ধৃত করছি। বন্ধনীমধ্যের পাঠ অনুমিত অথবা কল্পিত। সাত ছত্রে লেখা, শেষ ছত্রটি অবলুপ্ত।

১ ···নেন স[ং]বগিয়[া]নং [তলদিনস][1]। [সম দিন সু][2]
২ [ম]াতে। সুলখিতে পুডনগলতে এ[ত]ং
৩ [নি]বহিপয়িসতি। সংবগিয়ানং [চ] [দিনে].
৪ [ধা]নিয়ং নিবহিসতি। দংগা[3]তিয়ায়িকে [দেবা
৫ তিয়া][4]য়িকসি। সুঅ[া]তিয়ায়িক[সি]পি। গণ্ড[কেহি]
৬ ···[5] [য়ি]কেহি এস কোঠাগালে কোসং···
৭ ···

যে শব্দগুলি অবিকৃত ও স্পষ্টার্থ তার মধ্যে বিশেষ মূল্যবান্ হ'ল 'পুডনগলতে' অর্থাৎ পুণ্ড্রনগর (পরবর্তী কালে পৌণ্ড্রবর্ধন)[6] থেকে। 'সুলখিতে' শব্দটি অবিকৃত হ'লেও স্পষ্টার্থ নয়। শব্দটি যদি অব্যবহিত পূর্ববর্তী পদটির সঙ্গে সম্বদ্ধ থাকে তবে শব্দটির সংস্কৃত ছায়া হবে "সুরক্ষিতঃ", তখন এটিকে ব্যক্তিনাম ব'লে ধরতে হবে। আর যদি শব্দটি পরবর্তী পদের সঙ্গে সম্বদ্ধ হয় তবে সংস্কৃত ছায়া হবে "সুলক্ষ্মীতঃ", পঞ্চমীর পদ, মানে সমৃদ্ধিমান্। 'নিবহিসতি' ও '[নি]বহিপয়িসতি' ভবিষ্যৎ কালের পদ, যথাক্রমে নি + বহ ধাতু ও সে ধাতুর নিজন্ত রূপ থেকে। অর্থ, বয়ে অথবা অগ্রণী হয়ে নিয়ে যাওয়া, ভরণ করা (অনিজন্ত); নিয়ে যেতে দেওয়া, ঠেলা দিয়ে কাজ শুরু করা (নিজন্ত); 'সংবগিয়ানং' ষষ্ঠ্যন্ত পদ, মূল শব্দ সকলে ধরেছেন 'ষড়্‌বর্গীয়'। এ শব্দটির মানে হ'ল, যারা ছজনের দলে বিভক্ত, অথবা ছয় ইন্দ্রিয় ঘটিত, অথবা সবৎস ছয় গাভী। মানে যাই হোক ভাষাবিজ্ঞানের মতে সংস্কৃত 'ষড়্‌বর্গীয়' শব্দ প্রাকৃতে 'সবগিয় (= সব্‌বগ্‌গিয়)' কিংবা

---

[1] পাঠ দীনেশবাবুর। 'গলদনস' ভাণ্ডারকর, 'তলদনস' বড়ুয়া।
[2] পাঠ দীনেশবাবুর। 'দুম দিন মহা' ভাণ্ডারকর, 'দুমং দিনং স' বড়ুয়া.
[3] পাঠ ভাণ্ডারকরের। দীনেশবাবুর পাঠ 'দশ'। [4] ভাণ্ডারকরের পাঠ।
[5] 'ধানি' ভাণ্ডারকর, 'কাকনি' বড়ুয়া।
[6] পুণ্ড্রনগর-পৌণ্ড্রবর্ধনের ভূমিই আধুনিক মহাস্থান, পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন।

'ছবগিয়' (=ছব্‌বগ্‌গিয়)' হওয়া উচিত, 'সংবগিয়' (=সং-বগ্‌গিয়) নয়। মূল শব্দ যদি 'সংবর্গ্যীয়' ধরা যায় তাহ'লে ভাষাবিজ্ঞানের আপত্তি এড়ানো যায় এবং অর্থসঙ্গতিও বিশদ হয়। 'সংবর্গ্যীয়' শব্দটি আনুমানিক, 'সংবর্গ্য' থেকে উৎপন্ন। 'সংবর্গ্য' এসেছে সম্‌+বৃজ্‌ ধাতু থেকে, মানে সংগ্রহ করা, আত্মসাৎ করা, নিজের করা। 'সংবর্গ্য' শব্দটির মানে—যা বাড়াতে হবে, বৃদ্ধির (কথ্য ভাষায় বাড়ির) যোগ্য। অতএব সহজে অনুমান করতে পারি যে 'সংবগিয়' মানে ছিল যারা বাড়ি-ধান সংগ্রহ করে। 'কোঠাগালে' স্পষ্টই সংস্কৃত 'কোষ্ঠাগারঃ' ('কোষ্ঠাগারে'—সপ্তমীর পদও হতে পারে, তবে 'এস' থাকায় তা সম্ভব নয়)। কোষ্ঠাগারের উল্লেখ থাকায় 'ধানিয়ং' (<ধান্যম্‌) পাঠ-গ্রহণে আপত্তি ওঠে না। 'দংগাতিয়ায়িকে' (সংস্কৃত "দ্রঙ্গাত্যয়িকঃ") মানে সীমান্ত ঘাঁটিতে বিঘ্ন বা জরুরি ব্যাপার (emergency)। '[দেবাতিয়া]য়িকসি' পাঠ ঠিক হ'লে, সংস্কৃত "দৈবাত্যয়িকে", মানে অনাবৃষ্টি বন্যা ইত্যাদি দৈববিঘ্ন ঘটলে। 'সু অ[া]তিয়ায়িক [সি]', সংস্কৃত "স্ব-আত্যয়িকে", মানে নিজের বিঘ্ন ঘটলে। 'গণ্ড…' সম্ভবত আধুনিক গণ্ডা, কোন ব্যক্তির প্রাপ্তব্য অথবা প্রদাতব্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ। প্রথম ছত্রের আনুমানিক পাঠ 'তলদিনস' ঠিক হ'লে সংস্কৃত ছায়া হয় "তরদত্তস্য" (*তরদিন্নস্য), মানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দেওয়ার সম্পর্কে।[১] আনুমানিক পাঠ 'সম দিন' সংস্কৃতে "সমং * দিন্নম্‌" অথবা "সম্যক্‌ * দিন্নম্‌", মানে এক সঙ্গে (অথবা সম্পূর্ণ) দেওয়া হল। '[সু]মাতে' ব্যক্তিনাম অথবা পদবী ধ'রে নিতে পারি।

উপরের টীকা অনুসারে মহাস্থান শিলালেখের এই ভাবে অনুবাদ সঙ্গত

১ ……ধান্যসংগ্রহকারীদের দেওয়া নিয়ে যাওয়ার (ধান) সব দেওয়া হ'ল।

[১] বড়ুয়ার পাঠ ধরলেও এই মানে পাই, সংস্কৃত "তরদানস্য"

২ সুমাত সমৃদ্ধ পুণ্ড্রনগর থেকে এই
৩ ডেলিভারি দেবে। সংগ্রহকারীদের দেওয়া
৪ ধান নিয়ে যাওয়া হবে। সীমান্ত ঘাটিতে হাঙ্গাম (হ'লে) দৈবদুর্বিপাক
৫ হ'লে, নিজেদের মধ্যে হাঙ্গাম হ'লেও নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ
৬ ······দিয়ে এই কোষ্ঠাগার (অথবা কোষ্ঠাগারে) কোশ···
৭ (পুরিয়ে দিতে হবে)·······

ক্ষুদ্র প্রত্নলিপিটি থেকে সেকালের যৎকিঞ্চিৎ খাঁটি খবর মিলছে। লোকে এক জোট হয়ে ধান বাড়ি নিত। দেশের স্থানে স্থানে কোঠা খামার ছিল। "গণ্ড" শব্দটি থেকে সেকালে কড়ির প্রচলনও অনুমান করতে পারা যায়। অবশ্য গণ্ডা সেকালের মুদ্রা পুরাণ কপর্দকও বোঝাতে পারে।

মহাস্থান শিলাচক্রলিপি এবং অশোকের শিলা ও স্তম্ভ লিপিমালার সমসাময়িক (কারো কারো মতে হয়ত ঈষৎ প্রাচীনতর) একটি ছোট তাম্র-ফলকলিপি পাওয়া গিয়েছিল উত্তর প্রদেশের পূর্ব প্রত্যন্তে গোরখপুর জেলায় সোহ্গৌরা গ্রামে। এ অঞ্চল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বৃহত্তর বঙ্গভূমির বাইরে ছিল না। দুটি বিশিষ্ট শব্দ থেকে ('কোঠগলনি' ও 'অতিয়ায়িকয়') এমনই বোঝা যায় যে তাম্র-ফলকশাসনটির বিষয় কিছু যেন শিলাচক্রলিপিটির অনুরূপ। তবে শাসনের বক্তব্যের চেয়ে বেশি মূল্যবান্ হল তাম্রফলকশীর্ষে আঁকা ছবির সারি। বাঁ দিক থেকে ধরলে প্রথমে পাই চৌখুপি চতুষ্কোণ ঘেরার মধ্যে একটি ত্রিপত্র গাছ (অথবা শাখা)। তার পরে চার খুঁটির উপর দোতলা (?) আটচালায় তিনটি দাণ্ডা চূড়ার মতো বেরিয়ে আছে। আটচালার ছাউনি খড়ো। তার পরে একটি দাঁড় করানো পত্রাকার ধ্বজ (অথবা কেরোয়াল)। তার পরে তিনটি অর্ধবৃত্তের স্তূপ, তার উপর অর্ধবৃত্ত এবং তার ভিতর বিন্দু (অর্থাৎ যেন বড় চন্দ্রবিন্দু)। তার

পরে শূন্যে একটি অর্ধবৃত্তাকার কানাদেওয়া পাত্র একটু কাত করা আর তার নীচে একটি গোলক যার ফাঁদ পাত্রের চেয়ে একটু ছোট। তার পরে ছ-চৌখুপি লম্বা চতুষ্কোণ ঘেরার মধ্যে এক ত্রিভঙ্গিম, শাখাযুক্ত, নিষ্পত্র বৃক্ষ। তার পরে আবার একটি তেমনি আটচালা একটু যেন বড়।[১] ফলকটিতে চারটি ছিদ্র আছে, দেওয়ালের গায়ে এঁটে দেবার জন্যে। ছিদ্রগুলি কোন অক্ষর বা ছবি ক্ষত করেনি, নীচের ডাইনের ছিদ্রটি দেখলে বোঝা যায় যে ছিদ্র করবার পর লিপি উৎকীর্ণ হয়েছিল। শাসনটিতে দুটি কোষ্ঠাগারের উল্লেখ আছে। ছবির আটচালা দুটি, বাঁশের খুঁটির উপর খড়ের ছাউনি করা আটচালা খামার (<স্কন্ভাগার) ব'লে মনে হয়। সম্ভবত কোষ্ঠাগার দুটির প্রতীক-লাঞ্ছন।

সোহগৌরা তাম্র-ফলকলিপি প্রায় অক্ষুণ্ণ এবং সহজপাঠ্য। পাঠ এই

১ সবতিয়ান মহমগন সসনে মনবসিতি ক

২ ড সি[ি]ল মাতে উসগমে ব এতে দবে কোঠগলনি

৩ তি[য়]বেনি মাথুল চচু মোদাম ভলকন ব

৪ ল কয়িয়তি অতিয়ায়িকয় নো গহিগতয়

ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা শাসনটির অনেকরকম অর্থ করেছেন এবং 'মহমগন' ও 'গহিগতয়' শব্দ দুটির পাঠ 'শুদ্ধ' করে নিয়েছেন 'মহমতন' ও 'গহিতবয়'। 'তি[য়]বেনি মাথুল চচু মোদাম ভলকন' এগুলিকে স্থাননাম বিবেচনা ক'রে এবং কোন রকম পাঠপরিবর্তন না ক'রেও শাসনটির সহজ ও সুগম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তা নীচে দেওয়া সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদ থেকে বোঝা যাবে।

১ চিত্র দ্রষ্টব্য। ছবিগুলির ব্যাখ্যা 'ধর্মে' অধ্যায়ে করা হয়েছে

সংস্কৃত

১ শ্রাবস্ত্যানাং মহামার্গাণাম্ শাসনং। "মনবসিতি" কটাৎ।

২ সিলিমাতে উসগ্রামে এব দ্বে কোষ্ঠাগারে।

৩ "তিয়বেনি"-মাথুর-"চচু"-"মোদাম"-ভারকানাং

৪ বারঃ *কর্যতে (=ক্রিয়তে)। আত্যয়িকায়। নো গৃহিগতয়ে।

বাংলা

১ শ্রাবস্তীর প্রধান মার্গগুলির সম্পর্কে ব্যবস্থা। "মনবসিতি" অঞ্চল থেকে।

২ সিলিমাত ও উসগ্রামে-ই দুটি কোষ্ঠাগার।

৩ ত্রিবেণী (=প্রয়াগ), মথুরা, "চচু" ও "খোদাম" (—এই স্থানগুলির উদ্দেশ্যে) চালান করা মালগুলির সম্পর্কে

৪ নিষেধ করা হ'ল। গোলমালের পক্ষে। সংসার-প্রয়োজনের পক্ষে নয়।

মৌর্য অর্থাৎ অশোকের বংশ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে উচ্ছিন্ন হয় এবং মৌর্যরাজার সেনাপতি শুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্র তা অধিকার করেন। এঁরা পূর্বদেশেরই লোক ব'লে মনে হয়। শুঙ্গ বংশ নেহাত অর্বাচীন নয়, পাণিনির একটি সূত্রে (৪.১.১১৭) এই নাম পাওয়া গেছে। শুঙ্গদেরও রাজধানী পাটলিপুত্র। পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলি পুষ্যমিত্র শুঙ্গের অশ্বমেধ যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেছিলেন ব'লে অনুমান করা হয়। মনে হয় পতঞ্জলিও পূর্বদেশের লোক ছিলেন। তাঁর মহাভাষ্যে প্রদত্ত উদাহরণগুলি থেকে এদেশের লোক-ব্যবহার সম্বন্ধে টুকিটাকি খবর পাওয়া যায়। তা মূল্যবান্। কিছু বলছি।

পতঞ্জলির সময়ে এদেশে উচ্চবর্ণ বলতে ছিল ব্রাহ্মণ, রাজন্য (ক্ষত্রিয়) এবং বিশ্ (বৈশ্য)। নীচবর্ণ বলতে ছিল শূদ্র এবং শূদ্রের

মধ্যে তিন ভেদ ছিল—জলচল, জল-অচল এবং অন্ত্যজ। ব্রাহ্মণেরাও কায়িক পরিশ্রম করত, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ধান কাটতে চট বুনতে পিছপা হ'ত না। ভালো বংশের ব্রাহ্মণদের চেহারায় এই বিশেষত্ব নির্দেশ করেছেন পতঞ্জলি,—গৌরবর্ণ, পিঙ্গলচক্ষু, কপিলকেশ, শুচি-আচার। যাদের আচার শুচি নয় তারা দাঁড়িয়ে মূত্রত্যাগ করে, চলতে চলতে খায়। এমন যার আচার সে গৌরবর্ণ হলেও "অব্রাহ্মণ"। যাঁরা শিষ্ট এবং আচারনিষ্ঠ তাঁরাই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। যাঁরা ব্যাকরণ প'ড়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা শিষ্ট অর্থাৎ শিক্ষিত। তাঁরাই আচারনিষ্ঠ যাঁরা আর্যাবর্তের সদাচার পালন করেন। আর্যাবর্তের চৌহদ্দিও নির্দেশ করেছেন পতঞ্জলি,—"প্রাগ্ আদর্শাৎ প্রত্যক্ কালকবনাদ্ দক্ষিণেন হিমবন্তম্ উত্তরেণ পারিযাত্রম্।" অর্থাৎ আদর্শের পূর্ব, কালকবনের পশ্চিম, হিমালয়ের দক্ষিণ, ও পারিযাত্রের উত্তর—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূমি আর্যাবর্ত। এর মধ্যে হিমালয় ও পারিযাত্র (পশ্চিম বিন্ধ্যপর্বত) জানা আছে, আর দুটি জানা নেই। অনুমান করা হয় আরাবল্লী পর্বতই এই "আদর্শ"। কজঙ্গল (পূর্ব বিন্ধ্যপর্বতের শেষ প্রান্ত, রাজমহল পাহাড়) পতঞ্জলি উল্লিখিত "কালকবন" হ'তে পারে। শুধু ভৌগোলিক বিচারে নয় ভাষাবিজ্ঞানের বিচারেও এই সমীকরণ সমর্থিত হয়। কজঙ্গল নামটি সম্ভাব্য *'কজ্জল-জঙ্গল' থেকে আসতে পারে, এবং তা যদি হয় তবে কালক-বন (=কালো বন) কজঙ্গলের (অর্থাৎ কাজল কালো বনের) সমার্থক।

এই আর্যনিবাসের অধিবাসী প্রকৃত ব্রাহ্মণ যিনি তাঁর গৃহে কয়েক কলসীর বেশি ধান সঞ্চিত থাকে না। তিনি অলোলুপ, তিনি কোনো প্রয়োজনবশে কোনো চাপে বিচলিত হন না, তিনি কোনো না কোনো বিদ্যায় পারগ। এমন মহাশয়েরাই শিষ্ট।

কোন শূদ্রদের জলচল বলা হয়? এই প্রশ্ন তুলে উত্তরে পতঞ্জলি বলেছেন, "যজ্ঞাদ্ অনিরবসিতানাম্", অর্থাৎ যজ্ঞস্থান (বা যজ্ঞকার্য) থেকে বিতাড়িত নয় যারা। তার মানে যে-শূদ্র যজ্ঞকার্যে যোগাড়ের

কাজ করতে পারত, এখন যেমন বামুনের পূজার কাজে নাপিত ইত্যাদি। পতঞ্জলি এদের নাম করেছেন, যেমন ছুতার ("তক্ষ"), কামার ("অয়স্কার"), রজক, তন্তুবায়। এরাই ছিল তখনকার সৎশূদ্র। জল-অচল অর্থাৎ সাধারণ শূদ্র যারা তাদের পতঞ্জলি বলেছেন "পাত্রাদনিরবসিতানাম্", অর্থাৎ যারা আর্যদের বাসনকোসন ব্যবহার করতে পারত, তাদের ব্যবহারের পরে পাত্র ফেলে দিতে হত না। অন্ত্যজ অর্থাৎ তৃতীয় স্তরের শূদ্র যারা তারা ব্যবহার করলে বাসনপত্র শুদ্ধ ক'রেও নেওয়া যেত না, ফেলে দিতে হ'ত। এরা ছিল "নিরবসিত" শূদ্র!

সেকালে লোকবসতির স্থান অর্থাৎ জনপদগুলির প্রকার চার রকমের ছিল,—গ্রাম, ঘোষ, নগর, সংবাহ। গ্রাম ও নগরের পার্থক্য মোটামুটি আমরা বুঝি বড়, এবং প্রাকার অথবা পরিখাবেষ্টিত হ'লে নগর, নতুবা গ্রাম। গোপালকদের গ্রাম (—অর্থাৎ ব্রজধাম—) হ'ল 'ঘোষ', সাধারণত নদীতীরে অবস্থিত, সুতরাং অল্পবিস্তর যাযাবর।[১] 'সংবাহ' ছিল গঞ্জ—যেখানে জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া ও বয়ে নিয়ে আসা হ'ত বেচাকেনার জন্যে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গভূমিতে সংবাহ 'বীথী' নামে পরিচিত ছিল।

তখন ভাত ("ওদন") ছিল সকলেরই প্রধান খাদ্য। উত্তম অন্ন ছিল শালি ধানের। মাছ মাংস ব্রাহ্মণেও খেত, তবে সবাই নয়। যবের ছাতু গুলে সরবতের মতো খাওয়া হ'ত। ধান যব মাষ মুগ তিলের চাষ হ'ত। সর্ষের তেলের উল্লেখ আছে, সুতরাং সর্ষেরও চাষ হত।

পূজার জন্যে দেবমূর্ত্তি গড়া হ'ত। লোকে তা কিনত।[২] বৃক্ষ-দেবতার পূজাও পতঞ্জলির সময়ে অজানা ছিল না। "শাংসপাস্থলা

১ পতঞ্জলির একটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য। "গমিষ্যামো ঘোষান্ পাস্যামঃ পয়ঃ শয়িষ্যামহে পূতীকতৃণেষু",—'অর্থাৎ আমরা যাব ঘোষে খাব দুধ শোব নরম ঘাসে।'

২ মহাভাষ্য ৫. ৩. ৯৯ দ্রষ্টব্য।

দেবাঃ”—শিশুগাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শিশু গাছের তলায় প্রতিষ্ঠিত দেবীর পূজা এখনও অজ্ঞাত নয়।

সামাজিক নিমন্ত্রণে পংক্তিভোজন (“সমাশ”) হ’ত দুরকমে। এক ছিল মালসাভোগ, পতঞ্জলির কথায় “সরাবৈঃ”, আর এক ছিল পাত পেড়ে ভাত (“ওদনম্”)। এখনকার মতো তখনও নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য রাখা হ’ত। পতঞ্জলি বলেছেন, “ঋদ্ধেষু ভুঞ্জানেষু দরিদ্রা আসতে,”—‘বড়লোকেরা যখন খায় তখন দরিদ্ররা ব’সে থাকে।’

সেকালে মদ্যপান চলত। রাজা রাজড়ারা বিলাতি মদও খেতেন। এ মদ বিশিষ্ট পাত্র (amphora) ভর্তি হয়ে ইউরোপ থেকে আসত। সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতে এক প্রাচীন পরিত্যক্ত বন্দরে এই রকম বিলাতি মদের পাত্র প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আবিষ্কার করেছেন। পূর্ব-ভারতেও ব্রাহ্মণ ও শিষ্টদের মধ্যে দেশি ও বিদেশি মদ খাওয়ার রীতি একেবারে বোধহয় অজ্ঞাত ছিল না। উন্মত্তভাষণের উদাহরণরূপে সেকালের একটি উদ্ভট শ্লোক (“ভ্রাজ”) মহাভাষ্যের উপক্রমণিকায় উল্লেখ করেছেন পতঞ্জলি। শ্লোকটি উদ্ধৃত করছি। মনে হয়, এই শ্লোকে যে আধারের উল্লেখ আছে তা বিদেশি মদ্যাধার (amphora) এবং সে পাত্রের আধেয়ও হয়ত বিলাতি মদ।

যদ্ উদুম্বরবর্ণানাং ঘটীনাং মণ্ডলং মহৎ।
পীতং ন গময়েৎ স্বর্গং তৎ কিং ক্রতুগতং নয়েৎ॥

‘ফাঁদালো, গণ্ডী করে সাজানো ডুমুররঙা ঘটিগুলি সাবাড় করলেও যদি স্বর্গে যাওয়া না যায় তবে তা কি যজ্ঞকুণ্ডে ঢাললে হবে?’

সেকালের বামুন-ঘরের মেয়েরাও মদ্যপান করত। তা না হলে পতঞ্জলি ‘সুরাপী’ ও ‘সুরাপা’ স্ত্রীলিঙ্গ পদ দুটির সিদ্ধি স্বীকার ক’রে নিয়ে এমন উদাহরণ দিতেন না,—“যা ব্রাহ্মণী সুরাপী ভবতি নৈনাং দেবাঃ পতিলোকং নয়ন্তি”, অর্থাৎ—‘যে ব্রাহ্মণনারী সুরাপান করে তাকে দেবতারা পতিলোকে যেতে দেন না।’

নীচ এবং বদ লোকে পেঁয়াজের চাট দিয়ে মদ্য পান করত! পতঞ্জলি উদাহরণ দিয়েছেন,—"বৃষলরূপোঽয়ম্। অপ্যয়ং পলাণ্ডুণা সুরাং পিবেৎ", অর্থাৎ—'একে দেখাচ্ছে বদ ছোটলোক। হয়ত এ পেঁয়াজ দিয়ে মদ খেয়েছে।'

লোকে সাধারণত ঘরে সুতো কাটত আর তন্ত্রবায়কে দিয়ে কাপড় বুনিয়ে নিত। ভদ্রলোকেরাও প্রয়োজন মতো চট ও মাদুর চাটাই বুনত। সাধারণ ভদ্রলোক প'রত জোড় ("শাটক যুগ")—অর্থাৎ কাপড় ("অন্তরীয়", অধোবাস) এবং চাদর ("উত্তরীয়")।[১]

পতঞ্জলি রেশমি বস্ত্রের উল্লেখ অনেকবার করেছেন। মনে হয় তাঁর সময়ে রেশমি কাপড়ের বড় আড়ত ছিল কাশী এবং মথুরা। পতঞ্জলি বলেছেন, "গুণান্তরং খল্বপি শিল্পিন উৎপাদয়মানা দ্রব্যান্তরেণ প্রক্ষালয়ন্তি। অন্যেন শুদ্ধং ধৌতকং কুর্বন্ত্যেন্যেন শৈফালিকম্ অন্যেন মাধ্যমিকম্।"—অর্থাৎ, 'রঙের তফাৎও হয়। প্রস্তুত করবার সময় শিল্পীরা বিশেষ বিশেষ দ্রব্য দিয়ে প্রক্ষালন করে। এক দ্রব্য দিয়ে শুদ্ধ (সাদা) ধুতি করে, অন্য দ্রব্য দিয়ে শিউলি রঙ করে, অন্য দ্রব্য দিয়ে মাঝামাঝি (গঙ্গাজলি ?) রঙ করে।'

সেকালে সাধারণ গৃহস্থসংসারে সচ্ছলতার আদর্শ ছিল নিতান্তই সহজ সরল। সকল লোকেরই নিজের বাড়ী, সুতরাং কিছু কাঁসার তৈজসপত্র আর দুধ ভাতের সংস্থান থাকলেই ভরপুর। সেকালের একটি ছোট চমৎকার বৈঠকি গল্প বলেছেন পতঞ্জলি। সে গল্পটিতে সেকালের সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে একটা হদিশ পাই। সেকালের কুমারী মেয়েদের পতিলাভার্থে ইন্দ্রপূজার, এখনকার ইতুপূজার ব্রতকথার মতো, গল্পটি। এক আইবড় থুবড়ো মেয়ে ইন্দ্রপূজা ক'রে ইন্দ্রকে প্রসন্ন করেছে। তারপর

---

[১] 'শাটক' হ'ত শক্ত সুতার ফালি বুননি ক'রে নিয়ে তার পর ফালি জুড়ে জুড়ে। 'ধুতি' ছিল নরম সুতার এবং প্রত্যহ কাচবার উপযুক্ত।

বৃদ্ধকুমারীন্দ্রোণোক্তা বরং বৃণীষ্বেতি। সা বরমবৃণীত পুত্রা মে
বহুক্ষীরঘৃতম্ ওদনং কাংস্যপাত্র্যাং ভুঞ্জীরন্ন্ ইতি।
ন চ তাবদ্ অস্যা পতি র্ভবতি কুতঃ পুত্রাঃ কুতো গাবঃ কুতো ধান্যম্।
তত্রানয়ৈকেন বাক্যেন পতিঃ পুত্রা গাবো ধান্যমিতি সর্বং সংগৃহীতং
ভবতি॥

'আইবড় থুবড়ো মেয়েকে ইন্দ্র বললেন, বর নাও। সে বর চাইলে, পুত্রেরা আমার যেন কাঁসার থালায় প্রচুর ঘি দুধ দিয়ে ভাত খায়। তার তো বিয়েই হয়নি, কোথায় ছেলে, কোথায় গোরু, কোথায় ধান। সেখানে সে এক কথাতেই পতি পুত্র গোরু ধান সব পেয়ে গেল॥'

সেকালে ধানজমিতে সেচ দেবার জন্যে খাল কাটা হ'ত। সে খালের জলে সব কাজই চলত॥[১]

[১] "শাল্যর্থং কুল্যা প্রণীয়ন্তে তাভ্যশ্চ পানীয়ং পীয়ত উপস্পৃশ্যতে চ শালয়শ্চ ভাব্যন্তে।" অর্থাৎ শালিধানের জন্যে খাল কেটে নিয়ে যাওয়া হয়, তার জল খাওয়া হয় হাতমুখ ধোওয়া হয় ধানেরও বৃদ্ধি হয়।

৩

প্রথম চার খ্রীষ্টপর শতাব্দী

মৌর্য শুঙ্গ শক কুষাণ ইত্যাদি কোন রাজবংশের অধিকারে বঙ্গভূমি কখনো ছিল কি ছিল না সে বিষয়ে অনুমান করা যায় এমন কোন চিহ্ন নেই, কেবল এখানে ওখানে পাওয়া প্রাচীন মুদ্রা ছাড়া। কিন্তু মুদ্রা পাওয়া থেকে অধিকারের প্রমাণ হয় না। মুদ্রার প্রচলন বায়ু-সঞ্চরণেরই সঙ্গে তুলনীয়। তবে অধিকার হোক বা না হোক কোন রকম অভিযান হয়েছিল অনেকবার, এবং সেই সব অভিযানের ফলেই এদেশে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন ও প্রসার ঘটেছিল।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের বিরুদ্ধ যে দুটি প্রবল ধর্মমত জেগেছিল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সে দুটি ধর্মেরই উদ্ভব হয়েছিল ভারতবর্ষের প্রাচ্য অংশে, মগধ-অঙ্গ বিষয়ে। জৈন এবং বৌদ্ধ উভয় ধর্মই অল্পবিস্তর রাজপুষ্ট ছিল, তবে নানা কারণে বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্মের তুলনায় বেশি জেঁকে উঠেছিল। দুটি ধর্মই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিপরীতমুখী। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যা সর্বস্বীকৃত রূপ ছিল তাতে ধর্মকর্ম বলতে নিত্যযজ্ঞ অগ্নিহোত্র এবং নৈমিত্তিক যজ্ঞ বাজপেয় অশ্বমেধ রাজসূয় ইত্যাদি। যজ্ঞ করলে দেবতারা সন্তুষ্ট হ'য়ে নানাবিধ কাম্য ভোগ দেন। সেকালের সাধারণ গৃহস্থের (ব্রাহ্মণের) আধ্যাত্মিক বাসনা কেমন ধরণের ছিল তা পতঞ্জলি ফাঁস করে দিয়েছেন।[১]

'তেমনি বসন্তে ব্রাহ্মণ অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ করবে। সেই যাগের কিছু উদ্দেশ্য বলা হ'ল। কী? স্বর্গলোকে অপ্‌সরারা পত্নী হ'য়ে তাকে শয্যাসঙ্গ দেবে।'

[১] "তথা বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নিষ্টোমাদিভিঃ ক্রতুভির্যজেতেতীজ্যায়াঃ কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমুক্তম্। কিম্। স্বর্গে লোকেঽপ্‌সরস এনং জায়া ভূত্বোপশেরতে ইতি॥"

ব্রাহ্মণ্য আধ্যাত্মিকতা অবশ্য এখানেই ঠেকে থাকে নি। অশ্বমেধের মতো যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড গঙ্গা-যমুনার অন্তর্বেদীতে পিছনে ফেলে রেখে পূর্ব ও উত্তরে যা প্রসারিত হয়েছিল সেই উপনিষদের চিন্তা বৌদ্ধ ও জৈন মতের চেয়ে কম বিপ্লবকারী ছিল না, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পক্ষে। ঔপনিষদ বৌদ্ধ এবং জৈন—তিনটি মতই প্রাচ্য ভারতে উদ্ভূত এবং তিনটি মতই অনীশ্বর। ঔপনিষদ মতে "সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম", সুতরাং দুঃখ সুখ অর্থহীন, যজ্ঞের তো কথাই নেই, কষ্টচর্যা ও তপস্যা মূঢ়তা মাত্র। বৌদ্ধমতে সর্বশেষ শূন্যে। দুঃখ সুখ আছে বটে, তবে একটাকে বাদ দিয়ে অপরটার অস্তিত্ব নেই, সুতরাং দুঃখবর্জনের জন্যেই সুখ পরিত্যাগ করতে হবে। জৈনমত বৌদ্ধমতেরই অনুরূপ, তবে এত স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত নয়। দুই মতেরই নীতি অহিংসা। তবে জৈন মতে অহিংসা-ধর্মের বাড়াবাড়ি হয়েছে এবং দুঃখভোগ অর্থাৎ তপস্যার উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। দুই মতেই জাতিবিচার নেই। তবে যাঁরা গৃহস্থ উপাসক তাঁরা জাতিবিচার করতেন। শুধু তাই নয়, এদেশে ব্রাহ্মণ্য মতের সমাজব্যবস্থার একেবারে বাইরে তাঁরা ছিলেন না।

উত্তরাপথে বৌদ্ধধর্ম যে বিশেষ রূপ নিয়েছিল, যাকে মহাযান বলা হয়, সেই মত, প্রাচীন হীনযান মতের সঙ্গে, মগধ থেকে বাংলা দেশে এসেছিল প্রধানত গঙ্গাপথ ধ'রে। এ কাজ খ্রীষ্টপূর্ব কালে শুরু হয়েছিল এবং চলেছিল একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। বৌদ্ধধর্ম সমাজের উচ্চ স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। জৈনধর্ম প্রসারিত ছিল সাধারণত একটু নিম্ন স্তরের মধ্যেই। এ ধর্ম এসেছিল কলিঙ্গ ও সুহ্মের মধ্য দিয়ে, সম্ভবত বৌদ্ধ ধর্মের আগমনের কিছুকাল আগেই। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর মধ্যেই বাংলা দেশে জৈনধর্ম মিলিয়ে আসে। বৌদ্ধধর্ম এদেশে প্রধানত গঙ্গাপথে এসেছিল ব'লে মনে হয় এই জন্য যে এ ধর্মের প্রথম এবং প্রধান ঘাঁটি ছিল পৌণ্ড্রবর্ধন।

কলিঙ্গ-রাজ খারবেলের অনুশাসন (হাতিগুম্ফা ভুবনেশ্বর, খ্রীষ্টজন্ম শতাব্দী) অশোক অনুশাসনের পরেই দক্ষিণপূর্ব ভারতে সর্বপ্রাচীন মূল্যবান্ প্রত্নলেখ। অনুশাসনে খারবেল জানিয়েছেন যে তিনি নানা দিকে বিজয় অভিযান চালিয়েছিলেন। তিনি অঙ্গ ও মগধের ধন আহরণ করেছেন, তাঁর হাতিঘোড়াকে গঙ্গায় জল খাইয়ে এনেছেন। অনুশাসনটিতে বাংলা দেশের উল্লেখ নেই, তবে তিনি যেভাবে মগধ-শক্তির উল্লেখ করেছেন (—"মগধানাং চ বিপুলং ভয়ং জনেন্তো হথসং গঙ্গায় পায়য়তি"—) তাতে মনে হয় যে তাঁর দৃষ্টিতে মগধ বলতে বাংলা দেশও বোঝাত। হয়ত তখনও বাংলা দেশের একটা বড় অংশ পাটলীপুত্র থেকে শাসিত হ'ত।

কালিদাস রঘুবংশে রঘুর দিগ্‌বিজয় প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট দেশগুলির উল্লেখ করেছেন এবং ইন্দুমতীর স্বয়ংবর প্রসঙ্গে দেশের রাজ-শাসিত অঞ্চলগুলির নাম করেছেন। তাঁর বিবরণ দুটি মিলিয়ে দেখলে জানতে পারি যে কালিদাসের জ্ঞানে মগধের রাজা রাজ-কৌলীন্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং অঙ্গ দেশের রাজার বিশেষ গৌরব ছিল। অন্যত্র তিনি সুহ্ম ও বঙ্গ জাতির উল্লেখ করেছেন কিন্তু তাদের রাজার নাম করেন নি। কালিদাসের এই বিবরণের মূলে সত্য থাকলে বুঝতে হবে যে তখন বাংলা দেশের কোন বৃহৎ অঞ্চলই রাজ-শাসিত ছিল না। সম্ভবত তখনও এদেশে জনবসতি ঘন এবং অবিচ্ছিন্ন হয় নি। জঙ্গল পাহাড় নদী ও খাদে আকীর্ণ এই দেশের বৃহৎ জনপদগুলি দলপতির অধীনে আত্মরক্ষা করত—স্থলবর্ত্মে এবং জলপথে। যতদিন না বাইরের অথবা ভিতরের কোন ব্যক্তি অথবা দল শক্তিতে প্রবল হ'য়ে সংহত হ'য়ে স্থলপথে এবং—পরে—জলপথে এদেশের অল্পাধিক বিচ্ছিন্ন জনগণকে বশে আনতে পেরেছিল ততদিন এদেশে রাজ-শাসনের আবির্ভাব ও রাজবংশের পত্তন হয় নি। বাণভট্ট (সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে) এক সুহ্মরাজার সম্বন্ধে কিছু জনশ্রুতি অবগত

ছিলেন। তিনি লিখেছেন, কর্ণোৎপলের মধুতে বিষ মিশিয়ে তাই দিয়ে তাড়না ক'রে দেবরানুরক্ত রানী দেবকী সুহ্মরাজ দেবসেনকে হত্যা করেছিল।[১]

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের উন্নতি দু দিক দিয়ে ঘটছিল। প্রথম হ'ল চাষ। জল হাওয়ার ও পলি মাটির গুণে খাদ্যশস্যের অভাব কখনই ছিল না। সেকালের শিল্পশস্য কার্পাসও যথেষ্ট হ'ত। আগে উল্লেখ করেছি যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর অনেক কাল পূর্ব থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকায় (কাশী এবং কাশীর ভাটি থেকে পাটলীপুত্র এবং পাটলীপুত্রের ভাটি থেকে বহুদূর পর্যন্ত) রেশমি কাপড়ের উৎপাদন প্রচুর এবং সুষ্ঠু ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব দু-তিন শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টপর তিন-চার শতাব্দী পর্যন্ত—এবং সম্ভবত তার পরেও—বিদেশী নাবিকেরা এদেশের উৎপন্ন তুলার ও রেশমের কাপড় রপ্তানি করত। এই গাঙ্গেয় বাণিজ্যের সূত্রেই বাংলা দেশের সঙ্গে উত্তরাপথের জনসংযোগ দিন দিন ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। উত্তরাপথ থেকে আগত, ধনী ও শক্তিমানের গুরুপুরোহিত এবং মন্ত্রণাদাতা রূপে, এদেশে "মধ্যদেশ বিনির্গত" বিভিন্ন বেদশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদের অধিষ্ঠান হ'তে থাকে এবং তাঁদের সূত্রে যাকে এখন ঐতিহাসিকেরা "আর্য সভ্যতা" নাম দিয়েছেন সেই সংস্কৃত-আশ্রিত নব ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-ডিসিপ্লিন শুরু হয়। মোটামুটি সমুদ্র-গুপ্তের সময় থেকে এই ডিসিপ্লিনের আরম্ভ। তাঁর বংশের অধিকার-কাল শেষ হবার আগেই এই ডিসিপ্লিনের ফলে বঙ্গনিবাসীদের নিজস্ব রঙ ফুটতে শুরু হয়েছিল। তার আগে এদেশের জনগণের যে চেহারা ছিল তা এই রঙের প্রলেপের নীচে ঢাকা পড়ে আছে। তার কিছু আভাস পরবর্তী কালের ইতিহাস থেকে অনুমান করা দুরূহ নয়। বাংলা দেশের আদিম অধিবাসী কারা ছিল সে বিষয়ে নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ সমান কৌতূহলী। কিন্তু তারা যে-বর্গের বা

---

[১] হর্ষচরিত ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

গোষ্ঠীর মানব থাকুক না কেন—নেগ্রিটো অস্‌ট্রিক মোঙ্গলীয় দ্রাবিড়—আমাদের ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে তাদের একই মুখোস। তারা বাংলা ভাষার তদানীন্তন রূপধারী আর্য ভাষা-ভাষী। তবে এখন যেমন তখন আরও অনেক বেশি পরিমাণে, দেশের ভিতরে ও বাইরে অন্য ভাষা-ভাষী জনগণের ও জনপদের কমতি ছিল না। অন্য ভাষা-ভাষী এই সব জনগণের সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য তা তাদের ভাষায় নেই, তা আছে তাদের আর্য-ভাষী প্রতিবেশীদের আচারে-বিচারে ক্রিয়াকাণ্ডে শিল্পে-মননে অনুলিপ্ত হ'য়ে। যেহেতু সে অনুলেপ আবিষ্কার করা অসাধ্য সেহেতু দূর-অনুমান বা কল্পনা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু সে তো কল্পনা, ইতিহাস নয়। কেন না তাদের সম্বন্ধে আমাদের কাজে কিছুমাত্র তথ্য পৌঁছয়নি।

বাংলা দেশে কখন থেকে আর্য ভাষা প্রচলিত হয়েছে অথবা কখন থেকে এই অঞ্চলের লোকে আর্য-ভাষী হয়েছে তা আমরা জানি না। ঐতিহাসিকদের ধারণা, আর্য ভাষা এদেশে এসেছে পশ্চিম থেকে, মুখ্যত গঙ্গাতীর ধ'রে। একথা সত্য। কিন্তু আর্য-ভাষী কোন ভগীরথ যে ঋক্-যজুঃ-সাম এই ত্রি-বৈদিক সংস্কৃতির পুরোধা হ'য়ে এসে এদেশে আর্য ভাষার গঙ্গাস্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন এমন বোধ হয় নয়। আর্য ভাষা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে উত্তরপশ্চিম সীমান্তের মধ্যে দিয়ে এদেশে প্রবেশ করেছিল এবং কালক্রমে সমগ্র উত্তরাপথে এবং পূর্ব ভারতে বিস্তৃতিলাভ করেছিল। ভারতবর্ষের প্রবিষ্ট হবার পর থেকে আর্য-ভাষা কালক্রমিক এবং অবস্থানগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এসে বাংলা অসমিয়া উড়িয়া মৈথিলী ভোজপুরী অবধী পঞ্জাবী সিন্ধী মারাঠী রাজস্থানী গুজরাটী হিন্দী উর্দু প্রভৃতি বিভিন্ন আধুনিক আর্য-ভাষায় আঞ্চলিক রূপ ধারণ করেছে। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত থেকে বাংলা দেশে আর্য ভাষা পৌঁছতে অবশ্যই যথাযথ বিলম্ব হয়েছিল। সুতরাং এ অঞ্চলের আর্য ভাষার বিকৃতি বা পরিণতি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ও মধ্যদেশের তুলনায় যে-কোন সময়ে কম হ'তে বাধ্য—এ অনুমান ক'রতে

হয়। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ঠিক তার বিপরীত। ভারতবর্ষের সমসাময়িক ভাষার প্রথম নিদর্শন অশোকের অনুশাসনে। তাতে দেখি, পূর্ব অঞ্চলের ভাষায় বিকৃতি বা পরিণতি অপর অঞ্চলের তুলনায় অনেক গভীর। যেমন, অন্যত্র যেখানে "চাতুদস" পূর্ব ভারতে সেখানে "চাবুদস", এমন কি "চোদস"। অর্থাৎ পূর্ব অঞ্চলের ভাষায় দু-স্বর মধ্যবর্তী "ত" বিলুপ্ত হয়েছে। অন্য অঞ্চলের ভাষায় এরকম ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ আরও চার পাঁচ শ বছর পরে ঘটেছে। অশোকের পূর্বাঞ্চলীয় অনুশাসনের ভাষায় এমন আরও কিছু লক্ষণ আছে যা অন্য অঞ্চলের ভাষা থেকে অত্যন্ত পৃথক্। এর থেকে এই অনুমান অপরিহার্য মনে করি যে পূর্বাঞ্চলে আর্য ভাষার আগমন ঐতিহাসিকদের অনুমিত কালের অনেক আগেই ঘটেছিল। অর্থাৎ এ অঞ্চলে আর্য-ভাষার ইতিহাস প্রাচীনতর। এই অনুমান গ্রহণ করলে বলতে হয় যে ত্রি-বৈদিক আর্যদের পূর্বদিকে প্রসারের আগে থেকে এদেশে আর্য-ভাষীর বাস ছিল। তা যদি হয় তবে এদের ধরতে হবে প্রাক্-বৈদিক আর্য-ভাষী ব'লে। এই প্রসঙ্গে যদি বৈদিক গদ্য সাহিত্যে বর্ণিত দেবাসুর-বিরোধের গল্প বিশ্লেষণ করি তা হ'লে মনে হবে, পূর্বাঞ্চলের আর্য-ভাষীরাই বুঝি ত্রি-বৈদিক আর্য-ভাষীদের কাছে অসুর রূপে প্রতিপন্ন ছিল। দেবদের কাছে অসুরদের ভাষা দেবদের ভাষার তুলনায় নিকৃষ্ট ছিল। বস্তুত বহুকাল পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলের ভাষার উচ্চারণ অন্য অঞ্চলের লোকের অবজ্ঞাজনক ছিল। যেমন নবম শতাব্দীতে রাজশেখরের উক্তি

> গৌড়স্ত্যজতু বা গাথাম্ অন্যা বাস্তু সরস্বতী।

'গৌড়ীয়রা গাথা রচনা ছেড়ে দিক। নতুবা বাণী রূপ পরিবর্তন করুন।'

পূর্বাঞ্চলে অসুর-বসতির স্মৃতি একটি পুরাণকাহিনীর মধ্যে নিহিত থাকা সম্ভব। আগেই বলেছি, বরাহরূপী বিষ্ণুর ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে নরক-

অসুর জন্ম নিয়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষে ভৌম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিল। (পূর্বাঞ্চলের অন্য কোন কোন জনপদেও ভৌম বা ভূমিজ রাজবংশের এমনি দোহাই আছে।) এইখানে লক্ষিতব্য যে অন্যান্য অঞ্চলের প্রখ্যাত রাজবংশ সবই সূর্য ও চন্দ্র অর্থাৎ জ্যোতির্ময় দেবাংশে উৎপন্ন। কিন্তু পূর্ব অঞ্চলে তা নয়, সেখানকার রাজবংশের উৎপত্তি আকাশের জ্যোতিষ্ক থেকে নয়, মাটির গর্ভ থেকে—অসুরের বীর্যে। সূর্য ও চন্দ্র বংশের কাহিনীতে যেমন ক্ষেত্রজ পুত্রের দ্বারা বংশরক্ষার কথা পাই, ভৌম বংশের বেলায়ও তাই। তবে এখানে বীজী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস নন, লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নদ।

পূর্ব ভারতের এমনি নিজস্ব পুরাণকথা আরও ছিল। তবে সে সব কথা কোন সংস্কৃত পুরাণগ্রন্থে ঠাঁই পায় নি। সাহিত্যসূত্রে পাওয়া বাংলা দেশের ঐতিহ্যে তার সন্ধান মেলে। যথাস্থানে তার আলোচনা ক'রব।

ব্রাহ্মণ্য মতের দেবপূজা এদেশে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে বিশিষ্ট ছিল বিষ্ণুর ও শক্তি-দেবীর বিভিন্ন মূর্তির পূজা। তবে বিষ্ণুর উপাসনা যত গভীর এবং ব্যাপক ছিল দেবীর উপাসনা স্বভাবতই ততটা ছিল না। শিবের পূজাও ছিল, তবে শিব-উপাসনার প্রমাণ ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে পাই না। শিব-উপাসনার একটি বিশেষ রূপ এদেশে রূঢ়মূল ছিল। সে যোগী শিবের। শিব ঈশ্বর, তবে সর্বেশ্বর নন। তিনি যোগীদের গুরু, মহাজ্ঞানের একমাত্র অধিকারী। শিবের শিষ্য অথবা সহযোগী যোগী যাঁরা ছিলেন তাঁরা কঠোর ব্রহ্মচর্যপরায়ণ, তাঁরা দারপরিগ্রহ করেন নি। তাঁরা অজর অমর হ'য়ে ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করতেন, আর শিব গৌরীকে বিবাহ ক'রে গৃহস্থ হ'য়ে কৈলাসে বাস স্থাপন করেছিলেন। আসলে এই ব্যাপার ছুটি বিভিন্ন ধর্ম-মতের জট পাকিয়েছে। জৈন ও বৌদ্ধ মতের মতো আরও একটি নিরীশ্বর সাধনা পূর্ব ভারতে উদ্ভূত হয়েছিল, তাকে বলতে পারি কঠিন-যোগী মত (হঠ-যোগী পথ বললেও চলে, তবে পরবর্তী কালে হঠ-যোগের

অর্থ অনেকটা বদল হয়ে পড়েছে)। এই মতে প্রত্যেক মানুষে সর্বেশ্বরের অজরত্ব ও অমরত্ব নিহিত আছে। কঠিন ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা চপল চিত্তকে স্থির করলে এবং শ্বাস নিরুদ্ধ ক'রে দেহধর্মের উপর কালের ক্রিয়া স্তব্ধ করতে পারলে এবং সেইসঙ্গে "মহাজ্ঞান" লাভ করলে মানুষ অজর অমর সর্বেশ্বর হয়। এই মতে মানুষের দেহভাণ্ডই তার এবং ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ। "যা নেই ভাণ্ডে তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে"—এ এঁদেরই চিন্তার প্রতিধ্বনি। এই কারণে যোগী মতাবলম্বীদের মৃত্যুর পর দাহ করা হ'ত না, সমাধি দেওয়া হ'ত—উপবিষ্টভাবে, যেন তিনি জীবিত ও সমাধিস্থ। পরবর্তী কালের এই যোগপন্থীরা নাথ-পন্থী বলে আখ্যাত হয়েছেন। এঁরা ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তবে এঁদের ঐতিহ্যে এবং গানে-ছড়ায় বাংলা দেশের সঙ্গে নাড়ী-যোগ কোথাও অস্বীকৃত হয় নি।

পূর্বভারতের ছুজন মুখ্য অধ্যাত্মচিন্তার নেতা, মহাবীর ও বুদ্ধ পূর্বাগত কঠোর তপস্যার পথই প্রথমে অনুসরণ করেছিলেন। তবে তাঁরা তপশ্চর্যার বা কঠিন যোগ-সাধনার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন নি। যোগী জৈন ও বৌদ্ধ তিনটি মতই সংসারবিরোধী, সৃষ্টির বিপরীত-মুখী, জীবনের উৎসাদক। তবে তিনটি মতের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। যোগী মতে ছুঃখ সুখ সমান এবং মৃত্যু নেই, জীবনই আছে এবং সে জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর পার্থক্য নেই। জৈন ও বৌদ্ধ মতে যে চরম মৃত্যু অর্থাৎ যে মৃত্যুর পরে আর জীবনের সম্ভাবনা থাকে না, তাতেই মানবের মোক্ষলাভ অর্থাৎ ছুঃখ থেকে আত্যন্তিক মুক্তি। তিন মতেই বৈরাগ্য পরম আশ্রয়। বৌদ্ধমতে তপস্যা নিষ্প্রয়োজন, প্রয়োজন বৈরাগ্য—ইন্দ্রিয়দমনের জন্য। ইন্দ্রিয়দমন প্রয়োজন নূতন কর্মসূত্র না পাকাবার জন্য এবং পুরানো কর্মসূত্র ছিন্ন করবার জন্য। যোগী-মতে সব জীবনই সমান, সর্বেশ্বর, সুতরাং সে মতে হিংসা-অহিংসার কথা উঠে না। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমতে হিংসা দৃঢ় কর্মসূত্র বয়ন করে সুতরাং সর্বথা পরিত্যাজ্য। জৈনমতে অহিংসার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপিত।

আলোচ্যকালে বাংলা দেশে জৈনমতের প্রসার বৌদ্ধমতের চেয়ে ব্যাপক ছিল এবং সে মত জনগণের মধ্যে বেশি প্রসার লাভ করেছিল। বৌদ্ধমত সমাজের উচ্চস্তরের এবং পণ্ডিত সমাজের সমাদর লাভ করেছিল।

খ্রীষ্টপর চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে চীনীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (Fa-hsien) বৌদ্ধশাস্ত্র নকল করতে এবং সে শাস্ত্রের পুথি সংগ্রহ করতে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি সমগ্র উত্তরাপথের বড় বড় শহর ও বৌদ্ধধর্ম অনুশীলনের কেন্দ্রগুলিতে গিয়েছিলেন কিন্তু কোথাও পুথি পান নি। বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে লেখাপড়ার চর্চা দেখেছিলেন তিনি দুটি স্থানে ও মগধে পাটলিপুত্রে এবং বাংলা দেশে তাম্রলিপ্ত অঞ্চলে। যাতায়াতে এবং ভারতবর্ষে ও সিংহলে পরিভ্রমণে ফা-হিয়েনের পনের বছর লেগেছিল (৩৯৯-৪১৪)। ভারতবর্ষে সবচেয়ে দীর্ঘকাল কাটিয়েছিলেন তিনি দুটি স্থানে—পাটলীপুত্রে তিন বছর এবং বাংলা দেশে দু বছর। পাটলীপুত্রে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন এবং বিনয়পিটক নকল করেছিলেন। পাটলীপুত্র থেকে তিনি আসেন চম্পায় (ভাগলপুর অঞ্চলে)। সেখানে বৌদ্ধতীর্থ দেখে তিনি আসেন বাংলা দেশে। এদেশে দু বছর বাস ক'রে তিনি তাম্রলিপ্ত থেকে জাহাজে ক'রে সিংহলে যান এবং সেখানে বছর দুই থেকে দেশে ফেরেন। বাংলা দেশ এবং তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধে ফা-হিয়েন যে অল্প কিন্তু খুব মূল্যবান কথা বলেছেন তা এখানে অনুবাদ করে দিচ্ছি।[১]

'এইস্থান [চম্পা] থেকে পূর্ব দিকে প্রায় পঞ্চাশ যোজন গিয়ে ফা-হিয়েন পৌঁছল তাম্রলিপ্ত দেশে। সেখানে আছে সমুদ্র-বন্দর। এই দেশে চব্বিশটি বিহার আছে—সর্বত্রই বৌদ্ধ ভিক্ষু থাকে, সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের বিশেষ সমৃদ্ধি। ফা-হিয়েন এখানে দুবছর থেকে গিয়ে সূত্রগ্রন্থ নকল করলে এবং মূর্তি সকলের ছবি এঁকে নিলে।'

[১] H. A Giles কৃত অনুবাদ। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৬।

খ্রীষ্টজন্মের পূর্বকাল থেকে ভারতবর্ষের সঙ্গে দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের বাণিজ্য শুরু হয়েছিল। এ বাণিজ্য অবশ্য এক তরফা। বিদেশী বণিকেরাই আমাদের পশ্চিম উপকূলের, পশ্চিমদক্ষিণ উপকূলের এবং গঙ্গার কূলে বন্দরে জাহাজ নিয়ে এসে বদলে বা নগদ মূল্যে আমাদের দেশ থেকে ভালো ইস্পাত গজদন্ত মুক্তা মশলা সুগন্ধি-তৈল সুতীর ও সিল্কের কাপড় ইত্যাদি নিয়ে যেত। এসব দ্রব্যের খুব আদর ছিল রোমে। বিশেষ করে মসলিন কাপড়ের। শ্রেষ্ঠ ছিল বাংলা দেশের মসলিন। সে দেশের এর নাম হয়েছিল গাঙ্গেয় বস্ত্র। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে গ্রীকভাষায় লেখা একটি নাবিক-বিবরণীতে (*Periplus of the Erythrian Sea*) বাংলা দেশে বিদেশী বাণিজ্য সম্বন্ধে অল্প যে কয়টি কথা আছে তা বইটির ইংরেজি অনুবাদ[১] থেকে অনুবাদ করে দিচ্ছি। বর্ণনায় যেন জাহাজ মছলি-পত্তন হ'য়ে উত্তরমুখে গঙ্গার মোহানার দিকে আসছে। পথে পড়ে মহানদীর উজানে বন্দর—এই অঞ্চলকে বলা হয়েছে Dosarene[২]—এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে গজদন্ত রপ্তানি হয়। তারপর পড়ে কিরাত দেশ, তার পরে পড়ে—কবিকঙ্কণের বর্ণনায় যেমন—অশ্বমুখ ও দীর্ঘমুখ নরখাদক মানুষের দেশ।

> 'অতঃপর পথ পুনরায় পূর্ব দিকে বাঁক নেয়, এবং ডাইনে মুক্ত সমুদ্র এবং বাঁয়ে দূরে উপকূল রেখে জাহাজ চালালে পরে গঙ্গা দেখা যাবে, এবং তার কাছেই পূর্ব দিকের সর্বশেষ দেশ—সুবর্ণভূমি (Chryse)[৩]। এর নিকটে এক

[১] উইলফ্রেড এইচ্ শ্রফ্ (Schroff) কর্তৃক মূল গ্রীক থেকে অনূদিত (১৯১২), পৃ ৪৭।

[২] এই দেশকে পণ্ডিতেরা 'দশার্ণ' মনে করেছেন। কিন্তু তা নয়, দশার্ণ দেশ যে কোথায় তা মেঘদূতে বলা আছে।

[৩] মলক্কা উপদ্বীপ।

> নদী আছে, নাম গঙ্গা, এবং এই নদীর উৎপত্তি ও বিলয় ঠিক নীল নদেরই মতো। এই নদীর তীরে এক হাট-পত্তন (market town) আছে, তার নাম ও নদীর নাম একই, গঙ্গা (Ganges)। এইখান দিয়ে আসে তেজপাতা (malabathrum), গাঙ্গেয় সুগন্ধি অঞ্জন তৈল (Gangetic spikenard) ও মুক্তা এবং সর্বাধিক উৎকৃষ্ট প্রকারের মসলিন যা বলা হয় গাঙ্গেয় (Gangetic)। শোনা যায় যে এই সব স্থানের নিকটে সোনার খনি আছে, এবং একরকম সোনার মোহর চলে যাকে বলে কল্তিস্ (caltis)।'

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে পেরিপ্লুসে এবং অভিধানে সোনার নামান্তর 'গাঙ্গেয়'। সম্ভবত এদেশে সোনা নদীর বালি থেকে সংগৃহীত হ'ত। টলেমি প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহাসিক-ভৌগোলিকদের বর্ণিত "গাঙ্গে" (বা "গঙ্গা") এই হাট বন্দর-নগরের নাম নিয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বিভ্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মতে এ নামের ইঙ্গিতটুকুও এদেশের সাহিত্যে ইতিহাসে ও জনশ্রুতিতে উল্লিখিত অথবা প্রতিধ্বনিত হয়ে আসে নি। নামটির কথা ভুলে গিয়ে যদি আমরা ভাটী ভাগীরথীর তীরে প্রাচীন বাণিজ্য বন্দরের খোঁজ করি তাহ'লে কিন্তু প্রাচীন ইউরোপীয় নাবিক ও ঐতিহাসিক-ভৌগোলিকদের উল্লিখিত গাঙ্গেয় হাট-পত্তনের সন্ধান পাই। সামুদ্রিক পত্তনের মতো নদী-পত্তনের বিশেষ করে গঙ্গার মতো অনবরত পাশফেরা ও স্রোত-বদলের নদী-পত্তনের স্থান স্থায়ী ও সুনির্দিষ্ট নয়। সুতরাং খ্রীষ্টজন্মের সময়ে এই গাঙ্গেয় পত্তন ঠিক যেস্থানে ব'সত খ্রীষ্টপর চতুর্দশ শতাব্দীতে ঠিক সেস্থানে বসবার কথা নয়, আরও কিছু ভাটিতে বসবার কথা। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইব্নে বতুতা এদেশে এসে কিছুকাল ছিলেন। তিনি এই গাঙ্গেয় পত্তন এবং সমসাময়িক আঞ্চলিক রাজধানীর উল্লেখ করেছেন "সাদ্গাঁও" ব'লে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে এই স্থান নামটি (সাতগাঁ) তৎসমীকরণের ফলে 'সপ্তগ্রাম' নাম পায়।

বস্তুত এস্থান কোন সাতটি গাঁয়ের সমষ্টি কখনই ছিল না, এবং সেইজন্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মতো প্রাচীন কবি যিনি সপ্তগ্রাম বন্দরের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন তিনি সাতটির কথা দূরে থাক একটি গ্রামেরও নাম করেন নি। তাঁরা সাতগাঁ (সপ্তগ্রাম) নামটিই শুধু পেয়েছিলেন তাই সাত শব্দের সর্বজনজ্ঞাত অর্থ অনুসরণ করে লিখেছিলেন "সপ্ত ঋষি শাসনে বোলায় সপ্তগ্রাম।" আসলে মনে হয় এ গাঙ্গেয় হাট-পত্তনের নাম ছিল 'সার্থগ্রাম', অর্থাৎ যে গ্রামে দল বেঁধে জলপথে ও স্থলপথে পণ্যদ্রব্য নিয়ে বণিকেরা আসত (এবং সেই সঙ্গে গঙ্গার পুণ্য পশ্চিমতীরে লোকেরা ধর্মকর্ম করতেও আসত)। এখানে যে নানা দিগ্‌দেশদেশান্তর থেকে সার্থবাহেরা পণ্যতরণী নিয়ে যে ভিড় জমাত তার উল্লেখ মুকুন্দরাম দিয়েছেন এবং সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির ইঙ্গিত করেছেন।

> সে সব সফরে যত সদাগর বৈসে
> জঙ্গ ডিঙ্গা লৈয়া তারা বাণিজ্যেতে আইসে।
> সপ্তগ্রামের বান্যা সব কোথাও না যায়
> ঘরে বস্যা সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সাতগাঁ বন্দরে কাজকর্ম চলত। কিন্তু তখন বড় জাহাজ এত দূর উজানে আসতে পারত না।

পেরিপ্লুসে এদেশের স্বর্ণমুদ্রার যে নাম উল্লিখিত হয়েছে অনুমান করি তার মূল হল সংস্কৃত '*কলতি' (তুলনীয় সংস্কৃত 'কলত')। শব্দটি পুরানো বঙ্গভূমির ছাপহীন টাকারই সমর্থক। (তবে সে টাকা সোনার, রূপার নয়)। বাংলা 'টাক' ও 'টাকা' একই সংস্কৃত মূল 'টঙ্ক' থেকে উৎপন্ন। 'টঙ্ক' মানে ছেনি। ছেনিকাটা ধাতুর টুকরাই 'টঙ্ক' বা টাকা। টাক-মাথা ('খলতি') চাঁচা ছোলা, পাথর বা ধাতু খণ্ডের মতো। এই সূত্রে '*কলতি' (=খলতি) টঙ্কের সমার্থক হয়েছিল। এই ব্যাখ্যা একটু কষ্টকল্পিত মনে হ'তে পারে, কিন্তু অন্যদিকেও এর সমর্থন রয়েছে। লাটিনে caltis শব্দ নেই, কিন্তু প্রতিবেশী ওস্‌কান ভাষায় এর

সংশ্লিষ্ট শব্দ আছে kaltion, মানে ছাপ দেওয়া। তবে কি 'টঙ্ক' শব্দের অনুবাদ রূপেই caltis গৃহীত হয়েছিল লাটিনে?

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে যে প্রত্নলেখটির কথা আগে উল্লেখ করেছি তার পরে প্রায় ছ শ বছরের মধ্যে বাংলা দেশে আর কোন প্রত্নলেখ পাওয়া যায় নি। মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত লেখটির পরে যে লেখ পাওয়া গেছে সে হ'ল বাঁকুড়া জেলায় (বাঁকুড়া সহর থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে) শুশুনিয়া পাহাড়ের উপরে এক বিধ্বস্ত গুহার গাত্রে উৎকীর্ণ বিষ্ণুচক্রের কাছে খোদাই করা তিন ছত্রের লিপি। লিপিটি আবিষ্কার করেছিলেন নগেন্দ্রনাথ বসু। প্রথমে এই দু ছত্র

পুষ্করণাধিপতে র্মহারাজ শ্রীসিজ্ঘবর্মণঃ পুত্রস্য

মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মণঃ কৃতিঃ

'পুষ্করণার অধিপতি শ্রীসিংহবর্মার পুত্র শ্রীচন্দ্রবর্মার করানো কাজ'। একটু তফাতে চক্রের পাশে এক ছত্র

চক্রস্বামিণঃ দোসগ্রণতিস্‌ষ্টঃ

'চক্রস্বামীর···প্রেরিত'।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'দোসগ্রণ' এই টুকুর পাঠ পরিবর্তন ক'রে 'দাসাগ্রেণা' এই পাঠ কল্পনা করেছিলেন। তাতে অর্থ হয় "দাসশ্রেষ্ঠের দ্বারা প্রদত্ত"। এই অর্থ পণ্ডিতসকলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাতেও সঙ্গত অর্থ হয় না। কী অতিসৃষ্ট? গুহা সম্ভব নয়। তা ছাড়া বিষ্ণুভক্ত রাজা নিজেকে দেবতার দাসাগ্র্য বলছেন, এমন ভাবও তখনকার দিনের উপযুক্ত ঠেকছে না। প্রাপ্ত পাঠের সঙ্গতি রক্ষা হয় "দোষাগ্রেণাতিসৃষ্টঃ" অথবা "দোস্‌সর্গেণাতিসৃষ্টঃ" এই রকম মূল পাঠ কল্পনা ক'রে 'দোষাগ্রেণা' প্রাকৃত প্রভাবে 'দোসগ্রণা' হয়েছে ধরলে। তাহলে খোদাই বিষ্ণুচক্রটি বিষ্ণু যেন মহারাজ চন্দ্রবর্মাকে দিয়েছেন,—এই সঙ্গত অর্থ হয়।

মোট কথা শুশুনিয়া লিপির প্রথম অংশের পাঠ শুদ্ধ ও স্বচ্ছ, অর্থও স্পষ্ট, "পুষ্করণের (অথবা পুষ্করণার) অধিপতি মহারাজ শ্রীসিংহবর্মার

পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মার নির্মাণ।" দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশের *ঠিক পরে বা নীচে নেই। এ অংশের লিপিছাঁদও একটু অন্য রকম।* পাঠেও ভ্রান্তি আছে। যতটুকু অভ্রান্ত তাতে বোঝা যাচ্ছে,—'চক্রস্বামীর ···রেখে যাওয়া (অথবা প্রদত্ত)'। পণ্ডিতদের অনুসরণে শাস্ত্রী মহাশয়ের শুদ্ধীকরণ স্বীকার করলেও অর্থের অস্বচ্ছতা দূর হয় না। 'অতিসৃষ্ট' শব্দের "প্রদত্ত" অর্থ এখানে খাটে না। কী প্রদত্ত? লিপির এই অংশটি আছে উৎকীর্ণ বিষ্ণুচক্রের পাশে। সুতরাং ধ'রে নিতে হয় যে "অতিসৃষ্ট" বিষ্ণুচক্রকেই নির্দেশ করছে। এখানে আপত্তি উঠতে পারে যে চক্রশব্দ ক্লীবলিঙ্গ। উত্তরে বলা যায়, বেদে শব্দটির পুংলিঙ্গ প্রয়োগও আছে। 'অতি+সৃজ্' ধাতুর এক মানে হ'ল "অবশেষ রেখে যাওয়া"। এখানে এই অর্থই খাটে। বিষ্ণু যেন চন্দ্রবর্মাকে যুদ্ধবিগ্রহে বলাধান ক'রে দিয়ে তাঁর প্রতীক লাঞ্ছনটি রেখে গেছেন। তা হ'লে "দাসাগ্রেণ" পাঠকল্পনা অচল, পাঠ ধরতে হবে "দোস্সর্গেণ", মানে হাতঝাড়া দিয়ে। এ মানে এখানে উজ্জ্বলন্ত সুদর্শন চক্রের পরিচয় রূপে সম্পূর্ণ খাটে।

শুশুনিয়া লিপির আরও একটু মূল্য আছে। বাংলা দেশের প্রত্ন-লিপিতে এই প্রথম মহারাজ উপাধি পাওয়া গেল এবং পিতা-পুত্র ক্রমে। চন্দ্রবর্মা কে এবং পুষ্করণ (বা পুষ্করণা) কোথায় এই নিয়েও সংশয় আছে। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে পরাজিত ও অনুগৃহীত আর্যাবর্ত-রাজাদের মধ্যে চন্দ্রবর্মা নামও আছে। ইনি শুশুনিয়ার চন্দ্রবর্মা হওয়া সম্ভব। লিপি-ছাঁদ উভয়ত্রই এক, সুতরাং চন্দ্রবর্মা ও সমুদ্রগুপ্ত সমসাময়িক ছিলেন ধরা যায়। এই চন্দ্রবর্মাই যে দিল্লী মেহেরৌলিতে স্থিত লৌহস্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপির চন্দ্র—যিনি বঙ্গদেশেও (অথবা বঙ্গজাতির সঙ্গেও) যুদ্ধ করেছিলেন—তা অবশ্য জোর ক'রে বলা যায় না। কিন্তু এটি গরুড়স্তম্ভ, সুতরাং এ চন্দ্রও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। চন্দ্রের গরুড়স্তম্ভ-লিপি অনুসারে, বিষ্ণুপদ গিরিতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু যেখানে এখন আছে সে স্থানকে গিরি

বলা চলে না। তবে কি স্তম্ভটি অন্য স্থান থেকে আনা হয়েছিল? চন্দ্রবর্মার পিতা সিংহবর্মা কোন্ পুষ্করণার (বা পুষ্করণের) অধিপতি ছিলেন তা নিয়েও গণ্ডগোল আছে। শুশুনিয়া পাহাড় থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল উত্তরপূর্বে দামোদরের ধারে এখনও এক পোখরনা (স্থানীয় উচ্চারণে পখন্না) গ্রাম আছে। এখানে প্রাচীন প্রত্নবস্তু কিছু কিছু পাওয়া গেছে। দামোদর তখন গঙ্গায় পড়ত ত্রিবেণীর কাছে এবং তখন তা নাব্য ছিল বলে মনে হয়।

শুশুনিয়া গুহালিপিতে উল্লিখিত মহারাজ সিংহবর্মা ও তৎপুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মা বাংলা দেশের তথ্যমূলক ইতিহাসে স্বীকৃত প্রথম দুটি রাজা-নাম। আপাতত বলতে হয় এঁরা বঙ্গভূমির, অন্তত সুহ্মের, রাজা ছিলেন। কেননা চন্দ্রবর্মার কীর্তি সুহ্মের এক অচলে গুহায় উৎকীর্ণ আছে এবং এস্থানের অনতিদূরে পুষ্করণ (পুষ্করণা) নামে স্থানও আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক এঁদের অবাঙালী বলতে চান। তার কারণ রাজস্থানেও পুষ্করণ (পুষ্করণা) আছে। কিন্তু দিল্লীতে মেহেরৌলিতে (যেখানে কুতুবমিনার আছে) যে লৌহস্তম্ভে চন্দ্র রাজার প্রশস্তির উল্লেখ করলুম সেই রাজাকে শুশুনিয়ারও চন্দ্রবর্মা ব'লে অনুমানের পক্ষে যুক্তি আছে। প্রথমত চন্দ্রবর্মার মতো চন্দ্রও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। চন্দ্রবর্মা উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন বিষ্ণুচক্র, চন্দ্র নির্মাণ করিয়েছিলেন লৌহময় গরুড়স্তম্ভ। দ্বিতীয়ত চন্দ্রবর্মার কীর্তি বাংলা দেশে ধ্রুবস্থিত, চন্দ্র বাংলা-দেশে (অথবা বাঙালী আক্রমণকারীর সঙ্গে) প্রচণ্ড যুদ্ধ করেছিলেন। প্রশস্তির উক্তি—"প্রতীপম্ উরসা শত্রূন্ সমেত্যাগতান্ বঙ্গেষু" (অর্থাৎ বঙ্গদেশে আগত শত্রুদের উজান পথে বুক চিতিয়ে সম্মুখীন) যদি আক্ষরিক ভাবে সত্য হয় তাহ'লে বুঝতে হবে যে চন্দ্রের শত্রুরা বঙ্গভূমিতে এসেছিল তাঁকে আক্রমণ করতে। সুতরাং তিনি বাংলা দেশের লোক ছিলেন। আরও একটা দিক থেকে চন্দ্রকে বঙ্গভূমির সঙ্গে যুক্ত করা যায়। চন্দ্রের গরুড়স্তম্ভটির মসৃণ পালিস এখনও অটুট রয়েছে। লৌহ-শিল্পে এমন দক্ষতার এত পুরানো নিদর্শন এদেশে নেই, আর

কোন দেশে আছে কিনা জানি না। সুহ্মদেশে—পশ্চিমবঙ্গে—লৌহ-শিল্প প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে অনুশীলিত ছিল। মেহেরৌলি লৌহ-স্তম্ভটি এদেশে অথবা এদেশের লৌহকারদের নির্মিত হওয়া অসম্ভব নয়।

মেহেরৌলি গরুড়স্তম্ভ লিপিটি তিন শ্লোকময় একটি ছোট প্রশস্তি কাব্য। ভালো রচনা, অতিশয়োক্তির মাত্রা অতিরিক্ত হলেও কাব্যগুণে তা অসহ্য নয়। বাঙালী কবির রচনা হতেও পারে। সবটা উদ্ধৃত করছি।

যস্যোদ্বর্ত্তয়তঃ প্রতীপমুরসা শত্রূন্ সমেত্যাগতান্
বঙ্গেষ্বাহববর্ত্তিনোঽভিলিখিতা খড্গেন কীর্ত্তির্ভুজে।
তীর্ত্বা সপ্ত মুখানি যেন সমরে সিন্ধোর্জ্জিতা বাহ্লিকা
যস্যাদ্যাপ্যধিবাস্যতে জলনিধি বীর্য্যানিলৈর্দক্ষিণঃ॥ ১॥

'বঙ্গভূমিতে আগত যুদ্ধোদ্যত শত্রুদের উজান পথে বুক চিতিয়ে সম্মুখীন হ'য়ে আক্রমণ ক'রে যিনি তাদের বাহুতে খড়্গের দ্বারা কীর্তি খোদাই করেছিলেন, সিন্ধুনদের সাতটি মুখ পেরিয়ে যিনি যুদ্ধে বাহ্লিকদের জয় করেছিলেন, যাঁর বীরত্বের ঝটিকা আজও দখল ক'রে রয়েছে দক্ষিণসমুদ্র॥' ১॥

খিন্নস্যেব বিসৃজ্য গাং নরপতের্গামাশ্রিতস্যেতরাং
মূর্ত্ত্যা কর্ম্মজিতাবনিং গতবতঃ কীর্ত্ত্যা স্থিতস্য ক্ষিতৌ।
শান্ত্যস্যেব মহাবনে হুতভুজো যস্য প্রতাপো মহান্
নাদ্যাপ্যুৎসৃজতি প্রণাশিতরিপো র্যত্নস্য শেষঃ ক্ষিতিম্॥ ২॥

'ক্লান্ত হয়েই যেন নরপতি ইহলোক ছেড়ে পরলোক আশ্রয় করেছেন। সশরীরে কর্মফললব্ধ লোকে গমন ক'রে তিনি কীর্ত্তিতে পৃথিবীতে বর্তমান। মহাবনে নির্বাপিত দাবাগ্নির মতো যাঁর মহান্ প্রতাপ আজও বিনষ্টশত্রু তাঁর বীরত্বের অবশেষ (=ক্ষত চিহ্ন) রূপে পৃথিবীতে বিদ্যমান॥' ২॥

প্রাপ্তেন স্বভুজার্জ্জিতঞ্চ সুচিরঞ্চৈকাধিপত্যং ক্ষিতৌ
চন্দ্রাহ্বেন সমগ্রচন্দ্রসদৃশীং চন্দ্রশ্রিয়ং বিভ্রতা।

তেনায়ং প্রণিধায় ভূমিপতিনা ভাবেন বিষ্ণৌ[১] মতিং
প্রান্‌শুর্বিষ্ণুপদে গিরৌ ভগবতো বিষ্ণো ধর্বজঃ স্থাপিতঃ ॥ ৩ ॥

'স্ববলে অর্জিত পৃথিবীতে দীর্ঘকাল একাধিপত্য ভোগ ক'রে সেই চন্দ্র নামক ভূপতি (যিনি) পূর্ণচন্দ্রের সদৃশ চন্দ্রশোভা ধারণ করেছিলেন, ভক্তিভরে বিষ্ণুর প্রতি মন নিবিষ্ট ক'রে বিষ্ণুপদ-গিরিতে ভগবান বিষ্ণুর এই ধ্বজ স্থাপিত করেছিলেন ॥' ৩ ॥

প্রশস্তিটি পড়লে বুঝতে দেরী হয় না যে স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে প্রশস্তি উৎকীর্ণ হয়েছিল এবং তখন চন্দ্র গতাসু। কোন কোন ঐতিহাসিক এই চন্দ্র রাজাকে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সহিত অভিন্ন মনে করেন। তার বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি হ'ল রাজার বংশপরিচয়ের অসদ্‌ভাব। গুপ্তরাজারা নিজেদের বংশগৌরব বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তাঁদের প্রশস্তিতে বিশেষ ক'রে তাঁদের পূর্ব-পুরুষের গৌরববাণীতে এমন নীরবতা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। বিশেষত যেখানে প্রশস্তির কবি দক্ষ ও সুনিপুণ।

---

১ পাঠ 'বিষ্ণো'

৪

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী

সমতট ও কামরূপ ছাড়া বঙ্গভূমি সমুদ্রগুপ্তের (রাজ্যকাল আনুমানিক ৩৩০-৩৭৫) অধিকারে ছিল। এবিষয়ে সমসাময়িক দলিল নেই, তবে পরবর্তী কালের দলিলে এর সমর্থন পাওয়া যায়। গুপ্ত-অধিকার-কালের মধ্যভাগ থেকেই—ঠিক ক'রে বলতে গেলে ১১৩ গুপ্তাব্দ[১] অর্থাৎ ৪৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে—ইতিহাসের পটে আমাদের দেশের ছবি খণ্ডখণ্ডভাবে হ'লেও অনেকটা পরিষ্কার হ'য়ে ফুটে উঠতে থাকে। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক এক শ বছরের মধ্যে চোদ্দখানি তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ প্রত্নলিপি পাওয়া গেছে। এগুলি সবই ভূমি ক্রয়বিক্রয় মঞ্জুর অথবা ভূমিদান আজ্ঞা-পত্র (অনুশাসন)। প্রত্নলিপিগুলির মধ্যে তিনটি রাজসাহী জেলার (অধুনা বাংলাদেশের), পাঁচটি দিনাজপুর জেলার, একটি বগুড়া জেলার (অধুনা বাংলাদেশের), একটি ত্রিপুরা জেলার (অধুনা বাংলাদেশের), একটি বর্ধমান জেলার ও তিনটি ফরিদপুর জেলার (অধুনা বাংলাদেশের)। গুপ্তদের অধিকারের কাল থেকে তখনকার বঙ্গভূমি প্রধানত দুটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশের নাম ছিল 'ভুক্তি', মানে ভোগ-(অর্থাৎ অধিকার) ভূমি। ভুক্তি দুটি প্রধান নগরের নাম অনুসারে পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি ও বর্ধমান-ভুক্তি নামে পরিচিত ছিল। (দ্বাদশ শতাব্দীতে আরও দুটি ভুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়, কঙ্কগ্রাম-ভুক্তি ও দণ্ড-ভুক্তি। কঙ্কগ্রাম ভুক্তির অধিকাংশই ছিল প্রাচীন কজঙ্গল। দণ্ড-ভুক্তির অনেকটা ছিল প্রাচীন ওড্ডে।) উল্লিখিত প্রত্নলিপির মধ্যে তেরোটিই পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির দলিল, একটি বর্ধমান-ভুক্তির। আটটি পঞ্চম শতাব্দীর।

[১] গুপ্তাব্দ বা গুপ্তসংবৎ আরম্ভ হয়েছিল ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে। গুপ্তসাম্রাজ্য লুপ্ত হবার অনেককাল পরেও গুপ্তাব্দের প্রচলন ছিল।

১ কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে ১১৩ গুপ্তাব্দে (৪৩২-৩৩) ধানাই-দহ (রাজসাহী) তাম্রশাসন।

২ ১২০ গুপ্তাব্দে (৪৩৯) কলাইকুড়ি সুলতানপুর (রাজশাহী) তাম্রশাসন।

৩ কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে ১২৪ গুপ্তাব্দে (৪৪৫) দামোদরপুর (দিনাজপুর) তাম্রশাসন (ক)।

৪ কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে ১২৮ গুপ্তাব্দে (৪৪৭) দামোদরপুর (দিনাজপুর) তাম্রশাসন (খ)।

৫ ১২৮ গুপ্তাব্দে (৪৪৮) বইগ্রাম (বগুড়া) তাম্রশাসন। রাজার উল্লেখ নেই, তবে তখন সেখানে কুমারগুপ্তের অধিকার।

৬ ১৫৯ গুপ্তাব্দে (৪৭৯) পাহাড়পুর (রাজশাহী) তাম্রশাসন। রাজার উল্লেখ নেই। আযুক্তকের উল্লেখ আছে, সুতরাং তখন গুপ্ত-অধিকার চলছে।

৭ বুধগুপ্তের রাজ্যকালে অজ্ঞাত গুপ্তাব্দে দামোদরপুর (দিনাজপুর) তাম্রশাসন (গ)।

৮ বুধগুপ্তের রাজ্যকালে ১৬৩ গুপ্তাব্দে (৪৮২) দামোদরপুর (দিনাজপুর) তাম্রশাসন (ঘ)!

পাঁচটি ষষ্ঠ শতাব্দীর।

৯ বৈন্যগুপ্তের রাজ্যকালে ১৮৮ গুপ্তাব্দ (৫০৭) গুনৈঘর (ত্রিপুরা) তাম্রশাসন।

১০ গোপচন্দ্রের রাজ্যকালে মহারাজা বিজয়সেন প্রদত্ত ৩ রাজ্যাঙ্কে (সম্ভবত গোপচন্দ্রের) মল্লসারুল (বর্ধমান) তাম্রশাসন।

১১ গোপচন্দ্রের রাজ্যকালে তাঁর ১৮ রাজ্যাঙ্কে ফরিদপুর (স্থান ?) তাম্রশাসন (ক)।

১২ ধর্মাদিত্যের রাজ্যকালে তাঁর ৩ রাজ্যাঙ্কে ফরিদপুর (স্থান ?) তাম্রশাসন (খ)।

১৩ ধর্মাদিত্যের রাজ্যকালে (তারিখ অনুল্লিখিত) ফরিদপুর (স্থান?) তাম্রশাসন (গ)।

১৪ কোন এক গুপ্ত-রাজার (অক্ষরলুপ্ত হওয়ায় নামের প্রথম অংশ পাওয়া যায় নি) রাজ্যকালে ২২৪ গুপ্তাব্দে (৫৪৩) দামোদরপুর (দিনাজপুর) তাম্রশাসন (ঙ)।

নবম তাম্রশাসন পর্যন্ত কালানুযায়িক ধারাবাহিকতা বোঝা যায়। তারপর থেকে পৌবাপর্য ও তারিখ নির্ণয়ে অনুমানের পালা। অনুমান মতো উপরে সাজানো হয়েছে। তা কিন্তু সর্বাংশে ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের অনুসারী নয়। গুনৈঘর ও মল্লসারুল তাম্রশাসন দুটিতেই মহারাজ বিজয়সেনের উল্লেখ আছে। গুনৈঘর লিপিতে তিনি "দূতক" অর্থাৎ ভূমিহস্তান্তরে রাজার প্রতিনিধি এবং "মহাপ্রতীহার[১] মহাপীলুপতি[২] পঞ্চাধিকরণ-উপরিক[৩] পাটী-উপরিক[৪] পুরপাল-উপরিক[৫] মহারাজ শ্রীমহাসামন্ত"। মল্লসারুল লিপিতে মহারাজ বিজয়সেন নিজেই দাতা, তাঁর পদমালার কোনটিরই উল্লেখ নেই। মনে হয় তখন তিনি নামে মাত্র গোপচন্দ্রকে মহারাজাধিরাজ স্বীকার ক'রে নিয়ে কার্যত সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজা হয়েছেন, এবং সেই কারণেই লিপিশীর্ষে মুদ্রায় তাঁর নাম আছে, "মহারাজ বিজয়সেনস্য"। গুনৈঘর লিপির মুদ্রায় রাজার নাম আছে, "মহারাজ শ্রীবৈন্য [গুপ্তস্য]।"

১১ ও ১২ সংখ্যক তাম্রপট্টে মুদ্রা একই, "বারক-মণ্ডলবিষয়াধিকরণস্য"। প্রথমটি গোপচন্দ্রের দ্বিতীয়টি ধর্মাদিত্যের (৩ রাজ্যাঙ্ক)। ধর্মাদিত্যের অপর তাম্রপট্টে (১৩) কোন মুদ্রা নেই। তার থেকে অনুমান হয় যে এ তাম্রপট্টের সময়ে ধর্মাদিত্যের ক্ষমতা আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১১ (গোপচন্দ্রের) ও ১৩ (ধর্মাদিত্যের) তাম্রপট্টে নব্যাবকাশিকাতে উপরিক নাগদেবের উল্লেখ আছে। গোপচন্দ্রের তাম্রপট্টে

[১] রাজপ্রাসাদের সেনানী। [২] হস্তিবাহিনীর সেনাপতি। [৩] সচিবমণ্ডলীর অধ্যক্ষ। [৪] হিসাব-নিকাশের অধ্যক্ষ। [৫] নগররক্ষীদের অধ্যক্ষ।

নাগদেব "কুমারামাত্য", আর ধর্মাদিত্যের তাম্রপট্টে তিনি "মহাপ্রতীহার"। যাই হোক নাগদেবের উল্লেখে গোপচন্দ্র ও ধর্মাদিত্যের অনুমিত পৌবাপর্য ব্যাহত হয় না যেহেতু উভয়ত্রই তিনি অতীত দিনের উপরিক ব'লে উল্লিখিত ("নাগদেবস্থাদ্ধ্যাসনকালে")। এই দুটি তাম্রপট্টে প্রাপ্ত "নব্যাবকাশিকা" শব্দটি নিয়ে সংশয় আছে। আপাতত মনে হয় স্থাননাম। কেউ কেউ অনুমান করেছেন, এ স্থানটি কোন নতুন কাটা খালের ধারে অবস্থিত ব'লে এই নাম। শব্দটির বুৎপত্তি বিচার করলে ('নব্য + অবকাশিকা', অর্থ নূতন ছোট ফাঁকা স্থান) মনে হয় এ ছিল নতুন উত্থিত (অথবা জঙ্গলকাটি) ভূখণ্ড।

পঞ্চম শতাব্দীর কোন তাম্রপট্টে মুদ্রা নেই, পরবর্তী কালের তাম্রপট্টে, দুচারটি ছাড়া, সর্বত্র মুদ্রা আছে। গুপ্তদের সাক্ষাৎ প্রশাসন থেকে বিচ্যুত হ'য়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা নিজেদের স্বাধীন ক্ষমতার (authority) লোকগ্রাহ্য চিহ্ন রূপে মুদ্রা ছাপের রীতি প্রবর্তন করেছিলেন ব'লে অনুমান করি।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর তাম্রপট্টগুলি থেকে সেকালের শাসনপদ্ধতির অবস্থা এবং সে অবস্থার ধীরে ধীরে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আগেই বলেছি গুপ্ত-আমলে এদেশ দুটি ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। ভুক্তির প্রধান ছিলেন 'উপরিক'। সম্ভবত ইনি গুপ্ত-সম্রাট্ কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। উপরিক সবদিক দিয়েই রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। সাধারণত এর মর্যাদা ছিল রাজপুত্রের তুল্য মন্ত্রীর মতো, "কুমা-রামাত্য"। উপরিকের নীচে ছিল 'নিযুক্তক'। কুমারগুপ্তের একটি তাম্রপট্টে (দামোদরপুর ক) উপরিক চিরাতদত্তের কোন রাজকীয় মর্যাদার উল্লেখ নেই, কিন্তু তাঁর নিযুক্তক বেত্রবর্মা ছিলেন কুমারামাত্য। মনে হয় চিরাতদত্ত ছিলেন স্থানীয় লোক এবং বেত্রবর্মা পাটলীপুত্র থেকে আগত রাজকুটুম্ব।

ভুক্তির বিভাগ ছিল কতকগুলি 'বিষয়' বা 'মণ্ডল' অথবা 'বিষয়-

মণ্ডল'। 'বিষয়' ও 'মণ্ডল' নাম দুটির ব্যবহার নিয়ে কিছু গোলমাল আছে। মণ্ডল ছিল কোন কোন অঞ্চলে বিষয়ের সমার্থক, কোন কোন অঞ্চলে বিষয়ের বিভাগ। বিষয়-মণ্ডলের কর্তা ('বিষয়পতি') হ'তেন 'নিযুক্তক'। আগে উল্লিখিত বেত্রবর্মা ছিলেন পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ-বিষয়ের নিযুক্তক। 'আযুক্তক' ছিল কোন বিশেষ স্থানে সাময়িক ভাবে নিযুক্ত বিষয়পতি।[১] উপরিক ও নিযুক্তক স্বয়ং-প্রভু ছিলেন না। তাঁদের পরিষৎ ছিল। পরিষৎ নিয়েই তাঁরা সর্বেসর্বা। উপরিকের পরিষদের নাম ছিল 'অধিষ্ঠানাধিকরণ,' (মানে রাজধানীর কার্যালয়), আর বিষয়-অধিকরণের নাম ছিল 'বিষয়াধিকরণ'।[২] অধিষ্ঠানাধিকরণের সভ্য—নগরশ্রেষ্ঠী (প্রধান ব্যাঙ্কার), প্রথম সার্থবাহ (মুখ্য বাণিজ্যকারী), প্রথম কুলিক (প্রধান বস্ত্র-উৎপাদনকারী) এবং প্রথম কায়স্থ (প্রধান হিসাবরক্ষক)। অধিকরণে উপরিকের সঙ্গে নিযুক্তক (এবং আযুক্তকও) থাকতেন। অধিষ্ঠানাধিকরণের সাধারণ সভ্যদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন নগরশ্রেষ্ঠী। এ কথা বোঝা যায় প্রথমে উল্লেখ থেকে এবং পাহাড়পুর তাম্রপট্ট থেকে ("আর্য্য-নগরশ্রেষ্ঠিপুরোগঞ্চাধিষ্ঠানাধিকরণম্")। বিষয়াধিকরণের মতো 'বীথ্যধিকরণ'ও ছিল। বীথি ছিল বাণিজ্যপ্রধান স্থান যেখানে সারি সারি আড়ত ও দোকানঘর থাকত।[৩] বিষয়-অধিকরণের মতো

---

[১] অন্তত এই রকমই অনুমান হয় দামোদরপুর গ থেকে।

[২] দামোদরপুর ঙ তাম্রপট্টে কোটিবর্ষাধিষ্ঠানাধিকরণের ছাপ আছে, নামও আছে। ফরিদপুর খ তাম্রপট্টে বারকমণ্ডল-বিষয়াধিকরণের ছাপ আছে, সভ্যদের উল্লেখ নেই।

[৩] 'বীথী' এবং 'বীথী-অধিকরণ' বলতে কী বোঝায় সে বিষয়ে ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা নীরব থাকায় এখানে বুঝিয়ে দেওয়া আবশ্যক মনে করি। 'বীথী' ছিল পথের দুধারে বিপণি-শ্রেণী। এই বীথী বা বিপণিশ্রেণী সেকালে ছিল আঞ্চলিক বাণিজ্যকেন্দ্র তথা রাজস্বসংগ্রহের ঘাঁটি। বীথী-অধিকরণ তাই অর্থঘটিত প্রশাসনের আঞ্চলিক কেন্দ্র ছিল। পরবর্তী কালে বীথীর পরিবর্তে কোন কোন অঞ্চলে 'চতুরক' (<আধুনিক হিন্দী 'চৌরা') ব্যবহৃত দেখা যায়। এখানে বুঝতে হবে যে বাণিজ্যকেন্দ্রটির বিপণিগুলি চকবন্দি ভাবে অবস্থিত ছিল। 'চতুরক' সেন-রাজাদের তাম্রপট্টে মিলে।

বীথী-অধিকরণেরও সভ্যতালিকা পাওয়া যায় নি। মনে হয় বিষয়-অধিকরণের সভ্য হতেন অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তিরা ('মহত্তর') আর বীথী-অধিকরণের সভ্য হতেন শ্রেষ্ঠী সার্থবাহ ও কুলিকেরা। দেশের বাণিজ্য লুপ্ত হবার পর আর বীথী-অধিকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ভূমি-হস্তান্তরের ব্যবস্থায় প্রথম (বা জ্যেষ্ঠ) পুস্তপালের (অর্থাৎ প্রধান রেকর্ডকীপারের) অনুমোদন আবশ্যক হ'ত, তারপর আবশ্যক হ'ত স্থানীয় 'মহত্তর' অর্থাৎ প্রধান অধিবাসীদের। তবেই অধিষ্ঠানাধিকরণের সম্মতিক্রমে ভূমি-হস্তান্তর বিধিবদ্ধ হ'ত।

দামোদরপুর ক তাম্রপট্টের অনুবাদ ক'রে দিই, তাতে সেকালের ভূমি-হস্তান্তর ব্যবস্থার ছবি পরিস্ফুট হবে।

১ সম্ব(ৎসর) ১২৪ ফাল্গুন দি(ন) ৭ পরমদৈবত পরমভট্টারক মহারাজা-

২ ধিরাজ শ্রীকুমারগুপ্ত পৃথিবীপতি থাকায় তাঁর পদানুগৃহীত পুণ্ড্রবর্দ্ধন-

৩ ভুক্তি হ'তে উপরিক চিরাতদত্ত কর্তৃক পরিচালিত কোটিবর্ষ[১] বিষয়ে এবং তাঁর (বা সেখানে)

৪ নিযুক্তক কুমারামাত্য বেত্রবর্মা থাকায় এবং অধিষ্ঠানাধিকরণ—নগরশ্রেষ্ঠী

৫ ধৃতিপাল সার্থবাহ বন্ধুমিত্র প্রথম-কুলিক ধৃতিমিত্র প্রথম কায়স্থ

৬ শাম্বপাল প্রমুখ—কার্যকর থাকায়, যেহেতু ব্রাহ্মণ কার্পটিক

৭ জানিয়েছে—আমার অগ্নিহোত্রের প্রয়োজনে (তোমাদের) দেওয়া উচিত অপরকে না-দেওয়া এবং চাষ না-করা

৮ একখণ্ড[২] ভূমি কুড়া[৩] পিছু তিন দীনার[৪] দরে চিরকাল ভোগ্যরূপে

[১] মোটামুটি আধুনিক দিনাজপুর জেলা। [২] মূলে 'খিল', মানে পতিত এবং চৌহদ্দিবিহীন। [৩] মূলে "কুল্যবাপ"। শব্দটি পরে হয়েছে 'কুড়ব', তারপরে 'কুড়া' অর্থাৎ বিঘা। [৪] স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ।

৯ আটকে[১] বেঁধে দেওয়া—এই কথা এখন দেওয়া হোক এই স্থির হওয়ায় তিনটি দীনার

১০ জোগাড় ক'রে যেহেতু পুস্তপাল রিশিদত্ত[২] জয়নন্দি রিভুদত্তের নির্ণয় মতো,

১১ ডোঙ্গার[৩] উত্তরপশ্চিম দিকে এক কুড়া দেওয়া হ'ল

১২ [৪]ভূমিদান বিষয়ে শ্লোক আছে

১৩ [৪]স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্

১৪ স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে (ই)তি ॥

কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্তসাম্রাজ্যবন্ধে শিথিলতা ঘটল এবং এই শিথিলতার ফলে বঙ্গভূমির শাসন ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন দেখা দিলে। উপরিক নিযুক্তক বিষয়পতি ও মাণ্ডলিক-মণ্ডলপতিরা, শক্তি থাকলে, স্বীয় অধিকারখণ্ডে স্বাধীন রাজার মতো ব্যবহার ক'রতে লাগল। তার দরুন অধিষ্ঠানাধিকরণের ক্ষমতা দ্রুত ক'মে আসতে থাকল। ইতিমধ্যে দেশে কৃষিসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাণিজ্য-সমৃদ্ধির হ্রাস শুরু হয়েছে। তাই পঞ্চম শতাব্দী শেষ হবার আগেই দেখি যে উপরিকেরা মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে রাজোপাধি গ্রহণ করছেন। বুধগুপ্তের রাজ্যকালের তাম্রলিপি দুটিতেই (দামোদরপুর গ, ঘ) উপরিক—যথাক্রমে জয়দত্ত ও ব্রহ্মদত্ত—"মহারাজ" ব'লে উল্লিখিত। (কুমারগুপ্তের আমলের উপরিক চিরাতদত্তের এঁরা কি বংশধর?)

ভুক্তির অধিকারী মহারাজ ব'লে উল্লিখিত হ'লেও তিনি অধিকরণের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। দেশের মাটির চরম অধিকারী যে ভূস্বামী অথবা উপরিক-মহারাজ নয় দেশেরই জনগণ তা বোঝা যায় এই দলিলগুলি থেকে। প্রাচীন এই ভূমিদান অথবা ভূমিহস্তান্তর লেখগুলি ভূমির নবীন অধিকারীকে উদ্দেশ ক'রে দেওয়া হ'ত না। এগুলি

[১] মূল "নীবীধর্ম্মেণ"। [২] =ঋষিদত্ত। [৩] স্থাননাম। গ তাম্রপট্টেও উল্লিখিত। [৪] ছত্র দুটি উলটপালট উৎকীর্ণ হয়েছে।

ছিল proclamation-এর মতো, অধিকরণের পরামর্শ অনুসারে, আবশ্যক হ'লে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মত নিয়ে তবেই সেই গ্রামের ও অঞ্চলের প্রধান প্রধান অধিকারীদের উদ্দেশ ক'রে লেখা হ'ত। উপরিকেরা রাজা হ'য়েও এবং অধিকরণ প্রায়বিলুপ্ত হ'লেও মহত্তরদের প্রাধান্য খর্ব হয় নি। ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রদত্ত একটি শাসন থেকে এবিষয়ে অনেক কথা জানা যায়। প্রত্নলিপিটি পাওয়া যায় বর্ধমান জেলায় মল্লসারুল গ্রামে। তখন এই অঞ্চল শিথিল গুপ্ত-শাসনের ডোর খুলে ফেলেছে। যিনি উপরিক তিনি মহারাজ বটেন, তবে যাঁর উপরিক তিনি নামে রাজাধিরাজ ছিলেন। তাম্রশাসনটিতে গাঁথা মোহরে নাম আছে—অধিকরণের নয় বিজয়সেনের, মূর্তি আছে ধর্মরাজ সূর্য দেবতার। এটি ভূমিদান পত্র। ভূমিদান করছেন বিজয়সেন গ্রামবাসীদের কাছে কিনে নিয়ে। বক্কত্তক বীথীর অন্তর্গত কয়েকটি গ্রামের মহত্তর ও অগ্রহারিক[১] (যেমন হিমদত্ত, সুবর্ণযশা, ধনস্বামী, যষ্টিদত্ত, শ্রীদত্ত, ভট্টবামনস্বামী, খাড়্গি হরি ইত্যাদি) এবং বীথীর অধিকরণকে মহারাজ বিজয়সেন জানিয়েছিলেন যে তিনি তাঁদের কাছ থেকে আট বিঘা ("কুল্যবাপ") জমি কিনে নিয়ে "পঞ্চ মহাযজ্ঞপ্রবর্তনায়" (অর্থাৎ বৈদিক যজ্ঞকার্য করবার জন্যে) "বাহ্বৃচ" (ঋগ্‌বেদের বহুশাখায় নিষ্ণাত) বৎসস্বামীকে দেবেন। সেই ক্রয় ও দানের এই দলিল। দলিলে জমির চৌহদ্দি দেওয়া আছে। মহারাজার তরফে দলিল মঞ্জুর করেছিলেন তাঁর প্রতিনিধি ("দূতক") শুভদত্ত, দলিল লিখিয়েছিলেন মন্ত্রী ("সান্ধিবিগ্রহিক") ভোগচন্দ্র, লিখেছিলেন এবং সীল জুড়েছিলেন "পুস্তপাল" (রেকর্ডকীপার) জয়দাস।

মল্লসারুল প্রত্নলিপি থেকে এমন একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যা সেকালের বাংলা দেশের অর্থব্যবস্থার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সব ভূমিদান পত্রে প্রায়ই বড় বড় রাজকর্মচারীর উল্লেখ থাকে, যাঁদেরও অবহিত করা হয় দলিলের বিষয় সম্পর্কে।

[১] মানে রাজদত্ত ভূমি ভোগকারী।

বর্ধমানভুক্তির তাম্রপট্টটিতে অন্যত্র অপ্রাপ্ত একটি অভিনব রাজ-কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়—'ঔর্ণাস্থানিক'। এই পদবীর মানে থেকেই বোঝা যায় যে ইনি রেশম-উৎপাদন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ অথবা শুল্ক সংগ্রাহক ছিলেন। আগেকার দিনে রেশম ("পত্রোর্ণ") শিল্প যে কতটা সমৃদ্ধ ছিল তা আগে বলা হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মথুরা ও কাশী রেশমি বস্ত্রের জন্য খ্যাত ছিল। কোন উল্লেখ না থাকলেও গঙ্গার ভাটি দেশেও তখন রেশম উৎপাদন হ'ত। রেশম শিল্প যে রাজকোষের পুষ্টিবিধান করত তা কেবল এই প্রত্নলিপি থেকেই জানা গেল।

প্রত্নলিপিগুলি থেকে সে সময়ের প্রকাশ্য ধর্মকর্মেরও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিপুরা জেলার গুনৈঘর তাম্রশাসন (৫০৭ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে জানা যায় যে বৈন্যগুপ্তের উপরিক (?) মহারাজ রুদ্রদত্ত মহাযানিক শাক্যভিক্ষু (অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) আচার্য শান্তিদেবকে উদ্দেশ করে অবলোকিতেশ্বর আশ্রমবিহারে সেই আচার্যেরই প্রতিপাদিত মহাযানিক বৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘের ব্যবহারে ভগবান্ বুদ্ধের তিন সন্ধ্যা গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ ইত্যাদি দ্বারা পূজার:জন্য, সেই ভিক্ষুসংঘের খাওয়া পরা শোওয়া বসা রোগাপনয়ন ঔষধাদি খরচের জন্য এবং বিহারে ভাঙা ফুটো মেরামতের জন্য 'অগ্রহার' হিসাবে এগার খিল পাটক[২] ভূমি পাঁচখানা তাম্রপট্টে দলিল ক'রে দেওয়া হল। এই দলিল সম্পাদনে প্রধান প্রতিনিধি ("দূতক") ছিলেন "মহারাজ শ্রী মহাসামন্ত" বিজয়সেন।

---

[১] 'বৈন্য' পুরাণ-কাহিনীতে পৃথু রাজার নামান্তর। এই নামটি অবলম্বন ক'রে এবং পৃথুর সঙ্গে পৃথিবীকে জড়িয়ে ফেলে আর সেই সূত্রে বরাহ-অবতার কল্পনার জোট পাকিয়ে পরবর্তী কালে প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজবংশের উৎপত্তি কল্পিত হয়েছে। আসলে 'বৈন্য' মানে আদরণীয়, বাঞ্ছনীয়, প্রার্থনীয়। এই বিশেষণ অর্থে এবং ব্যক্তিনাম হিসাবে শব্দটির প্রয়োগ ঋগ্‌বেদে আছে। বৈন্যগুপ্ত শৈব ছিলেন। এঁর প্রচলিত মুদ্রা পাওয়া গেছে।

[২] ৪০ দ্রোণবাপ = ১ পাটক; ৮ দ্রোণবাপ = ১ কুল্যবাপ। সুতরাং ১ পাটক = ৫ কুল্যবাপ (বিঘা)। অতএব ১১ পাটক = ৪৫ বিঘা।

উপরিক (?) রুদ্রদত্তও "মহারাজ" এবং তাঁর দূতকও "মহারাজ", তবে তিনি "মহাসামন্ত" (স্বাধীনকল্প সীমান্ত ভূমির অধিকারী অথবা শাসনকর্তা)। বাংলা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি যে কীভাবে স্বতন্ত্র রাজ্যখণ্ডে পরিণত হ'য়েছিল তার কিছু নির্দেশ এখানে পাওয়া গেল।

দূতকের সঙ্গে ছিলেন কুমারামাত্য বেরজ্জস্বামী (সম্ভবত নিযুক্তক), এবং ভামহ বৎস এবং ভোগিক (সম্ভবত আযুক্তক অথবা অধিকরণের স্থলবর্তী মহত্তর)। দলিল লিখিয়েছিলেন "সন্ধিবিগ্রহাধিকরণ-কায়স্থ" (অর্থাৎ সন্ধি কিংবা যুদ্ধ আদেশ দেবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত চীফ্ সেক্রেটারি) নরদত্ত। প্রদত্ত ভূমির চৌহদ্দি বর্ণনায় প্রদ্যুম্নেশ্বর দেবকুলের জমির এবং শাক্যভিক্ষু আচার্য জিতসেনের বিহার-অধিকৃত জমির উল্লেখ আছে।

একটি দামোদরপুর তাম্রশাসনে (বুধগুপ্তের আমলে প্রদত্ত) বলা হয়েছে যে নগরশ্রেষ্ঠী রিভুপাল[১] কোকামুখস্বামী ও শ্বেতবরাহ-স্বামীর পূজার জন্য দুটি দালান ("কোষ্ঠিকা") নির্মাণ করাতে ও ভূমিদান করতে চান। ভূমির পরিমাণ এগার কুল্যবাপ। দুটি দেবতাই বিষ্ণুর মূর্তিভেদ। "কোকামুখ" ("কোকমুখ") মানে নেকড়ে-মুখ। সম্ভবত নরসিংহ অবতারের রূপ। (কোকামুখ-দেবীর উল্লেখও পাওয়া যায় পরবর্তী কালের প্রত্নলিপিতে।) বরাহমূর্তি বিষ্ণুর পূজা গুপ্ত-শাসনকালে বেশ প্রচলিত ছিল। পরে শুধু স্থাপত্যেই এই মূর্তি পাওয়া গেছে। পরবর্তী কালের (৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) দামোদরপুরে প্রাপ্ত, একটি তাম্রশাসনে সম্ভবত রিভুপালের প্রতিষ্ঠিত এই শ্বেতবরাহস্বামীরই (অর্থাৎ বরাহ-অবতার মূর্তির) দেবকুলের সংস্কার ও ষোড়শোপচার পূজা চালাবার জন্যে ("শ্বেতবরাহস্বামিনো দেবকুলে খণ্ডফুট্টপ্রতিসংস্কার-করণায় বলিচরুসত্রপ্রবর্তনগব্যধূপপুষ্পপ্রাপণ-মধুপর্কদীপাদ্যুপযোগায়") "আয়োধ্যক (অযোধ্যা নিবাসী) কুলপুত্রক" অমৃতদেব বিঘাপ্রতি তিন দীনারিকা দরে পাঁচ বিঘা জমি পনেরো দীনারিকায় কিনে দিলেন। এই ভূমির মধ্যে বাস্তুও ছিল ("বাস্তুভিস্ সহ")।

---

[১] = ঋভুপাল। ঋভু বৈদিক দেবতা।

বগুড়া জেলায় বইগ্রামে ("বায়িগ্রাম")[১] প্রাপ্ত প্রত্নলিপিতে (৫) জানা যায় যে ভূমিদানকারী ভদ্র গৃহস্থ ("কুটুম্বি") দু ভাই ভোয়িল ও ভাস্কর, তাঁদের পিতা শিবনন্দীর প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দস্বামীর (অর্থাৎ বিষ্ণুর) দেবকুলের আয় অল্প ব'লে ("তদসাবল্পবৃত্তিকঃ") সে অর্থে কিছু জমি কিনে দিলেন। ভোয়িল দিলেন ত্রিবৃতা গ্রামে তিন খিল কুল্যবাপ ও শ্রীগোহালী গ্রামে এক দ্রোণবাপ বাস্তু, ভাস্কর দিলেন শ্রীগোহালী গ্রামে এক দ্রোণবাপ বাস্তু। উপরিক ছিলেন কুমারামাত্য কুলবৃদ্ধি। ইনি থাকতেন পঞ্চনগরীতে। আধুনিক পাঁচবিবি যদি এই পঞ্চনগরী হয় তবে বুঝতে হবে লোকে স্থানটিকে পঞ্চ-নাগরী বলত।

বইগ্রাম শাসনের তিরিশ-একতিরিশ বছর পরে প্রদত্ত, রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে প্রাপ্ত শাসনে ভুক্তি বীথী ও মণ্ডলের উল্লেখ আছে, তার পরে উল্লেখ আছে "পার্শ্ব"। এটি কি মণ্ডলের বা বীথীর ভগ্নাংশ? এই শাসনের বিষয় হ'ল এক ব্রাহ্মণদম্পতী কর্তৃক স্থানীয় জৈন বিহারে ভূমিদান। বটগোহালী গ্রামের অধিবাসী ব্রাহ্মণ নাথশর্মা ও তাঁর পত্নী রামী অধিকরণের কাছে আবেদন করেছিলেন দেড় বিঘা জমি ক্রয় করবেন ব'লে। এই জমি দান করা হ'ল বটগোহালীর বিহারে অর্হৎদের পূজার ও নৈবেদ্য ইত্যাদির জন্যে। বাংলা দেশে জৈন বিহারের অস্তিত্ব এই প্রথম জানা গেল। আরও জানা গেল যে ব্রাহ্মণেরাও জৈন মন্দিরে পূজা দিতেন।

উপরে উল্লিখিত প্রত্নলেখগুলিতে প্রায়ই জমির দরের উল্লেখ আছে। এই উল্লেখ থেকে জানা যায় যে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে জমির দাম সব চেয়ে বেশি ছিল ফরিদপুর অঞ্চলে। এখানে এক বিঘা ("কুল্যবাপ") জমির দাম ছিল চার দীনারিকা (=দীনার, সোনার মোহর, অথবা সেই ওজনের সোনা)। সব চেয়ে কম ছিল রাজসাহী-বগুড়া অঞ্চলে।

---

[১] দামোদরপুর ঘ প্রত্নলিপিতেও বায়িগ্রামকের উল্লেখ আছে। এই গ্রামে বোধ হয় তাঁতের কাজ চলত।

সেখানে একবিঘা জমির দাম ছিল তুই দীনার। দিনাজপুর অঞ্চলে দর ছিল মাঝামাঝি,—এক বিঘার দাম তিন দীনার ("ত্রীদীনারিক্য-কুল্যবাপ")।

দামোদরপুর ঘ তাম্রপট্টের টানা অনুবাদ করে দেওয়া গেল। এর থেকে তখনকার দিনের জমিজমা ক্রয়বিক্রয়ের হদিস অনেকটা পাওয়া যাবে।

'১৬৩ সংবৎ' আষাঢ় ১৩ দিবসে পরমদৈবত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীবুধগুপ্ত পৃথিবীপতির আমলে তৎপাদাশ্রিত, পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তিতে উপরিক, মহারাজ ব্রহ্মদত্তের কার্যকালে—স্বস্তি—

'পলাশবৃন্দক[২] থেকে বিশ্বাস[৩] সমেত মহত্তরাদি অষ্টকুলাধিকরণ[৪] (ও) গ্রামিক কুটুম্বীদের[৫] এবং চণ্ডগ্রামকে[৬] ব্রাহ্মণাদি অক্ষুদ্রপ্রকৃতি[৭] কুটুম্বীরা কুশল উক্তি করে বলছেন: গ্রামিক নাভক আমাদের জানাচ্ছে,—মাতাপিতা ও নিজের পুণ্যবৃদ্ধির জন্যে আমি চাই কতকগুলি আর্য ব্রাহ্মণকে বসবাস করাতে, তাই অনুগ্রহ ক'রে গ্রামের দর অনুসারে বিক্রয়পদ্ধতিতে[৮] আমার কাছ থেকে সোনা নিয়ে সকল দাবিদাওয়ার বাইরে[৯] পতিত[১০] (খিল[১১]) ভূমি দান করুন[১২]—এই কথা।

'যেহেতু পুস্তপাল পত্রদাস নির্ণয় করেছেন যে এঁর বিজ্ঞাপিত বিক্রয়পদ্ধতি[১৩] ঠিক আছে সেই হেতু পরমভট্টারক মহারাজপাদ দিতে পারেন এঁকে পুণ্যবৃদ্ধির কারণে।

'আরও, এই পত্রদাসের নির্ণয় স্বীকার ক'রে নাভকের হাত থেকে (তুই) দীনার নিয়ে স্থায়পাল কপিল ও শ্রীভদ্র দ্বারা জমা দিয়ে

---

[১] গুপ্তাব্দ,=৪৮২ খ্রীষ্টাব্দ। [২] গ্রামনাম, সম্ভবত বীথী। নামটি এখনকার দিনে হবে "পলাশবোঁদা" বা এইরকম। [৩] হিসাববিভাগীয়, বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী। সম্ভবত বীথীর হিসাবরক্ষকের পদবী। [৪] আটটি বৃত্তি-গোষ্ঠীর অধিনায়কেরা। [৫] গ্রামের বড় গৃহস্থ। [৬] চণ্ডগ্রামের জমি নেওয়া হচ্ছে। [৭] মধ্যবিত্ত ব্যক্তি। [৮] "গ্রামানুক্রমবিক্রয়মর্য্যাদয়া"। [৯] "সংগ্রহ-বাহ্য"। [১০] "অপ্রদ"। [১১] অকর্ষিত। [১২] "প্রসাদং কর্তুম্"। [১৩] "বিক্রয়মর্য্যাদাপ্রসঙ্গ"।

সমুদয় দাবিদাওয়ার বাইরে পতিত খিল ভূমির এক বিঘা[১] এই বায়িগ্রামকের উত্তর পাশে ঠিকমত[২] দক্ষিণ পশ্চিম পূর্বে, মহত্তরাদি অধিকরণ ও কুটুম্বীদের সাক্ষাতে[৩] আট-নয় নলে[৪] মেপে নিয়ে[৫] চৌহদ্দি ঠিক ক'রে[৬] নাগদেবকে[৭] দেওয়া হল। অতএব ভবিষৎ কালে সংব্যবহারীরা[৮] যেন ধর্ম চেয়ে (এই দান) মেনে চলেন। মহর্ষিরাও বলেছেন...[৯]।'

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে কর্ণসুবর্ণে এক সার্বভৌম রাজার অধিকারের সন্ধান মিলেছে। (অনেক ঐতিহাসিক এঁকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্য অথবা শেষভাগে শশাঙ্কের পরবর্তী বলে মনে করেন। কিন্তু এঁর তাম্রশাসনটি অনুধাবন করলে শশাঙ্কের পূর্ববর্তী মানতে হয়)। ইনি "মহারাজাধিরাজ পরমভাগবত শ্রীজয়নাগদেব"। কর্ণসুবর্ণ থেকে ("কর্ণসুবর্ণাবস্থিতস্ত") এঁর একটি তাম্রশাসনপট্ট পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু কোথায় তা জানা নেই। তাম্রপট্টটি বিলাতে চলে যায়। সেখান থেকে এল্. ডি. বার্নেট সেটির পাঠোদ্ধার করেন।[১০] শাসনপট্টের শেষ অংশ ভগ্ন, সুতরাং দূতক খোদাইকর সংবৎ ইত্যাদি কিছুই পাওয়া যায় নি। জয়নাগের অনুগত সামন্ত নারায়ণভদ্র ঔডুম্বরিক বিষয় (বর্তমান বীরভূম জেলায় উত্তরাংশ ও সংলগ্ন মুর্শিদাবাদ জেলায় দক্ষিণ অংশ) ভোগ করতেন, আর সেই বিষয়ের ব্যবহারিক 'admini-strator) ছিলেন মহাপ্রতীহার সূর্যসেন। সামন্ত মহাশয় ("সামন্ত-পাদৈঃ") আদেশ দিয়েছিলেন যে তাঁর পিতামাতার ও নিজের পুণ্য এবং যশ বৃদ্ধির হেতু ছন্দোগ বেদাধ্যায়ী সশিষ্য ভট্ট ব্রহ্মবীরস্বামীকে যে বপুঘোষবাট গ্রাম চিরস্থায়ী দান করেছিলেন, তা এখন চতুঃসীমা

[১] "কুল্যবাপ"। [২] "সত্যমর্য্যাদয়া"। [৩] প্রত্যবেক্ষ্য"। [৪] অর্থাৎ ছাপ্পান্ন হাত দীর্ঘ মানদণ্ডে। [৫] "অপবিঞ্ছ্য"। [৬] "চতুস্‌সীমোল্লিঙ্গ্য"। [৭] গ্রহীতা ব্রাহ্মণের নাম। [৮] উত্তরাধিকারীরা। [৯] অতঃপর কতকগুলি শাস্ত্রীয় শ্লোক।

[১০] এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা ১৮, পৃ ৬০-৬৪।

অবধারিত ক'রে বিষয়মুদ্রা-যুক্ত তাম্রশাসন ক'রে দিতে হবে। এর পরে প্রদত্ত গ্রামভূমির চৌহদ্দি বর্ণনা, তারপর খণ্ডিত। রাজা জয়-নাগ ছিলেন বৈষ্ণব। তাম্রপট্টটি দেবার সময়ে রাজার অধিকার খুব বিস্তৃত ছিল ব'লে মনে হয় না। তার কারণ, প্রথমত নারায়ণভদ্রকে "সামন্তপাদ" বলে উল্লেখ, দ্বিতীয় কারণ নারায়ণভদ্রই ভূমিদান করছেন, তৃতীয় কারণ তাম্রপট্টে বিষয়াধিকরণ মুদ্রার সংযোগ। অবশ্য তৃতীয় কারণটি খুব জোরালো নয়। পঞ্চম শতাব্দীর একাধিক তাম্রপট্টে বিষয়াধিকরণ-মুদ্রার ছাপ আছে। এখানেও যদি তারই অনুসরণ ধরি তাহ'লে নারায়ণভদ্রকে উপরিক-স্থানীয় মনে করতে হয়। বিষয়াধিকরণ মুদ্রাটি খুব স্পষ্ট নয়। তবে লাঞ্ছনটি যে দণ্ডায়মান গজলক্ষ্মী মূর্তি তা বোঝা যায়। মূর্তির নীচে যে লিপি আছে তা পড়া যায় নি।

গুপ্ত-রাজারা মুদ্রা (মোহর, টাকা) বার করতেন। সেগুলি সোনার ও রূপার হ'লে দীনার নামে খ্যাত ছিল। বঙ্গভূমিতে গুপ্ত--শাসন শেষ হবার পরেও এদেশে গুপ্ত-মুদ্রার প্রচলন কমে নি। এমন কয়েকজন গুপ্ত-রাজার মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে যাঁদের এদেশের সঙ্গে কোন বৈষয়িক সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায় নি। যেমন নরসিংহগুপ্ত, (তৃতীয়) চন্দ্রগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত ও জয়গুপ্ত। সমাচারদেবের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। ইনি এদেশেরই রাজা ছিলেন, কিন্তু হদিস নেই। ফরিদপুরে (ঘাঘরাবাটী) গ্রামে সমাচারদেবের একখানি তাম্রপট্ট মিলেছিল। কিন্তু সে দলিলখানি জাল ব'লে স্থির হয়েছে। বঙ্গভূমির প্রথম রাজা যিনি স্বর্ণমুদ্রা চালিয়েছিলেন তিনি হলেন বৈন্যগুপ্ত। এঁর তাম্রশাসন আগে আলোচিত হয়েছে।

ফা-হিয়েনের বর্ণনায় পেয়েছি যে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাংলা দেশে অনেক বোদ্ধ বিহার ছিল। পরবর্তী শতাব্দীতেও

বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয় নি। সমৃদ্ধিপূর্ণ সে সব বিহারে শাস্ত্র ও সাহিত্য আলোচনা খুবই হ'ত এবং পট ও প্রস্তর প্রতিমা নির্মাণে শিল্পকলার পরিশীলন চলত। বিহারের সৌধ নির্মাণে স্থাপত্য-রীতির উন্নতি ঘটেছিল। মহাযান-পন্থার বিভিন্ন মতের আচার্যরা এদেশে যে অত্যন্ত মান্যগণ্য ছিলেন তা ত্রিপুরা জেলার গুনৈঘরে প্রাপ্ত শাসন থেকে জেনেছি। বৌদ্ধ বিহারের পরিচালনায় ধনীর অর্থ বিনিযুক্ত হত। যে জৈন-বিহারের উল্লেখ আগে করেছি তাও ঐশ্বর্যবিহীন নয়। বিষ্ণু-পূজায় সাধারণ গৃহস্থের আগ্রহ বেশি ছিল ব'লে অনুমান হয়। তবে তিনটি মতের মধ্যে বিশেষ কোন সামাজিক বিরোধ ছিল ব'লে মনে হয় না।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে ব্যক্তিনামে কোন বিভেদ ছিল না। নামের যে শেষ অংশ অনেক পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণেতর জাতি-সমূহের পদবীতে পরিণত হয়েছিল সে সবও এইসময়ে ব্রাহ্মণের নামেও দেখা যায়, তবে ব্রাহ্মণের নামের পরে প্রায়ই 'স্বামী' (এখনকার 'ঠাকুর') উল্লিখিত থাকে। যেমন বৎসপাল স্বামী, গোমিদত্ত স্বামী।

ব্রাহ্মণেতর লোক তখনও এখনকার অর্থে বিভিন্ন জাতি-সমাজে (caste) স্তরীভূত হয় নি। 'পুস্তপাল' ও 'কায়স্থ' তখন প্রায় সমানার্থক ছিল। 'পুস্তপাল' প্রাচীনতর শব্দ, 'কায়স্থ' নূতন আমদানি। সম্ভবত এঁরাই হিসাবপত্রের কাজে কাগজের ব্যবহার প্রবর্তন করেছিলেন। এটি জাতি ("কুল") নামে পরিণত হয়েছে নবম-শতাব্দীতে।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে পশ্চিম আর্যাবর্ত থেকে "বেদজ্ঞ" অর্থাৎ শাস্ত্রমতে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণদের এদেশে আগমন ও নিবাস ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। গুপ্ত-রাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের এবং সেইসূত্রে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের শাস্ত্রের ও সে শাস্ত্রের ভাষা সংস্কৃতের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের সময় থেকে—শুশুনিয়া লিপির কালও সেই আওতায় পড়ে—প্রশাসনিক কাজে সংস্কৃত ব্যবহৃত হ'ত। মহাস্থান শিলাচক্রলিপি

এদেশের একমাত্র প্রাকৃত (অর্থাৎ অ-সংস্কৃত) প্রত্নলিপি। আলোচ্য কালে এদেশের সমসাময়িক কথ্যভাষা প্রাকৃতের বিন্দুমাত্র স্থানও তাম্রপট্টের ভাষায় উল্লেখযোগ্য নয়, তবে আভাস আছে। কোন কোন ব্যক্তিনামে সে ছাপ স্পষ্ট। নামে যেমন 'রিশিদত্ত', 'রিসিদত্ত' (<ঋষিদত্ত), 'রিভুপাল' (<ঋভুপাল), 'রেবজ্জস্বামী' (<*রেভবন্ত, =বক্‌বক্‌কারী ?)। শব্দে যেমন 'মিতু' (<মৃতু), 'পক্ক' (<পক্ক), 'হুজ্জিক' (<*হুজ্জিক), ইত্যাদি॥

৫

সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী

গুপ্ত-অধিকারের সময় থেকে বাংলা দেশে পশ্চিম অঞ্চল (প্রধানত উত্তর প্রদেশ) থেকে বেদজ্ঞ-অভিমানী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের উপনিবেশ শুরু হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে এমন উপনিবিষ্টর সংখ্যা বেশি ছিল ব'লে বোধ হয় না। ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর্যাবর্তে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই ছিল। হয়ত এই কারণে আচারনিষ্ঠ পশ্চিমা ব্রাহ্মণেরা এদেশে নিভৃত ও স্বচ্ছন্দ নিবাসের জন্য চলে আসেন। কেউ কেউ হয়ত শাসনকর্তাদের গুরুবংশীয় ছিলেন। সপ্তম ও পরবর্তী তিন-চার শতাব্দে উপনিবেশকারী ব্রাহ্মণের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে গিয়েছিল। এই উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণেরা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত স্থানীয় শাসনকর্তাদের রাজপাটে অভিষিক্ত হ'তে সাহায্য করেছিলেন। পরে দেখব যে রাজ্য-শাসনে এমন কি যুদ্ধচালনায়ও এদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব কতদূর গভীর ছিল।

ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে বাংলা দেশের পুরাতন শাসনপদ্ধতি—যাতে রাজানুগৃহীত অথবা রাজকোষপুষ্ট নয় এমন সাধারণ লোকের সহযোগিতা ছিল—পরিবর্তিত হ'তে থাকে। অধিষ্ঠান ও বীথী অধিকরণে নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথমকুলিক ইত্যাদি অধিবাসী প্রধান ব্যক্তিদের পরিবর্তে রাজসভাসদ ও মন্ত্রীরাই স্থান পেতে লাগল, মহত্তর ইত্যাদি গৃহস্থপ্রধানেরাও সাধারণ রাজসভাসদ্দের মতো অকর্মণ্যতা প্রাপ্ত হ'ল, এইরকম অনুমান হয়। উপরিক হয়েছেন 'মহারাজ', অধিকরণে তার স্থান নিয়েছে 'দূতক' (plenipotentiary)।

পূর্বভারতের ইতিহাসে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে একটি নাম জেগে ওঠে—শশাঙ্ক। ঐতিহাসিকেরা শশাঙ্কর সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছেন কিন্তু এঁর সম্বন্ধে সঠিক খবর খুব বেশি পাওয়া যায় নি।

যা পাওয়া গেছে তা সমসাময়িক বর্ণনার পর্যায়ে পড়লেও অনেকটা গল্পকাহিনীর মতো। কবি বাণভট্ট তাঁর অনুগ্রাহক ও সুহৃদ হর্ষবর্ধনের জীবনকথা নিয়ে একটি গদ্য কাব্য লিখেছিলেন, নাম 'হর্ষচরিত'। সেই হর্ষচরিতে শশাঙ্কর প্রসঙ্গ আছে। শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনের নিদারুণ বিপক্ষ ছিলেন। তাঁরই চক্রান্তে হর্ষবর্ধনেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও রাজ্যাধিকারী রাজ্যবর্ধন নিহত হন। শশাঙ্কর সম্বন্ধে বাণভট্টর মুক্তচিত্ততা আশা করা যায় না। সুতরাং বাণভট্টর সব কথা ইতিহাসসম্মত না হওয়াই সম্ভব। আর একজনের লেখায়ও শশাঙ্কর সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। তিনি শশাঙ্কর প্রায় সমসাময়িক, চীনীয় পর্যটক হিউয়েন-সাঙ। ইনি যখন নালন্দায় পড়তে গিয়েছিলেন তখন শশাঙ্ক জীবিত ছিলেন না। হিউয়েন-সাঙও বাণভট্টর মতোই শশাঙ্ককে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারেন নি। বৌদ্ধ পরিব্রাজকের ধারণায় শশাঙ্ক প্রচণ্ড বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। বাণভট্ট ও হিউয়েন-সাঙের অভিযোগের আলোচনা ক'রে তবে শশাঙ্কর খাঁটি খবর নির্ণয় করতে চেষ্টা করি।

বাণভট্ট বলেছেন গৌড়াধিপ কথা দিয়ে রাজ্যবর্ধনকে বাড়িতে ডেকে এনে গুপ্তহত্যা করেছিলেন। রাজ্যবর্ধনের গুপ্তহত্যা সত্য, কেন না হর্ষবর্ধনের তাম্রপট্টে উল্লিখিত আছে যে প্রতিজ্ঞা রাখতে গিয়ে রাজ্যবর্ধন প্রাণত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর হত্যাকারী যে শশাঙ্ক সে কথার কোথাও কোন ইঙ্গিত নেই। হিউয়েন-সাঙ বলেছেন যে শশাঙ্কর অনুমোদনক্রমে তাঁর অমাত্যেরা রাজ্যবর্ধনকে সন্ধির জন্য ডেকে এনে খুন করেছিল। অর্থাৎ হিউয়েন-সাঙ শশাঙ্ককে সরাসরি হত্যাকারী বলছেন না, তবে হত্যার জন্যে দায়ী করছেন।

শশাঙ্ক ছিলেন শৈব। তাঁর মুদ্রায় বৃষের লাঞ্ছন। হিউয়েন-সাঙ জেনেছিলেন, তিনি নিদারুণ বৌদ্ধবিদ্বেষী। শশাঙ্কর বৌদ্ধ-বিদ্বেষের উদাহরণ দিয়ে হিউয়েন-সাঙ বলেছেন যে তিনি কুশীনগরের বিহার থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিতাড়িত করেছিলেন, পাটলীপুত্রে বুদ্ধের চরণচিহ্নাঙ্কিত যে প্রস্তরখণ্ড ছিল তা গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলেন,

বজ্রাসনের[১] বোধিবৃক্ষ সমূলে ধ্বংস ক'রে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং এক বুদ্ধপ্রতিমা ফেলে দিয়ে সেখানে শিবমূর্তি (বা শিবলিঙ্গ) স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। এই কয়টি ঘটনার মধ্যে তৃতীয়টিতে হিউয়েন-সাঙের সাক্ষ্য কতকটা নির্ভরযোগ্য বটে কেননা বিধ্বস্ত বোধিদ্রুম তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তবে সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য নয় কেন না হিউয়েন-সাঙ ওখানে যাবার অনেক বছর আগেই ঘটনাটি ঘটে গিয়েছিল। শৈব শশাঙ্কর পক্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিরূপ থাকা অস্বাভাবিক নয়, তবে এতটা অত্যাচার স্বাভাবিক মনে হয় না। পরে দেখব যে ব্রাহ্মণ্যমতাবলম্বীদের মধ্যে শৈবরাই আগে বৌদ্ধধর্মের দিকে ঝোঁক দেখিয়েছিলেন। বৌদ্ধরা শশাঙ্ককে ভালো চোখে দেখতে পারেননি, সুতরাং তাঁরা সব দোষই নন্দঘোষের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে থাকবেন।

শশাঙ্ক সংকীর্ণ অর্থে বাঙালী ছিলেন না। সম্ভবত তিনি মগধের লোক ছিলেন। রোটাসগড়ের পাথরে তাঁর মুদ্রার ছাঁচ (matrix) খোদাই করা আছে,—"শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক"। পণ্ডিতেরা মনে করেন তিনি মগধের গুপ্তবংশীয় রাজার মহাসামন্ত ছিলেন, সম্ভবত আত্মীয়ও। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে "শশাঙ্ক" তাঁর নাম নয় বিরুদ, তাঁর নাম ছিল নরেন্দ্রগুপ্ত। যাই হোক বাংলা দেশে কোন কোন বৌদ্ধদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যপন্থীদের যে ঘোর বিবাদ হয়েছিল এমন প্রমাণ বিন্দুমাত্রও নেই। ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে এদেশে বৌদ্ধধর্মের সমাদর যথেষ্ট ছিল। শশাঙ্ক যদি বাঙালী হতেন তবে তাঁর হাতে বোধিদ্রুম ধ্বংস করা সম্ভব হ'ত বলে মনে হয় না।

ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পরে পূর্ব ভারতে শশাঙ্কর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলা দেশে

[১] বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের স্থান

শশাঙ্কর অধিকার কখনো ছিল এমন সিদ্ধান্ত করবার মতো উপাদান কোন প্রত্নলেখ থেকে পাওয়া যায় নি। তিনি যে গৌড়-অধিপতি ছিলেন সে কথা বলেছেন হিউয়েন-সাঙ। তবে উড়িষ্যায় যে শশাঙ্কর অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ, উড়িষ্যায় কোঙ্গদ প্রদেশের (চিলকা অঞ্চল) মহারাজ মহাসামন্ত মাধবরাজের লেখে রাজাধিরাজ ব'লে শশাঙ্ক উল্লিখিত আছেন। শশাঙ্কর সম্বন্ধে এই একটি মাত্র খাঁটি তারিখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের (অর্থাৎ হিউয়েন-সাঙের আগমনের) কিছুকাল আগেই শশাঙ্কর মৃত্যু ঘটেছিল। এ নিছক অনুমান মাত্র।

শশাঙ্ক বাংলা দেশের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ,—ঐতিহাসিকদের এই মত যুক্তির বা প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ঐতিহাসিকেরা নির্ভর করেছেন হিউয়েন-সাঙের একটি কথার উপর। হিউয়েন-সাঙ বলেছেন যে বোধিসত্ত্ব হর্ষবর্ধনকে রাজসিংহাসনে বসতে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে কর্ণসুবর্ণর রাজা সেখানে বৌদ্ধধর্মের যে ক্ষতি করেছিলেন তা তিনি পূরণ করবেন। কিন্তু এ উক্তি থেকে এমন বোঝায় না যে শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণর রাজা ছিলেন। আগের অধ্যায়ে উল্লিখিত কর্ণ-সুবর্ণর মহারাজাধিরাজ পরমভাগবত জয়নাগের কথা এখানে স্মরণ করব। তবে শশাঙ্ক যদি মগধ-উড়িষ্যার রাজা হন তবে তাঁর পক্ষে বঙ্গভূমি অধিকার কিছু বিচিত্র কর্ম ছিল না।

হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কর কোথাও যুদ্ধ হয়েছিল এমন কথা বলবার মতো কোন উপাদান নেই। হর্ষবর্ধনের মিত্র কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার সঙ্গেও শশাঙ্কর কোন সংঘর্ষের প্রমাণ নেই। হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মা দুজনেই "কুমাররাজ", অর্থাৎ তাঁরা পিতার থেকে সাক্ষাৎ রাজ্যাধিকার পান নি, পেয়েছিলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছ থেকে। এ দুজনের মিলিত শক্তি বাংলা দেশের পক্ষে শুভকর হয় নি। হর্ষবর্ধনের প্রশ্রয় পেয়ে

ভাস্করবর্মা কিছুকালের জন্য কর্ণস্মুবর্ণ অধিকার করেছিলেন। সে অধিকার নিতান্ত সাময়িক, তাই তিনি কর্ণসুবর্ণকে "বাসক" (অর্থাৎ বাসা) বলেছেন।

কিছুকাল আগে আবিষ্কৃত ভাস্করবর্মার আর একটি তাম্রশাসন (—দু পিঠে লেখা পাঁচটি ফলক ও লিপিযুক্ত মুদ্রা সমন্বিত—) থেকে কিছু নূতন খবর পাওয়া যাচ্ছে।[১] সুস্থিতবর্মার মৃত্যু হ'লে পর (—গৌড়দের সঙ্গে যুদ্ধে কি না স্পষ্ট বোঝা গেল না—) অল্পবয়সী দুভাই সুপ্রতিষ্ঠিতবর্মা ও ভাস্করবর্মা আক্রমণকারী (?) গৌড়দের বাধা দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। গৌড়বাহিনী তাঁদের ঠেলে ঘরে (রাজধানীতে বা রাজ্যমধ্যে) নিরাপদে পৌঁছে দেয়। তারপর সুপ্রতিষ্ঠিতবর্মা সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ভাস্করবর্মা রাজা হন।

এই তথ্য থেকে জানা গেল কেন ভাস্করবর্মা গৌড়-অভিযানে হর্ষবর্ধনের সহায়তা করতে চেয়েছিলেন।

তাম্রপট্টগুলি অংশত খণ্ডিত, পাঠ সর্বত্র পরিষ্কার নয়। উপযুক্ত অংশ কিছু উদ্ধৃত করি।

যাবেতৌ প্রথমে বয়স্যপি পৃথুপ্র[ভিন্ন]-সত্ত্বোদ্‌গমৌ
শক্রাংশং বিধিনা প্রগত্য পিতরি···নিলীনে ক্রমাৎ।
প্রাপ্তে গৌড়বলে বলিষ্যপি···বিশ্রব্ধসংরম্ভতঃ
স্তোকৈরেব বলাচ্যুতাবিব বলৈ র্যৌ লীলয়োপস্থিতৌ॥

'যাঁরা দুজনে অল্পবয়সী হয়েও প্রচুর এবং প্রকট শক্তিশালী ছিলেন, অদৃষ্টের বশে পিতা স্বর্গত হ'য়ে ইন্দ্রের অংশভাগী হ'লে, পর বলবান্ গৌড়বাহিনী এগিয়ে এলেও বলরাম ও কৃষ্ণের মতো যাঁরা খেলার প্রচেষ্টা-ছলে অল্প সৈন্য নিয়ে অবলীলাক্রমে সম্মুখীন হয়েছিলেন॥'

[১] Doobi Copper-plate Inscription of Bhaskaravarman, P. G. Choudhury. The Journal of the Assam Research Society, Vol. XII, No. 1 and 2, পৃষ্ঠা ২৮-২৯।

তত্রোপস্থায় যুদ্ধে.............................
বাণৈঃ............ভুজবলৌ ভূমৌ চাবাপ্তদর্পৌ ।
গৌড়ানাং (লীলা)য়ৈব প্রবলকরিঘটাঃ ক্রৌঞ্চশৈলাবলীবদ্
বহ্বী (স্তেষা) মভেত্তাং হতবিবিধরিপূ তীক্ষ্ণবাণৈ র্যথা তৌ ॥

'সেখানে যুদ্ধে উপস্থিত হ'য়ে......দর্পাশ্রিত হ'য়ে তাঁরা দুজনে ভুজবল আশ্রয় ক'রে পদাতিক রূপে অবলীলায় গৌড়সৈন্যের প্রচণ্ড হস্তিব্যূহ—ক্রৌঞ্চ পর্বতমালার মতো বহুসংখ্যক—তীক্ষ্ণবাণে ভেদ করলেন, তেমনি আরও অনেক শত্রুকে ॥'

দেশং স্বকং বিধিবশাদ্ উপনীতয়োশ্চ
তৈঃ শত্রুভিঃ খলু যয়ো গুর্ণবত্তয়ৈব ।
প্রাপ্য স্বরাজ্যমচিরাৎ পুনরাগতৌ তৌ
পিত্র্যং জগদ্ ভৃশমিদন্তু ননন্দ তুশ্চ ॥

'দৈববশে এবং তাঁদের গুণবত্তার জন্যে শত্রুর সৌজন্যে তাঁরা নিজের দেশ পৌঁছলেন এবং অচিরে নিজেদের রাজ্যে এসে আবার পিতার ভূমি পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন ॥'

ঐতিহাসিকেরা শশাঙ্কর যে বিবরণ গড়েছেন তার উপাদান যুগিয়েছেন বাণভট্ট আর হিউয়েন-সাঙ, কিন্তু সে উপাদানে তাঁরা অনেকখানি কল্পনার মশলা মিশিয়ে দিয়েছেন। কল্পনার মশলা বাদ দিয়ে শশাঙ্কর কথা বাণভট্টর ও হিউয়েন-সাঙের অনুসারেই আলোচনা করি। বাণভট্ট হর্ষবর্ধনের সুহৃদ ও সভাসদ্ ছিলেন। সুতরাং এখনকার গবেষণার ভাষায় তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তিনি বলেছেন যে একদিন হর্ষবর্ধন সভায় বসে আছেন এমন সময় জ্যেষ্ঠভ্রাতা, রাজাধিরাজ রাজ্যবর্ধন যিনি ভগিনীপতি গ্রহবর্মার পরাজয় ও হত্যার শোধ নিতে অভিযান করেছিলেন, তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর কাঁদতে কাঁদতে এসে জানালে যে রাজ্যবর্ধন অনায়াসে বিপক্ষ মালববাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন বটে তবে মিথ্যা আশ্বাসে প্রলুব্ধ ক'রে সরলবিশ্বাসী তাঁকে একাকী নিরস্ত্র অবস্থায়

গৌড়াধিপ নিজভবনে এনে হত্যা করেছে।[১] শুনে হর্ষবর্ধন খেদ করতে লাগলেন, গৌড়াধিপ ছাড়া কে আর তেমন মহাপুরুষকে এমন নীচভাবে হত্যা করবে।...পাপকারী এব্যক্তির নাম নিতেও যেন আমার জিহ্বা পাপমলে লিপ্ত হচ্ছে।...গৌড়াধম কেবল অকীর্ত্তিই সঞ্চয় করলে; ইত্যাদি। হর্ষবর্ধনের খেদ শুনে পিতৃমিত্র বৃদ্ধ সেনাপতি প্রবোধ দিয়ে ব্যাপকভাবে যুদ্ধযাত্রা করতে উপদেশ দিলেন। তাতে ভ্রাতৃহত্যার শোধ নেওয়া হবে এবং রাজ্যের ও যশের বৃদ্ধি হবে। হর্ষবর্ধন সম্মত হলেন। বললেন, 'গৌড়াধমের চিতাধূমমণ্ডল না দেখলে আমার চোখের জল শুকবে না। শুনুন আমার প্রতিজ্ঞা। আপনার পায়ের ধূলা নিয়ে শপথ করছি, যদি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে...পৃথিবীকে গৌড়হীন না করি তবে পাতকী আমি পতঙ্গের মতো ঘি-ঢালা জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেব।'[২] খুব জাঁকজমক করে হর্ষবর্ধন জয়যাত্রায় বেরুলেন গৌড়ের উদ্দেশে। অনেক দূর যাবার পর কামরূপের রাজা (—বাণভট্ট এঁকে "কুমার" বলেছেন—) ভাস্করবর্মার দূত প্রচুর উপঢৌকন ও স্থায়ী সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হর্ষবর্ধনের কাছে এল। (এই ব্যাপারে পণ্ডিতেরা শশাঙ্কর প্রতি ভাস্করবর্মার বিদ্বেষ লক্ষ্য করেছেন। আসলে তা নয়। রাজ্যরক্ষার উদ্দেশ্যেই ভাস্করবর্মা হর্ষবর্ধনের মৈত্রী খুঁজেছিলেন। হর্ষবর্ধনের পিতার মাতুল মহাসেনগুপ্ত ভাস্করবর্মার পিতা সুস্থিত-বর্মাকে পরাজিত করেছিলেন, সে কথা আগে বলেছি।)[৩] হর্ষবর্ধন সাদরে ভাস্করবর্মার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে ও সাক্ষাৎকারে সম্মত হলেন।

[১] "হেলানির্জিতমালবানীকমপি গৌড়াধিপেন মিথ্যোপচারোপচিত-বিশ্বাসং মুক্তশস্ত্রম্ একাকিনং বিশ্রব্ধং স্বভবন এব ভ্রাতরং ব্যাপাদিতম্ অশ্রৌষীৎ"। ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

[২] "অদৃষ্টগৌড়াধমচিতাধূমমণ্ডলস্য বা চক্ষুষঃ স্বল্পমপ্যশ্রুসলিলম্। শ্রূয়তাং মে প্রতিজ্ঞা শপামি আর্যস্যৈব পাদপাংশুস্পর্শেন যদি পরিগণিতৈরেব বাসরৈঃ.........নির্গৌড়াং ন করোমি মেদিনীং তত স্তনূনপাতি পীতসর্পিষি পতঙ্গ ইব পাতকী পাতয়াম্যহমাত্মানম্।"

[৩] রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস ১ (দ্বি-স) পৃ ৯৯।

(এই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল, হিউয়েন-সাঙের কথা অনুসারে, এবং কজঙ্গলে। বাণভট্ট সেকথা লেখেন নি। ও ঘটনায় পৌঁছবার আগেই তাঁর রচনা শেষ হয়ে গেছে।) তারপর কিছু দিন পরে রাজ্যবর্ধনের সঙ্গী সেনাপতি ভণ্ডি পরাজিত ও নিহত মালবরাজের ধনসম্পত্তি নিয়ে হাজির হলেন। ভণ্ডির মুখে রাজা শুনলেন যে গুপ্ত-নামক[১] এক ব্যক্তি রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পরে কান্যকুব্জ অধিকার করলে পর ভগিনী রাজ্যশ্রী বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে পরিজন-সহ নিরুদ্দেশ হয়েছেন বিন্ধ্যাটবীতে।[২] (এই "গুপ্ত" কান্যকুব্জ অধিকার ক'রে রাজ্যশ্রীকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছিলেন। "গুপ্ত" রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী গৌড়াধিপ নয়। তাহলে শেষদিন পর্যন্ত রাজ্যবর্ধনের সঙ্গী ভণ্ডি সে নাম করতেন।)[৩] এই কথা শুনে রাজা ভণ্ডিকে সৈন্যসামন্ত নিয়ে গৌড় অভিমুখে অগ্রসর হ'তে বললেন। আর নিজে সব কাজ ছেড়ে ভগিনীর সন্ধানে বিন্ধ্যাটবীতে প্রবেশ করলেন। এক শবরের কাছে খোঁজ পেয়ে রাজা এক গিরি-নদীর তীরে বৌদ্ধভিক্ষু দিবাকরমিত্রের কাছে গেলেন ভগিনীর সন্ধান করতে। আচার্যর সঙ্গে কথা কইছেন এমন সময় এক ভিক্ষু এসে বললেন যে একটু দূরে নদীতীরে এক নিভৃতস্থানে সহচরীগণ সমেত এক মহিলা দীর্ঘকাল উপবাস ক'রে এখন অগ্নিতে আত্মাহুতি করতে উদ্যত। তখনি রাজা ছুটলেন, রাজ্যশ্রীকে নিয়ে দিবাকরমিত্রের আশ্রমে ফিরে এলেন। ভ্রাতার অনুমতি নিয়ে রাজ্যশ্রী বৌদ্ধসন্ন্যাস নিলেন। তার পরে

---

১ "দেবভূয়ং গতে দেবে রাজ্যবর্ধনে গুপ্তনাম্না চ গৃহীতে কুশস্থলে দেবী রাজ্যশ্রীঃ পরিভ্রশ্য বন্ধনাৎ বিন্ধ্যাটবীং সপরিবারা প্রবিষ্টেতি লোকতো বার্ত্তামহমশৃণবম্।" সপ্তম উচ্ছ্বাস।

২ ভ্রাতার সঙ্গে মিলনের পরে রাজ্যশ্রী তাঁর দুর্দশার যে বিবরণ দিয়েছিলেন, তার থেকে আরও স্পষ্ট বোঝা যায় রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী ও রাজ্যশ্রীকে কারামুক্তকারী একই ব্যক্তি নয়। "স্বসুঃ কান্যকুব্জাৎ গৌড়সম্ভ্রমং গুপ্তিতো গুপ্তনাম্না কুলপুত্রেণ নিষ্কাসনং নির্গতায়াশ্চ রাজ্যবর্ধনমরণশ্রবণং শ্রুত্বা।" অষ্টম উচ্ছ্বাস।

৩ হর্ষচরিতের একটি পুথিতে পুরো নাম আছে নরেন্দ্রগুপ্ত (ঐ পৃ ১০২ দ্রষ্টব্য)।

আচার্য ও ভগিনীকে এবং কিছু অনুচর নিয়ে গঙ্গার তীর ধ'রে অভিযানকারী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন।[১] এই বলার পর বাণভট্টর আখ্যায়িকা শেষ হয়েছে।

বাণভট্টর কাহিনীতে—শশাঙ্কর নাম নেই ; রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী গৌড়ের রাজা (অথবা সামন্ত) গ্রহবর্মার হত্যাকারী ও কান্যকুব্জ দখলকারী গৌড়াধিপ নয়, মালবের রাজা ; মালবের রাজাকে পরাজিত ক'রে যিনি কান্যকুব্জ অধিকার করেন (এবং রাজ্যশ্রীকে অবরোধ থেকে মুক্তি দেন) তিনি হর্ষবর্ধনেরই মিত্রস্থানীয় কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ("কুলপুত্র") এবং যাঁর নাম ছিল "গুপ্ত"-অন্ত ; এবং হর্ষবর্ধন গৌড়াধিপকে জব্দ করতে ও দেশ জয় করতে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করবার কোন কথাই হর্ষচরিতে নেই। সম্ভবত ক্রুদ্ধ হর্ষবর্ধন গৌড়াধমকে নিষ্পিষ্ট করার দিকে সম্পূর্ণ মন দিয়েছিলেন অথবা তিনি প্রথমে কান্যকুব্জর দিকেই রওনা হয়েছিলেন। পথে দেখা দিলে উপহার নিয়ে কামরূপরাজ ভাস্কর-বর্মার দূত। তিনি কামরূপরাজের সঙ্গে সন্ধিবন্ধনে ও ব্যক্তিগত মিলনে সম্মত হলেন। তার পরে ভণ্ডির মুখে রাজ্যশ্রীর নিরুদ্দেশ বার্তা শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে সৈন্যসামন্ত-সহ ভণ্ডিকে গৌড়-অভিযান চালাতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে ভগিনীর অনুসন্ধানে বিন্ধ্যাটবীতে প্রবেশ করলেন। অনেকটা গিয়ে সন্ধান পেলেন। ভগিনীকে অনুমতি দিলেন সেখানে বৌদ্ধ আশ্রমের আচার্য দিবাকরমিত্রের কাছে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিতে এবং পরিশেষে বৌদ্ধ-আচার্য ও ভগিনীকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে এসে গঙ্গার ধারে অনুপ্রবিষ্ট পূর্বপ্রেরিত যুদ্ধযাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হলেন।—এই বর্ণনার মধ্যে ফাঁক থাকতে পারে, তবে কোন কোন ঐতিহাসিক যেমন দেখেছেন এমন কোন গোঁজামিল বা হেরফের কিছুমাত্র নেই। তারপর হিউয়েন-সাঙের উক্তি। আগে তার সারমর্ম দেওয়া হয়েছে।

হিউয়েন-সাঙ ইঙ্গিত করেছেন যে বৌদ্ধবিদ্বেষী শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণর

[১] "আচার্য্যেণ সহ স্বসারমাদায় প্রয়াণকৈঃ কতিপয়ৈরেব কটকমনুজাহ্নবি নিবিষ্টং সমাজগাম।" অষ্টম উচ্ছ্বাস।

রাজা ছিলেন, এবং তাঁকে দমন করবার জন্যে বোধিসত্ত্বর নির্দেশে হর্ষবর্ধন জন্মগ্রহণ করেন। হর্ষবর্ধন রাজা হন ৬০৬ খ্রীস্টাব্দে, তখন তাঁর বয়স খুব কম যদি বিশ বছরও হয় তবে বলতে হবে শশাঙ্ক ৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে ও তার আগে কর্ণসুবর্ণর পাটে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর কি কোথাও সমর্থন আছে? ৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে কর্ণসুবর্ণ-পাটে রাজা বা মহাসামন্ত একজন অবশ্যই ছিলেন, কিন্তু তিনি যে শশাঙ্ক তার প্রমাণ কী। হিউয়েন-সাঙের পক্ষপাতমূলক কিংবদন্তী মেনে নেওয়া ইতিহাসের রীতি-সম্মত নয়। তা ছাড়া রাজ্যবর্ধনের সুশাসনের হিংসা করে মন্ত্রীদের পরামর্শে সুশাসক প্রতিবেশী (—তাহ'লে শশাঙ্ক কি মগধের অধিপতি ছিলেন? কর্ণসুবর্ণর রাজা স্থান্বীশ্বরের রাজার প্রতিবেশী হ'তে পারেন না —) রাজা দ্বারা রাজ্যবর্ধনকে গুপ্তহত্যা করার কথা গল্পকাহিনী ব্যতিরেকে অন্যত্র বিশ্বাস্য নয়।

মোটকথা হ'ল এই যে বাণভট্টর উল্লিখিত গৌড়াধিপকে হিউয়েন-সাঙের উল্লিখিত শশাঙ্কর সঙ্গে কোন ক্রমেই মেলানো যায় না। শশাঙ্ক নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিন্তু তাঁকে গৌড়ের অথবা কর্ণসুবর্ণর (—হিউয়েন-সাঙ গৌড় জানতেন না, জানতেন কর্ণসুবর্ণ—) পাটে টেনে বসানো যায় না। হিউয়েন-সাঙ কর্তৃক উল্লিখিত শশাঙ্কর সমস্ত বৌদ্ধবিদ্বেষ-প্রচেষ্টা ঘটেছিল মগধ-পীঠী প্রদেশে,—তাহলে মগধ-পীঠীর মহাসামন্ত (অধিপতি) রূপে। মগধে শশাঙ্কর অস্তিত্বের খাঁটির ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

এখন একটা বড় প্রশ্ন হ'ল, বাণভট্ট ও হিউয়েন-সাঙ দুজনেই সমসাময়িক, তবে শশাঙ্কর নাম একজন করলেন না, আর একজন করলেন কেন? বাণভট্ট হর্ষবর্ধনের সভাসদ ছিলেন, তিনি রাজ্যবর্ধনের হত্যার ব্যাপার যতটা জানবেন ততটা হিউয়েন-সাঙের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অপরপক্ষে হিউয়েন-সাঙ যখন এদেশে এসেছিলেন তখন শশাঙ্ক বর্তমান ছিলেন না বটে কিন্তু তাঁর মৃত্যু ও হিউয়েন-সাঙের আগমনের মধ্যে যে নিতান্ত স্বল্পকালের ব্যবধান তাতে ঘটনার স্মৃতি

সমসাময়িকদের পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তবে কি বাণভট্ট ইচ্ছা ক'রে শশাঙ্কর নাম করেন নি? তা যদি হয় তবে তা গৌড়াধমের সম্পর্কে নয়, মালবরাজকে পরাজিত ও নিহত ক'রে যিনি কান্যকুব্জ অধিকার ক'রে রাজ্যশ্রীকে অবরোধমুক্ত করেছিলেন ভণ্ডি উল্লিখিত সেই "গুপ্ত"-নামক কুলপুত্র (মহাসামন্ত?) সম্পর্কে। (একটি পুঁথিতে পুরো নাম "নরেন্দ্রগুপ্ত" পাওয়া গেছে।) ইনি হর্ষবর্ধনদের ঠিক মিত্র ছিলেন না, এঁকে পরাজিত করেছিলেন ভণ্ডি। অন্যদিকে শশাঙ্ক ছিলেন দারুণ শৈব, বাণভট্টও তাই। অনুমান করতে ইচ্ছে হয় যে এই দুটি কারণের জন্যেই বাণভট্ট "শশাঙ্ক" নামটি এড়িয়ে গেছেন। আরও একটি কারণ আছে, "শশাঙ্ক" আসল নাম মনে হয় না, "বিক্রমাদিত্য" ইত্যাদির মতো বিরুদ বোধ হয়।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে চীন দেশ থেকে এসেছিলেন একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক ভারতবর্ষে থেকে বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থ ও মূর্তিচিত্রের প্রতিলিপি সংগ্রহ করতে। এঁর নাম হিউয়েন-সাঙ (Hsuan-Tsang)। ইনি স্বদেশ ত্যাগ করেছিলেন ৬২৯ খ্রীস্টাব্দে, প্রত্যাবর্তন করেছিলেন ৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে। যাওয়া আসা দুইই স্থলপথে। হিউয়েন-সাঙ দুবছর নালন্দায় বাস ক'রে পড়াশোনা করেছিলেন। কামরূপ হয়ে তিনি স্বদেশযাত্রা করেন ৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে। হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মা দুজনেই হিউয়েন-সাঙকে সবিশেষ সমাদর করেছিলেন। হিউয়েন-সাঙ তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে—চীনভাষায় নাম 'সি-য়ু-কী' (Si-Yu-Ki)—এদেশের যে বিবরণ দিয়ে গেছেন তার থেকে বাংলা দেশের সমসাময়িক বৃত্তান্ত কিছু পাওয়া যাচ্ছে। এ বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত তবে উজ্জ্বল এবং যথাসম্ভব খাঁটি। বাংলা দেশে ঢুকেছিলেন তিনি চম্পা (আধুনিক ভাগলপুর অঞ্চল) থেকে গঙ্গাপথ ধ'রে। সে বৃত্তান্তের বিশিষ্ট অংশ এখানে সংক্ষেপ ক'রে বলছি। হিউয়েন-সাঙ কখনো কখনো দেশের প্রধান নগরের বা রাজধানীর নাম ধ'রে দেশের বা

জনপদের নাম করেছেন। যেমন কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি। 'সমতট' দেশের নাম, তবে প্রধান নগরের নামও হতে পারে। হিউয়েন-সাঙের বর্ণনা দিই।

> গঙ্গার ধারে চম্পা নগর। আয়তন চল্লিশ লি[১]। সেখান থেকে পূর্বদিকে চারশ লি দূরে কজঙ্গল (Ki-chu-hoh-khi-lo),[২] আয়তন মণ্ডল আনুমানিক দু হাজার লি। এদেশে উল্লেখ-যোগ্য নগর ছিল না। হর্ষবর্ধন শশাঙ্কর বিরুদ্ধে অভিযানে এসে কিছুদিন শিবির বেঁধে ছিলেন। এদেশে ছয় সাতটি বৌদ্ধ সংঘরাম আছে, তাতে প্রায় তিনশ ভিক্ষু থাকে। দেব-উপাসকদের মন্দিরসংখ্যা দশ এগারো। উপাসকেরা নানামতের।
>
> কজঙ্গল থেকে গঙ্গা পেরিয়ে প্রায় ছ'শ লি দূরে পুণ্ড্রবর্ধন (Fu-na-fa-ton-na), আয়তন-মণ্ডল প্রায় চার হাজার লি। নগরের আয়তন-মণ্ডল তিরিশ লি। ঘন অধ্যুষিত জনপদ, শস্যপূর্ণ। অনেক কাঁঠাল গাছ। দেশের লোক লেখাপড়ার অনুরাগী। এখানে বৌদ্ধ সংঘরামের সংখ্যা প্রায় বিশ, আর সেখানে হীনযান ও মহাযান মতের ভিক্ষু আছে প্রায় তিন হাজার। দেবকুলের সংখ্যা প্রায় শতাবধি। নগ্ন নিগ্রন্থ (দিগম্বর জৈন) সম্প্রদায় সংখ্যায় গরিষ্ঠ। রাজধানীর প্রায় বিশ লি পশ্চিমে এক বিশাল সংঘারাম আছে। সেখানে প্রায় সাতশ মহাযানিক ভিক্ষু বাস করেন। তাঁদের অনেকে পূর্ব-ভারতের অগ্রগণ্য পণ্ডিত। এই সংঘরামের অসতিদূরে অশোক-নির্মিত স্তূপ আছে। তার অনতিদূরে এক বিহার আছে। সে বিহারে অবলোকিতেশ্বরের প্রসিদ্ধ প্রতিমা পূজিত হয়।

[১] এক লি—প্রায় ৬৩৩ গজ। [২] পূর্ব বিহার ও পশ্চিম বাংলার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ জঙ্গলও পার্বত্য দেশ। অনুমান করি এইই পতঞ্জলির উক্ত "কালকবন", আর্যাবর্তের পূর্বসীমা কজঙ্গল <*কজ্জলজঙ্গল।

পুণ্ড্রবর্ধন থেকে ন'শ লি দূরে, বড় নদী[১] পেরিয়ে কামরূপ (Kia-mo-lu-po)। এখানে কাঁঠাল ও নারিকেল প্রচুর ফলে। জলহাওয়া মধুর, নাতিশীতোষ্ণ। এদেশের আয়তন-মণ্ডল প্রায় দশ হাজার লি, রাজধানীর প্রায় তিরিশ লি। এখানকার লোক খর্বকায়, গায়ের রঙ অনুজ্জ্বল পীতবর্ণ। তাদের ভাষা মধ্য-ভারতীয় ভাষা থেকে একটু পৃথক্‌। তাদের স্বভাব খুব চটপটে এবং অদান্ত, স্মরণশক্তি প্রখর, লেখাপড়ায় বিশেষ অনুরক্তি। তারা দেশভক্ত এবং নিষ্ঠাবান্‌ দেবপূজক, বৌদ্ধধর্মে তাদের অনুরাগ নেই।···আজ অবধি এখানে এমন একটিও সংঘারাম নির্মিত হয় নি যেখানে ভিক্ষুরা মিলিত হতে পারেন। এখানে দেবকুলের সংখ্যা শতাবধি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেবপূজার স্থল অসংখ্য। এখানকার রাজবংশ প্রাচীন, নারায়ণদেব থেকে উদ্ভূত, জাতিতে ব্রাহ্মণ। রাজার নাম ভাস্করবর্মা, তাঁর উপাধি "কুমার"। রাজা বিদ্যাপ্রিয়। প্রজারা এবিষয়ে তাঁকে অনুসরণ করে। বিভিন্ন দেশ দেশান্তর থেকে বিদ্বান্‌ লোকেরা তাঁর রাজ্যে অতিথি হয়ে আসে এবং তাঁর নিযুক্তি পেলে কৃতার্থ হয়। বৌদ্ধধর্মে আস্থা না থাকলেও তিনি প্রজ্ঞাবান্‌ শ্রমণদের খুব সম্মান করেন।[২]

কামরূপ থেকে দক্ষিণমুখে বারো তেরো শ লি দূরে সমতট (San-mo-tu cha)। আয়তন-মণ্ডল প্রায় তিন হাজার লি।

[১] অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র। বোঝা যাচ্ছে তখন গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে সুদূর ব্যবধান ছিল।

[২] এখানে হিউয়েন-সাঙ বলেছেন যে ভাস্করবর্মা তাঁকে নালন্দা থেকে আমন্ত্রণ ক'রে আনিয়েছিলেন। রাজার সঙ্গে আলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন হিউয়েন-সাঙ। রাজার খুব ইচ্ছা ছিল চীন দেশ দেখবার। এইখান থেকেই (৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে) ভাস্করবর্মার সঙ্গে হিউয়েন-সাঙ হর্ষবর্ধনের সঙ্গে দেখা করতে কজঙ্গলে গিয়েছিলেন। পরে কামরূপ হ'য়ে হিউয়েন-সাঙ স্থলপথে দেশে ফিরে যান।

রাজধানীর পরিমণ্ডল বিশ লি। বড় সমুদ্রের ধারে। ভূভাগ নিম্ন এবং উর্বর। জলহাওয়া মধুর। জনগণের আচরণ ভদ্র। অধিবাসীরা খর্বকায়, স্বভাবক্রমে পরিশ্রমী, গায়ের রঙ কালো। জ্ঞানের অনুশীলনে তাদের আগ্রহ আছে এবং সে কাজে তারা পরিশ্রমে কাতর নয়। সত্য (অর্থাৎ বৌদ্ধ) এবং অসত্য (অর্থাৎ বৌদ্ধেতর) মতের পণ্ডিতাচার্য যথেষ্ট আছেন। এখানে সংঘারামের সংখ্যা প্রায় তিরিশ, ভিক্ষুসংখ্যা প্রায় ছহাজার। ভিক্ষুরা সবাই থেরবাদী অর্থাৎ হীনযানিক। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেবকুল আছে প্রায় শ খানেক। সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি হ'ল নগ্ন নিগ্রন্থেরা (অর্থাৎ দিগম্বর জৈন ক্ষপণক)। নগরের অনতিদূরে অশোকের নির্মিত স্তূপ আছে।

সমতট থেকে পশ্চিমে প্রায় ন' শ লি দূরে তাম্রলিপ্তি (Tan-mo-li-ti)। দেশের আয়তন-মণ্ডল প্রায় পনেরো বা ষোল হাজার লি, রাজধানীর প্রায় দশ লি। প্রান্তে সমুদ্র। ভূভাগ নীচু এবং উর্বর। চাষবাস সর্বত্র। জলবায়ু উষ্ণ। লোকের স্বভাব চটপটে ও হঠকারী। পুরুষেরা পরিশ্রমী ও সাহসী। লোকের মধ্যে আস্তিক (অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী) এবং নাস্তিক (অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মে অবিশ্বাসী) ছুইই আছে। সংঘারাম আছে প্রায় দশটি, তাতে ভিক্ষু থাকেন প্রায় হাজার। দেবকুলের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ, তাতে নানা সম্প্রদায়ের (ধর্মযাজীরা) থাকেন। নগরের নিকটে একটি স্তূপ আছে অশোকের নির্মিত। প্রদেশের পূর্বসীমা টেনেছে সমুদ্রের খাড়ি ; জল ও স্থল যেন পরস্পর আলিঙ্গন করে আছে। এদেশে মূল্যবান্ দ্রব্য ও ধনরত্নাদির প্রচুর ভাণ্ডার আছে, সেই কারণে এদেশের মানুষ সাধারণত বেশ সম্পন্ন।

তাম্রলিপ্তি থেকে উত্তরপশ্চিমে প্রায় সাত শ লি দূরে কর্ণসুবর্ণ (K'e-lo-na su fa la-na), আয়তন চোদ্দ পনেরো

হাজার লি। রাজধানীর আয়তন বিশ লি। এদেশ জনবহুল। গৃহস্থরা সৌভাগ্য-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী। ভূভাগ নিম্ন, মাটি দোঁআশ। রীতিমত চাষবাস চলে। জলবায়ু মনোরম। অধিবাসীদের ব্যবহার সাধু, আচরণ ভদ্র। লেখাপড়ায় তাদের অনুরাগ ও অধ্যবসায় প্রগাঢ়। লোকেরা কতক বৌদ্ধমতাবলম্বী, কতক নয়। সংঘারামের সংখ্যা প্রায় দশ, ভিক্ষুর সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। তাঁরা হীনযানের সম্মতীয় শাখা অধ্যয়ন করেন। দেবকুলের সংখ্যা পঞ্চাশ। অ-বৌদ্ধ মতের লোকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আরও তিনটি সংঘারাম আছে, সেখানে ভিক্ষুরা দেবদত্তর আদেশ অনুসারে ক্ষীরভোজন করেন না। রাজধানীর পাশেই রত্তবিট্টি (<রক্তভিত্তিকা, প্রাকৃতে রত্তভিট্টিঅ)[১] নামক সংঘারাম আছে। তার ঘরগুলি আলোকিত ও বিশাল, বিমান-সৌধগুলি খুব উচ্চ। এই সংঘারামে দেশের সব গুণী জ্ঞানী সমবেত হয়ে পরস্পরের বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষ দেখিয়ে আত্মোন্নতি বিধান করেন। সংঘারামের অনতিদূরে একটি স্তূপ আছে। সেটি অশোকের নির্মিত।

কর্ণসুবর্ণ থেকে প্রায় সাত শ লি দূরে ওড্র (U-cha)। এই দেশের আয়তন-মণ্ডল আনুমানিক সাত হাজার লি, রাজধানীর প্রায় বিশ লি। ভূমি উর্বর ও শস্যসমৃদ্ধ, ফুলে ফলে অন্য সব দেশের সেরা। জলবায়ু উষ্ণ। জনগণ বর্বর। তারা আকারে দীর্ঘ, গায়ের রঙ হলদে-কালো। তাদের ভাষা ও উচ্চারণরীতি মধ্যভারত থেকে ভিন্ন রকমের। লেখাপড়ায় অনুরাগ ও শিক্ষায় আগ্রহ আছে। অধিকাংশ লোক বৌদ্ধমতে বিশ্বাসী। প্রায় শতাবধি সংঘারাম আছে, ভিক্ষুসংখ্যা দশ হাজারের মতো। সকলেই মহাযান-মতাবলম্বী। দেবকুলের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ,

[১] শব্দটি 'রত্তমিট্টি'র রূপান্তর হওয়াও সম্ভব। পরবর্তী কালে এস্থান রাঙামাটি নাম পেয়েছে। সম্প্রতি এস্থান খনন করে সংঘারামের সন্ধান মিলেছে।

তাতে সব সম্প্রদায়ের মতাবলম্বীরা থাকে। এদেশে প্রায় দশ বারোটা স্তূপ, সবই আশোকের স্থাপিত।...

হিউয়েন-সাঙের বর্ণনায় বাংলা দেশের সংক্ষিপ্ত অথচ উজ্জ্বল রেখাচিত্র ফুটে উঠেছে। এর থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, সপ্তম শতাব্দীর মাঝের দিকে তখন বাংলা দেশ কয়েকটি দেশ বা রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত ছিল—কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি, কর্ণ-সুবর্ণ এবং ওড্র। শেষোক্ত দেশখণ্ডটি হয়ত পুরাপুরি বঙ্গভূমির অন্তর্গত ছিল না এবং এদেশের অধিকাংশ অধিবাসী হয়ত আর্যভাষী ছিল না। তাছাড়া হিউয়েন-সাঙ কামরূপেরও বর্ণনা দিয়েছেন। এ দেশ তাঁর কাছে বাংলা দেশের অন্যান্য খণ্ড থেকে ধর্মে ও ভাষায় স্বতন্ত্র ছিল না, তবে স্বতন্ত্র রাজার অধীনে ছিল। কামরূপের রাজা কুমার ভাস্করবর্মা হর্ষবর্ধনের সহযোগী হয়ে বাংলা দেশে অভিযান চালিয়েছিলেন। হিউয়েন-সাঙকে তিনি সমাদর ক'রে নিজের দেশে আনিয়েছিলেন। সে কথা পরে বলছি।

কজঙ্গল দেশ বলতে এখনকার দিনের বর্ধমান জেলার উত্তর পশ্চিমাংশ, বীরভূম জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরাংশ এবং অধুনাতন বিহারের অন্তর্গত সাঁওতাল পরগনার সন্নিহিত অংশ পড়ে। হিউয়েন-সাঙ বলেছেন যে দেশের প্রাচীন রাজবংশ লোপ পাওয়ায় এ দেশ পার্শ্ববর্তী রাজ্যের অধীন হয়েছে, এবং সে কারণে এ দেশে শহর বলতে কিছু নেই, যা আছে তা গ্রাম—দূর দূরান্তরে অবস্থিত। মনে হয় কজঙ্গল রাজ্য গৌড়রাজই অভিযান ক'রে পুণ্ড্রবর্ধনের অথবা কর্ণসুবর্ণের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। হর্ষবর্ধন—যাঁকে হিউয়েন-সাঙ শিলাদিত্য বলেই বরাবর উল্লেখ করেছেন—গৌড়রাজের বিরুদ্ধে অভিযানে এসে কিছুকাল কজঙ্গলে কাটিয়েছিলেন। এখানে তিনি অস্থায়ী প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি চলে গেলে পর সে প্রাসাদ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কজঙ্গলের দক্ষিণভাগে অরণ্য, তাতে প্রচুর বুনো হাতি ছিল। (এই অরণ্যের প্রান্তভাগে অধুনালুপ্ত দুর্গাপুরের জঙ্গল।)

পুণ্ড্রবর্ধন থেকে কামরূপ পৌঁছতে হ'লে বড় নদী পার হ'তে হয়, হিউয়েন-সাঙ বলেছেন। এ বড় নদী অবশ্যই ব্রহ্মপুত্র, এবং বুঝতে হবে যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে তখন বেশ ব্যবধান ছিল। কামরূপে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একাধিপত্য ছিল। রাজারা বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিল ব'লে এদেশে বুদ্ধের ধর্ম গুপ্তভাবে মানা হ'ত। হিউয়েন-সাঙ লিখেছেন দেশ-দেশান্তর থেকে বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কামরূপে এসে বাস করতে চাইতেন। একথার দৃঢ় সমর্থন রয়েছে ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রশাসন-পট্টে। ভাস্করবর্মার রাজত্ব বহুপুরুষের। তাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন, হিউয়েন-সাঙ বলেছেন। ভাস্করবর্মা বহু বহু ব্রাহ্মণকে ভূমিদান ক'রে উপনিবিষ্ট করেছিলেন। হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর মিত্রতার এই একটা ফল, যা গৌড়-বঙ্গ-কামরূপের সংস্কৃতিকে অন্য পথে পরিচালিত করেছিল। এর আগেও পশ্চিম থেকে "বেদজ্ঞ" ব্রাহ্মণ যে আসেন নি তা নয় কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য ছিলেন। শশাঙ্কর (?)—তথা ব্রাহ্মণ্যবিদ্বেষী হর্ষবর্ধনের চাপে কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণেরা ভাস্করবর্মার উপর ভর ক'রে দলে দলে এদেশে চলে এলেন এবং শুধু এসেই ক্ষান্ত হন নি, ভবিষ্যৎ কয়েক শত বৎসরের মতো সে পথ খোলা রাখলেন। এই ব্রাহ্মণদের প্রভাবে বাংলা দেশের সমাজব্যবস্থায় বড় একটা বিপর্যয় এসেছিল। পূর্বতন জাতিভেদজ্ঞানমুক্ত সমভূমিতে জাতিগত উচ্চনীচতা পরিস্ফুট হ'তে লাগল। আগে ব্রাহ্মণেরা অর্থবলে বলীয়ান্ ছিলেন না, এখন তাঁরা ধীরে ধীরে ধনীও মানী শ্রেণীতে পরিণত হবার পথে দাঁড়ালেন। তবে তা সঙ্গে সঙ্গে ঘটে নি। বৌদ্ধধর্ম প্রবল থাকায় ব্রাহ্মণপ্রমুখ জাতিভেদ অনেকদিনই মাথা তুলতে পারে নি। তারপর যখন পাল-রাজত্বের মাঝামাঝি রাষ্ট্রশাসন-ক্ষমতা বংশক্রমে ব্রাহ্মণ রাজমন্ত্রীর কুক্ষিগত হ'য়ে পড়ল তখন থেকে বাংলা দেশের সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণের প্রাধান্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হতে থাকে। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে একথার প্রমাণ মিলবে।

হিউয়েন-সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় যে তাঁর সময়ে কামরূপ

ছাড়া সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা ছিল। সর্বাধিক প্রচলিত ছিল উড্ড দেশে, তারপর কজঙ্গলে, তারপর সমতটে, তারপর পুণ্ড্রবর্ধনে এবং তারপর কর্ণসুবর্ণে ও তাম্রলিপ্তিতে। কামরূপে একেবারেই ছিল না। এই অনুমান করা যায় হিউয়েন-সাঙ প্রদত্ত বৌদ্ধ মঠের (বিহার-সংঘারাম) এবং অপর মঠের (ব্রাহ্মণ্য দেবকুল ও জৈন বিহার) অনুপাত দেখে। বৌদ্ধ মঠের ও অপর মঠের সংখ্যা অঞ্চল অনুসারে এইরকম,

ওড্র ১০০ঃ ৫০; কজঙ্গল ৬(৭)ঃ ১০; সমতট ৩০ঃ ১০০; পুণ্ড্রবর্ধন ২০ঃ ১০০; কর্ণসুবর্ণ ১০ঃ৫০; তাম্রলিপ্তি ১০[১]ঃ ৫০।

ওড্র দেশে মহাযান মতই প্রবল ছিল। সমতটে হীনযান (স্থবির-পন্থী) মতের সমাদর ছিল। পুণ্ড্রবর্ধনে সমাদর ছিল মহাযান মতের। কর্ণসুবর্ণেও তাই। উপরন্তু কর্ণসুবর্ণে দেবদত্তীয় মতের মঠও ছিল। হিউয়েন-সাঙ বলেছেন যে এই মতাবলম্বী ভিক্ষুরা ঘন দুধ (অর্থাৎ ক্ষীর এবং দই) খেতেন না।

অ-বৌদ্ধ মতগুলির মধ্যে পড়ে ব্রাহ্মণ্য মত ও জৈন (নিগ্রন্থ) মত। পুণ্ড্রবর্ধনে দিগম্বর জৈন ধর্মের বিশেষ প্রবলতা লক্ষ্য করেছিলেন হিউয়েন-সাঙ। কামরূপের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে এখানে দেবমন্দিরে বলি দেওয়া হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে তখন শক্তিপূজা কামরূপে ভালোভাবেই প্রচলিত ছিল। অন্যত্র কোথাও বলিদানের উল্লেখ নেই। সুতরাং ধরতে পারি সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগেও বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান জনপদগুলিতে শক্তিপূজার আড়ম্বর লক্ষিত হ'ত না।

কজঙ্গল এবং কামরূপ ছাড়া সর্বত্রই হিউয়েন-সাঙ বৌদ্ধ চৈত্য (স্তূপ) লক্ষ্য করেছেন এবং তিনি বলেছেন স্তূপগুলি অশোকের নির্মিত। সবচেয়ে বেশি স্তূপ দেখেছিলেন ওড্রে।

সে সময়ে বাংলা দেশে সর্বাধিক বিখ্যাত বিহার-সংঘারাম ছিল কর্ণ-

[১] প্রায় আড়াই শ বছর আগে ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তি দেশে চব্বিশটি বিহার-সংঘারাম দেখেছিলেন।

সুবর্ণের পাশে রক্তমৃত্তিকায়। হিউয়েন-সাঙের বানানে এই স্থানের নাম Lo-lo-wei-chi অর্থাৎ রত্তবিট্টি (বা রত্তমিট্টি)।[১] এই বিহার ছিল বিরাট এবং উচ্চ। নানা দিক থেকে এখানে বৌদ্ধ অ-বৌদ্ধ বিদ্যার্থীরা আসতেন। ফা-হিয়েনের সময়ে এদেশে বৌদ্ধবিদ্যার পীঠস্থান ছিল তাম্র-লিপ্তি। তাম্রলিপ্তিতে জ্ঞানচর্চার কোন উল্লেখই করেন নি হিউয়েন-সাঙ। এমনও হতে পারে, ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তি বলতে কর্ণসুবর্ণকেও ধ'রে থাকতে পারেন। তিনি কর্ণসুবর্ণের উল্লেখ করেন নি। আবার এমনও হতে পারে যে নৈসর্গিক অথবা অন্যকারণে ইতিমধ্যে তাম্রলিপ্তির বড় বৌদ্ধ বিহার বিধ্বস্ত হ'য়ে গিয়েছিল। পরবর্তী কালে উল্লিখিত "পাণ্ডুভূমি" —উত্তররাঢ়ের লালমাটি বৈপরীত্যে দক্ষিণরাঢ়ের সাদামাটি ?—বিহার ফা-হিয়েন উল্লিখিত তাম্রলিপ্তি বিহারের অবশেষ হ'তে পারে।

হিউয়েন-সাঙের পর্যবেক্ষণে বাংলা দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে বিদ্বানের আদর ছিল এবং বিদ্যাচর্চায় লোকের আগ্রহ ছিল। তবে তাম্রলিপ্তির সম্বন্ধে তিনি নীরব। মনে হয় হিউয়েন-সাঙের সময়ে বিদ্যা-চর্চায় সব চেয়ে অগ্রসর ছিল কর্ণসুবর্ণ ও সমতট। সমতটের প্রাচীন রাজবংশের সন্তান শীলভদ্র নালন্দায়[২] প্রধান পণ্ডিত হ'য়েছিলেন। এঁরই কাছে হিউয়েন-সাঙ পড়েছিলেন। শিল্পচর্চায় আগ্রহ লক্ষ্য করেছেন তিনি কজঙ্গলে।

হিউয়েন-সাঙের বর্ণনায় বাংলা দেশে ভগ্ন স্থাপত্যকীর্তির উল্লেখ পাওয়া যায় কজঙ্গলে। পুণ্ড্রবর্ধনে ও কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধ বিহার-সংঘারাম সৌধের সুখ্যাতি আছে। পুণ্ড্রবর্ধনের এক বিহারে প্রতিষ্ঠিত অবলোকিতেশ্বর মূর্তির প্রশংসা আছে। এখানে দূর-দূরান্তর থেকে লোকে আসত পূজা প্রার্থনা ও উপবাস করতে। সমতটের রাজধানীর নিকটস্থ এক সংঘারামে প্রতিষ্ঠিত এক বিরাট বুদ্ধমূর্তি দেখেছিলেন হিউয়েন-সাঙ। মূর্তিটি আট ফুট উঁচু, জেড পাথরে তৈরি,

[১] আগে পৃ ৮১ দ্রষ্টব্য।

[২] তখন দক্ষিণ বিহারে নালন্দা পূর্বভারতে সর্বপ্রধান বিদ্যাকেন্দ্র ছিল

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিখুঁতভাবে অভিব্যক্ত। মাঝে মাঝে এই দেবস্থানে দৈবী শক্তির আবির্ভাব দেখা যায়, একথাও তিনি বলেছেন।

সমসাময়িক (অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে) বাংলা দেশের স্থাপত্যকীর্তি সম্বন্ধে হিউয়েন-সাঙ আর বিশেষ কিছু বলেন নি। একটি মাত্র ব্যতিক্রম আছে। তিনি কজঙ্গলের মধ্যে এমন একটি অভগ্ন সৌধের বর্ণনা দিয়েছেন যা বৌদ্ধ বা অ-বৌদ্ধ বিহার-দেবকুল নয়, তবে তার অংশ হতে পারে। হিউয়েন-সাঙ লিখেছেন, "কজঙ্গলের উত্তর সীমান্তে গঙ্গানদীর অবিদূরে এক বৃহৎ ও তুঙ্গ সৌধ (tower) আছে। ইট ও পাথরে গড়া। ভিত খুব চওড়া ও উঁচু। সৌধের চার পাশ স্থাপত্যমূর্তিতে আকীর্ণ। সৌধের গায়ে দেওয়ালে কুলুঙ্গি ক'রে মুনি-ঋষি বুদ্ধ-বোধিসত্ত্ব ইত্যাদির মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।"

হিউয়েন-সাঙের বর্ণনা থেকে জানা যায়, দেশের সর্বত্র ভালো ক'রে চাষবাস হ'ত। কৃষিকার্যে সব চেয়ে সমৃদ্ধ এবং সে কারণে সবচেয়ে জনবহুল ছিল পুণ্ড্রবর্ধন এবং কর্ণসুবর্ণ। পুণ্ড্রবর্ধনে খুব কাঁঠাল হ'ত এবং কামরূপে ফলত কাঁঠাল ও নারকেল। পুণ্ড্রবর্ধনে পথঘাট ও উদ্যান-বনের সুসন্নিবেশ ছিল।[১] দেশের কৃষিসমৃদ্ধি ও রম্যতার জন্যই বোধ হয় অচিরপরবর্তী কালে এই-অঞ্চল শিষ্টদের কাছে বরেন্দ্রভূমি বা বরেন্দ্রী নাম পেয়েছিল।

হিউয়েন-সাঙ বলেছেন যে তাম্রলিপ্তি খুব সমৃদ্ধ অঞ্চল এবং এখানে বহু ধনরত্নাদি সঞ্চিত আছে। তার মানে বোধ হয় বাংলা দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য তখন পর্যন্ত তাম্রলিপ্তির একচেটে ছিল।

হিউয়েন-সাঙের চলে যাবার বছর তিরিশের মধ্যে এমন আর একজন

[১] হিউয়েন-সাঙের উক্তির ইংরেজী অনুবাদ এই, "The tanks and public offices and flowering woods are regularly connected at intervals." (S. Beal.)

চীনদেশ থেকে বৌদ্ধ শিক্ষার্থী এসেছিলেন যিনি তাঁর ভ্রমণ-লব্ধ অভিজ্ঞতা সুমাত্রায় থেকে রিপোর্ট করে পাঠিয়েছিলেন স্বদেশে।[১] এঁর নাম ই-সিঙ (I-Tsing)। ইনি এসেছিলেন এদেশের এবং দ্বীপময় ভারতের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচার-অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ ক'রে এসে চীনদেশী বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানের বিচার করতে। ইনি বাংলা দেশ ও মগধের বাইরে যান নি। স্বদেশ থেকে ৬৭১ খ্রীস্টাব্দে যাত্রা ক'রে জলপথে ইনি তাম্রলিপ্তিতে উত্তরণ করেন ৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে। এখানে মাস কতক থেকে ই-সিঙ মগধে যান এবং সেখানে রাজগৃহ বজ্রাসন বৈশালী মৃগদাব ইত্যাদি বৌদ্ধতীর্থ স্থানগুলি ভ্রমণ ক'রে নালন্দায় শিক্ষার্থী রূপে থাকেন চার বছর। তাম্রলিপ্তিতে তিনি হিউয়েন-সাঙের ছাত্র তা-চেঙ-তেঙের সঙ্গে পরিচিত হন। তা-চেঙ-তেঙ এদেশে তখন বারো বছর কাটিয়েছেন। তা-চেঙ-তেঙ তাঁকে সংস্কৃত শিখিয়েছিলেন এবং নালন্দায় এনেছিলেন। নালন্দায় দশ বছর কাটিয়ে ই-সিঙ বহু পুথিপত্র নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে তাম্রলিপ্তিতে আসেন। তখনও তা-চেঙ-তেঙ সঙ্গে ছিলেন (৬৮৫)। তাম্রলিপ্তি থেকে তিনি জলপথে দ্বীপময় ভারতের দিকে যাত্রা করেন। স্বদেশে ফিরেছিলেন ৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে।

ই-সিঙ এসেছিলেন বৌদ্ধসঙ্ঘে আচরিত বিনয়-শাস্ত্রের পরিচয় নিতে এবং সেই শাস্ত্রের পুথি সংগ্রহ করতে। সুতরাং সাধারণ অর্থে ইনি পর্যটক ছিলেন না, তাই এঁর গ্রন্থে পর্যটকসুলভ পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্যের অবকাশ ছিল না। তবুও মাঝে মাঝে ছোট-খাট এমন কথা আছে যা অন্যত্র মিলে না অথবা পূর্বতন বর্ণনার সমর্থন জোগায়। তাম্রলিপ্তি প্রদেশ সমৃদ্ধিমান্, একথা ই-সিঙও বলেছেন। তিনি এখানে পাঁচ ছটি মাত্র সংঘারাম দেখেছিলেন, হিউয়েন-সাঙ দেখেছিলেন প্রায় দশটি।

[১] এই রিপোর্টই ই-সিঙের বই, 'Nan-hai-chi-kuei-nai-fa-ch'uan', তাকাকুসু (J. Takakusu) কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত (১৮৯৬), 'A Record of the Buddhist Religion as practised in India and Malay Archipelago' নামে।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে বছর তিরিশের মধ্যে এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বেশ ক'মে এসেছিল। ই-সিঙ তাম্রলিপ্তিতে এসেই এদেশের একটি সামাজিক আচার শিখে নিয়েছিলেন। এদেশের চিরাচরিত রীতি হল ভোজের আয়োজনসম্ভার সম্ভাব্য অতিথি-সংখ্যার প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত করা। ই-সিঙ লিখেছেন, "যখন আমি প্রথম তাম্রলিপ্তিতে আসি তখন এক পুণ্যদিনে আমি কিছু ভিক্ষুকে ছোট-খাট রকমের ভোজ দিতে ইচ্ছা করেছিলুম। কিন্তু লোকে আমাকে বাধা দিলে, বললে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ঠিক উপযুক্ত পরিমাণে ভোজের আয়েজন করা কিছু কঠিন ব্যাপার নয়, তবে এদেশের চিরকালের নিয়ম অনুসারে অনেক বেশি আয়োজন করতে হয়। আমি তাঁদের কথামত করেছিলুম।"

তাম্রলিপ্তির বৌদ্ধমঠে ই-সিঙ যে সব বিশেষ আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করেছিলেন তার মধ্যে এদেশের জীবনযাত্রার কিছু কিছু খণ্ড চিত্র রয়েছে। বিহার-মঠের কৃষিক্ষেত্র থাকলে তা যদি মঠের কর্মকরদের দিয়ে চষানো হ'ত তাহলে কর্মকরেরাও ফসলের অংশ পেত। মঠে বলদ পোযা হত। তবে ভিক্ষুরা নিজে কৃষির কোন কাজ করতেন না। কর্মকর চাষীরা সেই বলদ নিয়ে চাষ করত। মঠের জমিতে তরিতরকারি উৎপন্ন হ'লে প্রজা চাষীরা তার বেশি ভাগটা পেত। ই-সিঙ লিখেছেন,

> যখম আমি প্রথম তাম্রলিপ্তিতে এসেছিলুম তখন দেখেছিলুম যে মঠের বাইরে এক চত্বরে মঠের কিছু প্রজা এসে তাদের আনা তরিতরকারী তিন ভাগ ক'রে সাজালে। এক ভাগ তারা ভিক্ষুদের দিলে, বাকি তুভাগ তারা নিয়ে গেল।

ভিক্ষুণীদেরও মঠ ছিল। তারা ভিক্ষুদের মঠে যেতে চাইলে আগে থেকে অনুমতি নিতে হ'ত এবং যাবার আগে খবর দিতে হ'ত। মঠে নবাগত ভিক্ষুকে পাঁচদিন উৎকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া হ'ত, তার পরে তিনি মঠের সাধারণ ভিক্ষুর মতো ব্যবহার পেতেন। (এইখানে আধুনিক বাউলদের ব্যবহারের সঙ্গে মিল পাই। কোন আখড়ায় অতিথি বাউল

এলে তাকে তিন দিন খাওয়ানো হয়। তারপর তাঁকে বাসিন্দা বাউলের মতো ভিক্ষা করতে হয়।)

এইসব রীতি ই-সিঙ লক্ষ্য করেছিলেন তাম্রলিপ্তির ভ-র-হ মঠে। পূর্বভারতে শিশু-শিক্ষার ব্যবস্থারও উল্লেখ করেছেন ই-সিঙ। ছ বছর বয়স হ'লে তার বর্ণপরিচয় ও প্রথমপাঠ শুরু হ'ত। তখনকার দিনের শিশুশিক্ষা গ্রন্থটির নাম ছিল 'সিদ্ধিরস্তু', সমসাময়িক ভাষায় 'সিদ্ধিরথু'।[১] ("সিদ্ধির্ অস্তু" বলে বইটির আরম্ভ তাই এই নাম।) ছ মাসে সিদ্ধিরথু শেষ করতে হ'ত। আট বছর বয়স হলে ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করতে হ'ত। সাধারণত আটমাসের মধ্যেই ব্যাকরণ-সূত্র শিশুর কণ্ঠস্থ হয়ে যেত। তারপরে পাঠ্য ছিল শব্দবিদ্যার খুঁটিনাটি—শব্দরূপ ধাতুরূপ সুবন্ত-তিঙন্ত প্রত্যয় ইত্যাদি। আট-দশ বছরে আরম্ভ করে তের বছর বয়সের মধ্যেই বালকের ব্যাকরণবোধ সম্পূর্ণ হ'ত। তারপরে নিতে হ'ত শব্দবিদ্যায় উচ্চতর বা শেষ পাঠ—কাশিকা বৃত্তি, চূর্ণি (মহাভাষ্য), ভর্তৃহরির বাক্যপদীয় ইত্যাদি। লেখাপড়ার পথ ধরতে হ'লে কি ভিক্ষু কি গৃহস্থ সকলকেই এই পাঠক্রম অনুসরণ করতে হ'ত, তারপর নিজের নিজের বিশেষ বিদ্যার চর্চা করত।

পূর্বভারতের দুজন সমসাময়িক বড় পণ্ডিতের নাম করেছেন ই-সিঙ। একজন হলেন চন্দ্রগোমী। ই-সিঙ বলেছেন তিনি যখন এদেশে ছিলেন তখনও চন্দ্রগোমী বেঁচে ছিলেন। বোধিসত্ত্বকল্প চন্দ্রগোমী, যাঁকে ই-সিঙ বারবার মহাসত্ত্ব বলেছেন, তিনি বিশ্বান্তর জাতকের আখ্যান নিয়ে একটি কবিতা-গান রচনা করেছিলেন। তা শুধু পূর্ব ভারতেই নয় ভারতবর্ষের অন্যত্রও গীত হ'ত। চন্দ্রগোমী পাণিনিকে

[১] সরহের দোহায় 'সিদ্ধিরথু' নিবন্ধের উল্লেখ আছে,

সিদ্ধিরথু মই পঢমে পঢিঅউ
মণ্ড পিবন্তে বিসরিউ এমউ।

'আমি প্রথমে পড়েছিলুম সিদ্ধিরথু। (তারপর) মাড় খেতে খেতে এমনিই ভুলে গেছি।'

অবলম্বন করে ব্যাকরণ লিখেছিলেন, সে ব্যাকরণের চলন বাংলা দেশে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। (চান্দ্রব্যাকরণ-প্রণেতা ইনিই কিনা সন্দেহ আছে।) বাংলা দেশে (পূর্বভারতে) প্রথম নাম-জানা কবি ব'লে খ্যাতি চন্দ্রগোমীরই প্রাপ্য। সদুক্তিকর্ণামৃতে (১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ) সঙ্কলিত এই কবিতাটি চন্দ্রগোমীর রচনা ব'লে মনে করি। পুথিতে কবির নাম আছে চন্দ্রযোগী। কবিতাটির ভাব ই-সিঙ প্রশংসিত চন্দ্রগোমীরই উপযুক্ত।

শার্দূলী স্নেহগর্ভং মুকুলিতনয়নং লেঢ়ি শাবং হরিণ্যা
বন্ধুপ্রীত্যা শিখণ্ডী তিরয়তি ফণিনামাতপং কীর্ণবর্হঃ।
সিংহী রক্ষত্যপত্যং স্বমিব কলভকং নির্গতায়াং করিণ্যাং
মৈত্র্যা যেষাং নিবাসো গহনগিরিদরীশায়িনস্তে জয়ন্তি॥

'ব্যাঘ্রী স্নেহভরে চোখ মুদে হরিণীর শাবকের গা চাটে; বন্ধুপ্রীতিভরে ময়ূর পেখম ছড়িয়ে সাপকে ছায়া দেয়; হস্তিনী চ'লে গেলে সিংহী নিজের শাবকের মতো হস্তিপোতকে রক্ষা করে।—(এইরকম) মৈত্রীতে যাদের নিবাস সেই গহনবন ও পর্বতকন্দর-বাসীরাই ধন্য।'

ই-সিঙ উল্লিখিত দ্বিতীয় সমসাময়িক বড় পণ্ডিত (বৌদ্ধ) দিবাকর-মিত্র। দিবাকরমিত্রের ব্যক্তিত্বের জ্বলন্ত বর্ণনা দিয়ে গেছেন বাণ তাঁর হর্ষচরিতে। ভগিনী রাজ্যশ্রীর খোঁজে বেরিয়ে হর্ষবর্ধন পূর্বভারতের অটবীপ্রদেশে প্রবেশ করেছেন। সেখানে সন্ধান পেয়ে তিনি উপস্থিত হলেন এক প্রভাতে দিবাকরমিত্রের মঠে। দেখলেন, তিনি বসে আছেন একান্তে এক আসনে। পরিধান তাঁর অরুণ কাষায়, দেখাচ্ছে যেন পূর্বাকাশে অরুণের মতো। তাঁর পা চাটছে বনহরিণ। তাঁর বাম করতলে নীবার ধান্য, তা খুঁটে খাচ্ছে পারাবত-পোত। ডান হাতে তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন শ্যামা ধানের খুদ পিঁপড়েদের জন্যে। তাঁর অধোমুখ স্নিগ্ধধবল প্রসন্ন নেত্র যেন জনপদদলিত ক্ষুদ্র জন্তুদের জীবনের জন্য অমৃত বর্ষণ করছে। তিনি যেন "পরম-সৌগত" হ'য়েও

"অবলোকিতেশ্বর"।[১] মাঝবয়সী দিবাকরমিত্রকে এইভাবে দেখে *হর্ষবর্ধন শ্রদ্ধাভরে দূর থেকেই তাঁকে মাথায় মনে ও বাক্যে বন্দনা* করলেন। দিবাকরমিত্রও খুব খাতির ক'রে "এখানে আসুন" বলে নিজের কাছে ডাকলেন। পার্শ্বস্থিত শিষ্যকে বললেন, "আয়ুষ্মন্, কমণ্ডলু ভ'রে পাদ্য উদক নিয়ে এস।" "এই বসছি", ব'লে রাজা সেইখানেই মাটিতে বসলেন।

এদেশে লোকে ধর্মার্থে নানাভাবে কায়োৎসর্গ ক'রত। তার এই বর্ণনা দিয়েছেন ই-সিঙ,

> গঙ্গা নদীতে প্রত্যহ অনেক লোক ডুব দিয়ে দেহত্যাগ করে। গয়ার পর্বতেও প্রায়ই ভৃগুপাত করে। কেউ কেউ আবার অন্নজল ত্যাগ ক'রে অনশনে আত্মহত্যা করে। কেউ বা আবার গাছে উঠে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে মরে।

ই-সিঙ বলেছেন, এদেশের লোক সর্ষে শাক খেতে ভালোবাসে এবং পেঁয়াজ এবং কাঁচা সবজি খায়ই না।

আগেকার ত্রিপুরা জেলার কোন অজ্ঞাত স্থান থেকে একটি তাম্রপট্ট পাওয়া গিয়েছিল। সে তাম্রপট্টটি এক মহাসামন্ত লোকনাথের প্রদত্ত ভূমিদান পত্র। লিপি থেকে অনুমান হয় সপ্তম শতাব্দীর। লোকনাথের কিছু বংশপরিচয় দেওয়া আছে। কিন্তু তাম্রপট্টটি ক্ষতিগ্রস্ত ব'লে সব পাঠ উদ্ধার করতে পারা যায় নি। তাম্রপট্টে মুদ্রা সংলগ্ন আছে। মুদ্রায় দণ্ডায়মান গজলক্ষ্মীর মূর্তি, তলায় প্রাচীনতর অক্ষরে লিপি "কুমারামাত্যাধিকরণস্য", একপাশে গোল গর্ত করে আছে উপবিষ্ট বৃষের মূর্তি, তার নীচে অর্বাচীনতর অক্ষরে লিপি "লোকনাথস্য"। মুদ্রা থেকে সহজেই অনুমান হয় যে ইনি (বা এঁর বংশকর্তা) কোন রাজার সামন্ত ছিলেন এবং স্বাধীন হয়ে "কুমারামাত্য" পদিকের মুদ্রায় নিজের ছাপ লাগিয়ে ব্যবহার করেছিলেন। এঁর পূর্বপুরুষ যে সামন্ত ছিলেন তা তাম্রপট্ট থেকেই বোঝা যায়।

[১] অর্থাৎ একাধারে বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্ব।

এঁরা শৈব ছিলেন ব'লে বোধ হয়। মুদ্রায় বৃষের মূর্তি (শশাঙ্কর মুদ্রায় যেমন) তাই নির্দেশ করে।[১] লোকনাথের মাতৃবংশ ব্রাহ্মণ ছিল। কিন্তু তাঁর মাতামহ কেশব "পারশব"[২] বলে উল্লিখিত। তাম্রপট্টের মধ্যেও লোকনাথ "করণ" বলে উল্লিখিত হয়েছেন।

তাম্রপট্টের মর্ম হ'ল—মহাসামন্ত প্রদোষশর্মা রাজাকে জানিয়েছেন যে তিনি সুব্বুঙ্গ বিষয়ে "মৃগমহিষবরাহব্যাঘ্রসরিসৃপাদিভির্যথেচ্ছ অনুভূয়মান" আরণ্য অঞ্চলে দেবকুলে অনন্তনারায়ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চান (অথবা করেছেন)। সেই দেবতার দৈনিক পূজা ("অষ্ট-পুষ্পিকা") ও বলি চরু এবং সত্র চালাবার জন্যে এবং মঠে চাতুর্বিদ্য ব্রাহ্মণ আর্যদের পোষণের জন্যে ভূমিদান ক'রতে চান, তার জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছেন "দূতক" রাজপুত্র লক্ষ্মীনাথের মারফৎ। লোকনাথ সেই প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রে, এই তাম্রপট্ট দিলেন।

আধুনিক বাংলাদেশের (প্রাকৃতর পূর্বপাকিস্তানের, প্রাক্তন বাংলা দেশের) শ্রীহট্ট জেলার মৌলবীবাজার মহকুমার শ্রীমঙ্গল থানার অন্তর্গত কালাপুর গ্রামে ১৯৬৩ সালের মে মাসে একটি যে তাম্রপট্ট আবিষ্কৃত হয়েছে[৩] তা সুনিশ্চিতভাবে লোকনাথের তাম্রপট্টের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই তাম্রপট্টের দাতা হলেন মরুণ্ডনাথ। এই তাম্রপট্টের মুদ্রা, সামান্য কিছু এদিক ওদিক সত্ত্বেও, লোকনাথের তাম্রপট্টের সঙ্গে এক। তবে এখানে বৃষমূর্তির নীচে নাম "শ্রীমরুণ্ডনাথ" এবং মুদ্রার দুটি লিপির ছাঁদ একই। এ তাম্রপট্টটিও অক্ষত এবং সুপাঠ্য নয়। লোকনাথের সঙ্গে মরুণ্ডনাথের যোগাযোগ ধারণার হেতু দুটি। এক, উভয়

[১] এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা ১৫ পৃ ৩০১। পাঠোদ্ধার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাকের।

[২] মিশ্র জাতি বিশেষ। পিতা ব্রাহ্মণ, মাতা শূদ্র। বাণভট্ট নিজের পারশব ভাই চন্দ্রসেনের নাম করেছেন হর্ষচরিতে (দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস)। (শব্দটি বোধ হয় 'ঔরস'-এর বৈপরীত্যে 'পর্শু'-শব্দজাত 'পার্শব' থেকে এসেছে।)

[৩] Copper-plates of Srihatta, শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত গুপ্ত, ১৯৬৭, পৃ ৬৮-৮০।

তাম্রপট্টেই পূর্বপুরুষ সামন্ত শ্রীনাথের উল্লেখ।[১] দুই, এখানেও ভগবান অনন্তনারায়ণের পূজা দেবার জন্য ও মঠে "ত্রৈবিদ্য" ব্রাহ্মণ আর্যদের পোষণের জন্য ভূমি দান। দেবকুল ও মঠ দুটি একই কিনা বোঝা গেল না। কালাপুর তাম্রপট্টে যিনি ভূমিদান চাইছেন এবং যাঁর মারফৎ চাওয়া হচ্ছে সে নাম দুটি বিলুপ্ত। এই প্রসঙ্গে এইটুকু পড়া গিয়েছে, "দত্তকক্ষেত্রপাটকে ময়া মঠং কারয়িত্বা ভগবাননন্তনারায়ণস্থাপিত পাদ (?) তত্র ভগবতো দেবস্য চ বলিচরুসত্রপ্রবৃত্তয়ে···সামান্যানাঞ্চ ত্রৈবিদ্যব্রাহ্মণার্যাণাম্···"। "ময়া" যদি মহাসামন্ত প্রদোষস্বামী হন তবে মরুণ্ডনাথ লোকনাথের অচিরপরবর্তী। আর যদি স্বতন্ত্র দেবকুল ও মঠ হয় তবে লোকনাথ ও মরুণ্ডনাথের মধ্যে কে আগে কে পরে বলা শক্ত। লোকনাথের শাসনে সামন্ত শ্রীনাথ ছিলেন তাঁর প্রপিতামহ, মরুণ্ডনাথের শাসনে শ্রীনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যেখানে অপেক্ষিত সেখানটি পড়া যায় নি। যদি কখনো পড়া যায় তবে সংশয় বিমোচন হবে।

প্রায় নব্বই বছর আগে ঢাকা শহরের তিরিশ মাইল উত্তর-পূর্বে শীতললক্ষ্যার তীর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে আশরফপুর গ্রামে একটি ছোট পিতলের চৈত্য এবং দুখানি তাম্রপট্টলেখ পাওয়া যায়। সেই তাম্রপট্টে এক অজ্ঞাতপূর্ব রাজবংশের সংবাদ পাওয়া গেছে।[১] এঁদের নামের শেষে "খড়্গ" শব্দটি আছে বলে এঁরা খড়্গ-বংশ বলে ইতিহাসে উল্লিখিত হন।

তাম্রপট্ট দুটিতেই তারিখ আছে, ১৩ সংবৎ।[২] একটি বৈশাখ মাসের ১৩ই, অপরটি পৌষ মাসের ২৫শে লিখিত। কিন্তু সংবৎ যে

---

[১] *Memories of the Asiatic Society of Bengal* প্রথমখণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা। পাঠোদ্ধার গঙ্গামোহন লস্করের।

[২] দ্বিতীয় পট্টের তারিখ সালের পাঠে সন্দেহ আছে। দ্বিতীয় পট্ট যখন দেওয়া হয় তখন বোধ করি রাজা অসুস্থ এবং রাজপুত্র রাজকার্যকারী।

কার শাসন-অব্দ তা জানা না গেলে এ তারিখ মূল্যহীন। লিপিছাঁদ দেখে ঐতিহাসিকের যা অনুমান করেন তাতে ঐকমত্য নেই। নানাদিক দিয়ে তাম্রপট্টের কাল সপ্তম শতাব্দীর শেষ এবং অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ বলে মনে হয়। দুটি একই রাজার প্রদত্ত।

দুটি তাম্রপট্টেই মুদ্রা আছে। উপবিষ্ট বৃষমূর্তি, নীচে লিপি "শ্রীদেবখড়্গ"। রাজা (এবং তাঁর পূর্বপুরুষ) বৌদ্ধ ছিলেন। অক্ষত দ্বিতীয় পট্টটির প্রারম্ভ শ্লোকে বুদ্ধবন্দনা। রচনা ভালো।

জয়ন্তি ভিন্নানুশয়ান্ধকারা বৈনেয়পদ্মান্যবোধয়ন্তঃ।
বচোঙ্শবো মার[সহায়]লক্ষ্মী-বিক্ষেপদক্ষা জিনভাস্করস্য ॥

'কর্মফল-অন্ধকার ভেদ করে, বিনয়পদ্মগুলিতে ফুটিয়ে তোলে, মারের বলসমৃদ্ধিকে দূর করতে দক্ষ, জিনসূর্যের এমন যে বচনরশ্মিজাল তার জয় হোক ॥'

দুটি তাম্রপট্টেরই লেখক ছিলেন বৌদ্ধ উপাসক পুরদাস। দুটিই জয়কর্মান্ত বাসা (camp) থেকে দেওয়া হয়েছিল। মনে হয় এই স্থান ছিল কামতা। রাজধানী ছিল অন্যত্র, তাই "বাসক"। এ স্থান জয় ক'রে অধিকার করা হয়েছিল বলে "জয়"।

প্রথম পট্টটি খুব ক্ষতিগ্রস্ত, দ্বিতীয় পট্টটি অক্ষত। এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোক থেকে জানা যায় যে বংশকর্তা খড়্গোদ্যম বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান্ ছিলেন। তাঁর পুত্র জাতখড়্গ পিতার অপেক্ষাও বড় যোদ্ধা ছিলেন। তিনি প্রতিপক্ষের অশ্ববাহিনীকে স্বীয় হস্তিবাহিনীর দ্বারা বিধ্বস্ত করেছিলেন যেমন হাওয়ায় তৃণসঞ্চয় উড়িয়ে নিয়ে যায় ("বিধ্বস্তঃ শূরভাবাৎ তৃণমিব মরুতা দন্তিনেবাশ্ববৃন্দং ")। তাঁর পুত্র শ্রীদেবখড়্গ এখন রাজা ("নরপতি")। তাঁর পুত্র যোদ্ধা রাজরাজ (প্রথম পট্টে রাজরাজভট্ট) "ত্রিভব"[1] ভয় দূর করতে ত্রিরত্নকে[2] নিজের ভূমি থেকে দান দিলেন।

---

[1] একপ্রকার রোগ ?
[2] অর্থাৎ বুদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘ।

প্রথম তাম্রপট্টে উল্লিখিত দান "আচার্যবন্দ্য" সংঘমিত্রের অধিকৃত চারটি ছোট বড় বিহারের ("বিহার-বিহারিকা-চতুষ্টয়ম্")। প্রথম পট্ট থেকে আরও জানি যে মহাদেবী শ্রীপ্রভাবতী, সামন্ত বন্টিয়োক, শ্রীনেত্র-ভট্ট, শ্রীশর্বান্তর, মহত্তর শিখর আদি, বন্দ্য জ্ঞানমতি প্রভৃতির দখল থেকে জমি নিয়ে তা বিহারের জমির সঙ্গে এক লপ্ত করে ("একগণ্ডী-কৃতং") দেওয়া হ'ল। প্রথম পট্টে প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ ৯ পাটক ১০ দ্রোণ। দান দেওয়া হয়েছিল রাজপুত্রের দীর্ঘজীবন-কামনায় ("রাজরাজভট্টস্যায়ুষ্কামার্থং")। উল্লিখিত জমি আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকেই নেওয়া হয়েছিল।

আগেই বলেছি, দ্বিতীয় পট্টের দান দিয়েছিলেন—অবশ্য পিতার অনুমতি নিয়ে—রাজপুত্র নিজের রোগ-প্রতিকারের উদ্দেশ্যে। জমির পরিমাণ ৬ পাটক ১০ দ্রোণ। এ সব জমি নেওয়া হয়েছিল সাধারণ প্রজার (?) কাছ থেকে—শক্রক (এঁর জমির মধ্যে "গুবাকবাস্তুদ্বয়" অর্থাৎ দু কিতা সুপারি গাছ লাগানো ভিটা), স্বস্তিয়োক (এঁর জমি আগে ছিল উপাসকের অর্থাৎ এক বৌদ্ধ গৃহস্থের দখলে, "উপাসকেন ভুক্তক"), সুলব্ধ আদি, রাজদাস ও দুর্গট ইত্যাদি। এর মধ্যে ১৩ দ্রোণবাপ হ'ল বুদ্ধমণ্ডপের প্রাপ্য, মহারাজ কর্তৃক প্রদত্ত ("বৃহৎপরমেশ্বরেণ প্রতিপাদিতক") বৎসনাগকে। কিছু জমি ছিল শ্রীউদীর্ণখড়্গ কর্তৃক শক্রককে দেওয়া। এ পট্টে আদেশ হচ্ছে, যারা যারা ভোগ করছে তাদের কাছ থেকে জমি নিয়ে ("যথাভুঞ্জকাদপনীয়") শালিবর্দক গ্রামে (বা স্থানে) আচার্য সঙ্ঘমিত্রের বিহারে দেওয়া হ'ল। লক্ষ্য করতে হবে যে দুটি পট্টেই কোন দাম বা বদল না দিয়ে জমি সরাসরি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় পট্টের দূতক শ্রীযজ্ঞবর্মা।

অন্তিম দানপ্রশংসার দ্বিতীয় শ্লোকে রামের উল্লেখ দ্রষ্টব্য ("প্রার্থয়ত্যেষ রামঃ")।

হিউয়েন-সাঙ তাঁর বর্ণনায় বাংলা দেশের কোন অঞ্চলের, কামরূপ

ছাড়া, কোন রাজার বা রাজবংশের উল্লেখ করেন নি। কজঙ্গল সম্বন্ধে বলেছেন এইটুকু যে এখানে প্রাচীনকালে এক রাজবংশ ছিল যা ফৌত হয়ে যায় এবং প্রতিবেশী রাজার দখলে আসে। এখানে হর্ষবর্ধন কিছুদিন অধিকার ক'রে ছিলেন। সমতটে এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ রাজবংশের ইঙ্গিত করেছেন তিনি। তাঁর শিক্ষাগুরু, নালন্দার দ্বারপণ্ডিত, শীলভদ্র ছিলেন সেই বংশেরই সন্তান। হিউয়েন-সাঙ যখন বাংলা দেশে আসেন তার কয়েক বছর আগেই শশাঙ্ক পরলোক গমন করেছিলেন। তারপরে এদেশ যে হর্ষবর্ধনের অথবা ভাস্করবর্মার অধিকারে এসেছিল এমন প্রমাণ নেই। ভাস্করবর্মা কিছুকাল কর্ণসুবর্ণে ছিলেন সন্দেহ নেই, তবে সে অবস্থান যে নিতান্ত সাময়িক তা তাঁর নিধনপুর তাম্রশাসনের ভাষা থেকেই বোঝা যায়। তিনি শাসন দিচ্ছেন কর্ণসুবর্ণ "বাসক" (অর্থাৎ) বাসা থেকে, রাজধানী বা জয়স্কন্ধাবার থেকে নয়। একথা আগে বলেছি।

আসল কথা হ'ল এই যে সপ্তম শতাব্দীর মাঝখান থেকে অষ্টম শতাব্দীর মাঝখান অবধি বাংলা দেশের রাজ্যশাসন ব্যবস্থার সম্বন্ধে কোন ধারণা করবার মতো যথেষ্ট উপাদান এখনও আবিষ্কৃত হয় নি।

কবি বাক্‌পতিরাজের প্রাকৃত কাব্য 'গউড়বহো' (গৌড়বধ) অনুসারে কনৌজের রাজা প্রখ্যাত যশোধর্মা (অষ্টম শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশক) গৌড়-রাজকে পরাজিত করেছিলেন। পরে গৌড়-রাজের সহায়তা পেয়ে কাশ্মীরের দিগ্‌বিজয়ী রাজা ললিতাদিত্য যশোধর্মাকে বিধ্বস্ত করেছিলেন। একথা এবং আরও কিছু কথা কহ্লনের রাজতরঙ্গিণীতে পাওয়া যায়। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে পূর্বভারতে তাঁর রাজ্যাংশ এক মন্ত্রীর দখলে আসে। তিনি বঙ্গদেশে অভিযান চালিয়েছিলেন। হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক, তিব্বতের রাজা গাম্‌পো বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং নেপালের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। এই সময় থেকে তিব্বতের দৃষ্টি পূর্বভারতের উপর নিবিষ্ট হয়। সেই সূত্রে ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ বিদ্বেষও সৃষ্ট হয়। পূর্বভারতের কোন কোন অংশে

তিব্বতের অধিকার প্রায় দু'শ বছর ধ'রে চলেছিল। গৌড়েশ্বরের সহায়তায় ললিতাদিত্য তিব্বতীদের হটিয়ে দেন (অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ)।

ললিতাদিত্যের একটি অকীর্তির এবং গৌড়ীয়দের একটি অপূর্ব কীর্তির কাহিনী কহ্লণ বর্ণনা করেছেন। গৌড়েশ্বরের সঙ্গে ললিতাদিত্যের সন্ধি হয় এবং তিনি গৌড়েশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে কাশ্মীরে ফেরেন। যাবার আগে তিনি তাঁর ইষ্টদেবতা পরিহাসকেশবের নামে শপথ করেছিলেন যে গৌড়শ্বরের কোন ক্ষতি তিনি কাশ্মীরে করবেন না। কিন্তু এ শপথ তিনি মানেন নি, গৌড়েশ্বরকে হত্যা করেন। গৌড়শ্বরের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর গোপনে কাশ্মীরে যান প্রভুহত্যার শোধ নিতে। তাঁরা রাজাকে না পেয়ে তাঁর দেবতার উপর দাদ তোলেন। কিন্তু যে দেবমূর্তিকে তাঁরা চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিলেন তা পরিহাসকেশবের নয়। বলা বাহুল্য তাঁরা সবাই তৎক্ষণাৎ নিহত হন। গৌড়ীয়দের এ কীর্তি গৌড়ভূমিতে অজ্ঞাত থেকে যায়, কিন্তু কাশ্মীরের ইতিহাসে তা তারস্বরে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

ললিতাদিত্যের নাতি জয়াপীড় রাজ্যচ্যুত হ'য়ে গৌড়ে আসেন এবং গৌড়রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। গৌড়রাজের সহায়তায় তিনি হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

নবম শতাব্দীর প্রথমভাগের একটি শাসনপট্টের উপক্রণিকা-শ্লোক থেকে জানা যায় যে অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত দেশ ছোটখাট রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং সে সব রাজ্যে পরস্পর বিবাদ লেগেই ছিল। এই দারুণ বিশৃঙ্খলা ও দুরবস্থার অবসান সম্ভাবিত হয়েছিল গোপাল নামে এক ব্যক্তির পুণ্ড্রবর্ধনের রাজপাটে আসন গ্রহণ করবার পর থেকে। এই গোপালের পুত্র ধর্মপাল বাংলা দেশকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানে তুলে দিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্যে। এঁদের বংশ বাংলা দেশে রাজত্ব করেছিল প্রায় চার শ বছর ধ'রে। এই চার শ বছরের

প্রথম দু'শ বছরের মধ্যে বাংলা ভাষা উদ্ভূত হয় এবং সেই ভাষাভাষী বাঙালী জাতি নিজের বিশিষ্টতা নিয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে স্বতন্ত্রতা দেখাতে শুরু করে। অর্থাৎ বলতে পারি, বাঙালী জাতির জন্ম হয়।

এই রাজাদের সকলেরই নামের শেষাংশ 'পাল', সেকারণে বংশটিকে ইতিহাসে পাল-বংশ বলা হয়। পাল-বংশের প্রথম রাজা গোপাল কোন রাজবংশের সন্তান নন। তিনি কি ক'রে যে রাজা হলেন সেবিষয়ে তাঁর পুত্রের এক ভূমিদানপট্টে উল্লিখিত আছে এই শ্লোকসম্পুটে

মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভি র্লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশশিরসাং চূড়ামণি স্তৎসুতঃ।
যস্যানুক্রিয়তে সনাতনযশোরাশি র্দিশামাশয়ে
শ্বেতিম্না যদি পৌর্ণমাসরজনির্জ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া ॥

'মাৎস্য-ন্যায়[১] দূর করবার উদ্দেশ্যে শ্রীগোপাল নামে রাজাদের মুকুটমণিকে[২] প্রকৃতিরা[৩] লক্ষ্মীর[৪] পাণিপীড়ন করিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র[৫],—দিগ্‌দিগন্তরে যাঁর চিরসঞ্চিত যশোরাশি হয়ত বা পূর্ণিমা-রজনী অনুকরণ করতে পারে ধবলতায়, জ্যোস্নারাশির সৌন্দর্যে।'

এই শ্লোকের প্রথমার্ধের সোজাসুজি এই মানে যে কোন অপুত্রক (?) রাজার দুহিতার সঙ্গে বিবাহ ঘটিয়ে পুণ্ড্রবর্ধনের (অথবা কজঙ্গলের কিংবা অন্য অঞ্চলের) রাজ্যপরিষদ্ গোপালকে রাজতক্তে বসিয়ে দিয়েছিল। ঐতিহাসিকেরা 'প্রকৃতিভিঃ' পদটির ভুল মানে ধ'রে এখানে

[১] বড় মাছ ছোট মাছকে খেয়ে ফেলে, এই দৃষ্টান্তে ক্ষুদ্রতর শক্তিকে গ্রাস করে পরে বৃহত্তর শক্তির গ্রাসে পড়া ব্যাপারকে বলা হয় মাৎস্য-ন্যায়।

[২] অর্থাৎ রাজাদের পরম আদরের। [৩] প্রকৃতিরা অর্থে অমাত্য ও সেনাপতিবর্গ, সাধারণ প্রজা অর্থে কদাপি নয়। এই ভুল অর্থ নিয়ে ঐতিহাসিকেরা ভ্রমে পড়েছেন। [৪] এক অর্থে রাজলক্ষ্মী, অপর অর্থে রাজপত্নী বা রাজকন্যা। প্রথম অর্থ অচল কেন না রাজলক্ষ্মী স্বভাবতই চঞ্চলা। রাজপত্নী হ'লে বিধবা বিবাহ মানতে হয়, সুতরাং রাজকন্যা ধরতে হবে।

[৫] অর্থাৎ গোপালের পুত্র ধর্মপাল।

সম্মিলিত প্রজাবর্গ কর্তৃক গোপালকে রাজা মনোনীত করা হয়েছিল ব'লে থাকেন। এ ঘটনা রূপকথায় ঘটে, আধুনিককালে কোথাও ঘটেছে বলে জানি না, সেকালের পক্ষে তো একেবারেই অসম্ভব ছিল। রাজজামাতার রাজা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। রাজকন্যার—গোপালের মহিষীর—নাম ছিল দেদ্দ-দেবী (—সম্ভবত 'দয়ার্দ্রা' থেকে 'দেদ্দ' উৎপন্ন)। যে সিংহাসনে গোপাল বসেছিলেন তার রাজারা বাহ্যত বৌদ্ধ ছিলেন। গোপালের পিতা-পিতামহ বৌদ্ধ ছিলেন ব'লে মনে হয় না। গোপালের পিতামহের নাম দয়িতবিষ্ণু, পিতার নাম বপ্যট। এটি সংক্ষিপ্ত ডাকনাম, পূর্ণ নাম ছিল হয়ত বপ্পবিষ্ণু। তা যদি হয় তবে পরপর তিন পুরুষের নাম বিষ্ণুঘটিত—দয়িতবিষ্ণু, বপ্পবিষ্ণু, গোপাল। সুতরাং এঁরা বিষ্ণু-উপাসক ছিলেন মনে করতে পারি। দেদ্দদেবী বৌদ্ধ-রাজবংশের মেয়ে, সেই সূত্রে পাল-বংশ বৌদ্ধ হ'ল। গোপালের পুত্র ধর্মপালের পর কয়েকটি অ-বৈষ্ণব নাম-পাই।

গোপালের রাজ্যলাভ কখন হয়েছিল জানা নেই। তিব্বতী জনশ্রুতিতে বলে তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। ভিন্‌-সেণ্ট স্মিথের মতে তাঁর রাজ্যকাল ৭৩০ (অথবা ৭৪০) থেকে ৮০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ৭৮৫ (অথবা ৭৯০ থেকে ৭৯০ (অথবা ৭৯৫) অবধি॥

৬

নবম-দশম শতাব্দী

অষ্টম শতাব্দীর শেষ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত বার শ বছর ধ'রে চতুর্দশ পুরুষ-ব্যাপী পাল-বংশের আঠারো জন রাজা রাজত্ব করেছিলেন।[১] প্রথম রাজা গোপালের রাজ্য কতদূর ব্যেপে ছিল জানি না তবে তাঁর পুত্রের রাজ্য বারাণসী পর্যন্ত অবশ্যই ছিল। ধর্মপাল কান্যকুব্জ জয় করেছিলেন এবং উত্তরাপথের রাজচক্রবর্তীর সম্মান পেয়েছিলেন। তিন-চার পুরুষ পরে রাজ্যসীমা কিছু খর্ব হয় বটে তবে মগধ শেষ পর্যন্ত তাঁদের অধিকারে ছিল। শেষ রাজা মদনপাল পরে বাংলা দেশে অধিকার হারিয়ে শুধু মগধেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহীপালের রাজ্যকালে তাঁদের পিতৃভূমি বরেন্দ্রী হস্তচ্যুত হয়। এক স্থানীয় কৈবর্ত নায়ক দিব্যোক (=দিবো) তা অধিকার করে। দিবোর পুত্র ভীমের আমলে বরেন্দ্রী আবার পাল-বংশের অধিকারে ফিরে আসে। প্রথম তিন-চার পুরুষ বাদে পাল-বংশের অধিকার ঠিক কোন্ কোন্ অঞ্চলে ছিল তা নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না। তবে অঙ্গ কখনোই তাঁদের অধিকারচ্যুত হয় নি এবং মগধ বরাবরই তাঁদের সাক্ষাৎ অধিকারে অথবা পরোক্ষ প্রভাবাধীন ছিল।

বাংলা দেশের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা পাল-বংশের প্রতিষ্ঠা

[১] গোপাল (১), তৎপুত্র ধর্মপাল (২), তৎজ্যেষ্ঠপুত্র দেবপাল (৩), তৎপুত্র প্রথম শূরপাল (৪), দেবপালের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রথম বিগ্রহপাল (৫), তৎপুত্র নারায়ণপাল (৬), তৎপুত্র রাজ্যপাল (৭), তৎপুত্র দ্বিতীয় গোপাল (৮), তৎপুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (৯), তৎপুত্র প্রথম মহীপাল (১০), তৎপুত্র নয়পাল (১১), তৎপুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল (১২), তৎজ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় মহীপাল (১৩), তৃতীয় মহীপালের মধ্যমপুত্র দ্বিতীয় শূরপাল (১৪), তৃতীয় মহীপালের কনিষ্ঠপুত্র রামপাল (১৫), তৎজ্যেষ্ঠপুত্র কুমারপাল (১৬), তৎপুত্র তৃতীয় গোপাল (১৭), এবং রামপালের কনিষ্ঠপুত্র মদনপাল (১৮)। প্রথম শূরপালের প্রদত্ত তাম্রশাসন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। এই কালেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল এবং বাঙালী জাতি তার বিশিষ্টতা নিয়ে স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল।

বংশের প্রথম রাজা গোপালের (রাজ্যকাল আনুমানিক ৭৫০-৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ) সম্বন্ধে কিছু জানা নেই। শুধু তাঁর রাজ্যপ্রাপ্তির উল্লেখ এবং তাঁর পিতা ও পিতামহের পরিচয় গোপালের পুত্র ধর্মপালের (রাজ্যকাল আনুমানিক ৭৭০-৮১০ খ্রীষ্টাব্দ) অনুশাসনে[১] আছে। পিতামহ দয়িতবিষ্ণু উল্লিখিত হয়েছেন "সর্ববিদ্যাবদাতঃ" (অর্থাৎ সর্ববিদ্যায় পারদর্শী) ব'লে। ধর্মপালের রাজ্যকালে রচিত একটি গ্রন্থের শেষে রচয়িতা হরিভদ্র বলেছেন যে "রাজভটাদিবংশপতিত" শ্রীধর্মপালের রাজ্যকালে তিনি বইটি লিখলেন।[২] রাজভট শব্দটি নাম মনে ক'রে কোন কোন ঐতিহাসিক অনেক মাথা ঘামিয়েছিলেন বিফলে। সংস্কৃত অভিধানের মতে এ একটি সংকীর্ণ জাতির নাম যে জাতির আদিপুরুষ ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং তাঁর পত্নী ছিলেন নটী। এ ব্যাখ্যা সম্ভবত অর্বাচীন কালের। যাই হোক আগের পরিচ্ছেদে দেখেছি যে তাঁর নামে রাজ-বংশের নাম ("রাজভটাদিবংশ") হয়েছিল, যে বংশে ধর্মপাল অবতীর্ণ ("পতিত") হয়েছিলেন (?), সেই খড়্গ রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। দেবখড়্গের পুত্রের নাম রাজরাজ (ভট্ট)।

গোপাল প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ আনুষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধ ছিল, এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত, কেন না ধর্মপাল থেকে শুরু করে সব পাল-রাজারই অনুশাসনের সর্বাগ্রে আছে বুদ্ধের বন্দনা-শ্লোক। (গোপালের প্রদত্ত কোন অনুশাসন বা অন্যবিধ প্রত্নলেখ পাওয়া যায় নি। মাঝের কোন কোন রাজারও অনুশাসন বা লেখ মেলে নি। তবুও যে এঁরা বৌদ্ধ ছিলেন না এমন কথা বলা যায় না।) ধর্মপাল থেকে আরম্ভ ক'রে পাল-রাজাদের অনেকেই—যাঁদের প্রত্নলিপি পাওয়া গেছে—ব্রাহ্মণ্য

[১] তাম্রশাসনটি মালদহ জেলার খালিমপুর গ্রামে পাওয়া গিয়েছিল। আবিষ্কর্তা রাধেশচন্দ্র শেঠ ও রজনীকান্ত চক্রবর্তী।

[২] বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড।

মতের দেবকুলে ভূমিদান করেছেন অথবা দেবদেবী প্রতিষ্ঠা করেছেন কিংবা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছেন। তা ছাড়া একটা বড় কথা হ'ল এই যে ধর্মপাল থেকে আরম্ভ ক'রে পাল-রাজাদের অন্তত চার-পাঁচ পুরুষ (নারায়ণপাল) পর্যন্ত সকলেরই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং তাঁরাও বংশানুক্রমে। ধর্মপালের মহামন্ত্রী ছিলেন শাণ্ডিল্য-বংশীয় পাঞ্চাল-গোত্রীয় বীরদেবের পুত্র গর্গ। ধর্মপালের পুত্র দেবপালের মহামন্ত্রী ছিলেন গর্গদেবের পুত্র দর্ভপাণি, তৎপুত্র সোমেশ্বর এবং তৎপুত্র কেদারমিশ্র। দেবপালের ভ্রাতুষ্পুত্র ও বংশধর বিগ্রহপালের মহামন্ত্রী ছিলেন কেদারমিশ্র। বিগ্রহপালের মহামন্ত্রী ছিলেন কেদার-মিশ্রের পুত্র গুরবমিশ্র। তারপর মাঝখানে মহামন্ত্রীদের নাম পাওয়া যায় নি। শেষের দিকে পাওয়া গেছে কয়েকটি নাম। প্রথম মহীপালের মন্ত্রী ছিলেন ভট্ট বাঁমন। তৃতীয় বিগ্রহপালের মন্ত্রী ছিলেন যোগদেব। রামপালের মন্ত্রী ছিলেন যোগদেবের পুত্র বোধিদেব। রামপালের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমারপালের মন্ত্রী ছিলেন বোধিদেবের পুত্র বৈদ্যদেব। (বৈদ্যদেব বড় যোদ্ধাও ছিলেন। ইনি বিদ্রোহী কামরূপ রাজাকে দমন ক'রে সেখানের শাসনকর্তা হন এবং পরে স্বাধীন রাজা।) যোগদেব উল্লিখিত হয়েছেন মহামন্ত্রী-বংশের সন্তান রূপে।[১] সুতরাং ধ'রে নেওয়া যায় যে তিনি ভট্ট বামন ও গর্গের বংশজাত।

পাল-বংশের অনেক সুকৃতি-দুষ্কৃতির অংশভাক্ ছিলেন এই ব্রাহ্মণ মন্ত্রী-বংশ। সুতরাং বাঙালীর ইতিহাসের এই পরম ক্ষণে বাঙালীর সমাজ-গঠনের এই প্রভাতকালে পাল-রাজাদের সঙ্গে পাল-মন্ত্রীদের দায়িত্বও স্মরণ করতে হয়। উচ্চতর সমাজগঠনের দায়িত্ব এই থেকে ব্রাহ্মণের হাতে চ'লে যায়।

ধর্মপাল (রাজ্যকাল আনুমানিক ৭৭০-৮১০) পাল-বংশের সব চেয়ে বড় রাজা। শৌর্যে জয়শীলতায় প্রতাপে মনস্বিতায়

বৈদ্যদেবের কমৌলি (বারাণসী) অনুশাসন, শ্লোক ৩-৪।

এঁর সমান পাল-বংশে আর কেউ জন্মায় নি। এঁর পরেই নাম করা যায় রামপালের। তখন পাল-বংশের অস্তগমন সন্নিহিত। বাংলার ইতিহাসে যে ব্যক্তির পরিচয় সর্বপ্রথম পরিস্ফুটভাবে পাওয়া যায় তিনি এই ধর্মপাল। ধর্মপালের বিরুদ নাকি ছিল "বিক্রমশীল"। এই অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে অনুমান করা হয়েছে যে ইনিই কজঙ্গলে গঙ্গাতীরে বিক্রমশীল মহাবিহারের স্থাপয়িতা। এ অনুমান যদি যথার্থ হয় তবে বিক্রমশীল বিহারের স্থাপনাই ধর্মপালের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বিক্রমশীল বিহার নালন্দা বিহারের প্রতিস্পর্ধী হয়েছিল। খাস বাংলা দেশে এর চেয়ে বড় আর বিদ্যাপীঠের কথা জানা নেই।

ধর্মপালের সময়ের একটিমাত্র ভূমিদান-পট্ট পাওয়া গেছে, মালদহ জেলায় খালিমপুর গ্রামে। দলিলটি তাঁর ৩২ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত। রাজার অধীনস্থ "মহাসামন্তাধিপতি" নারায়ণ-বর্মা বিষ্ণু বামনের ("ভগবন্-নন্ন-নারায়ণ-ভট্টারক") এক দেবকুল নির্মাণ করিয়েছিলেন। সেই দেবকুল পরিচালনার জন্যে প্রার্থনা করায় রাজা চারটি গ্রাম দান করছেন। এই হ'ল অনুশাসনটির মর্ম।[১]

এ ছাড়াও ব্রাহ্মণ্য মতের প্রতি ধর্মপালের যে গাঢ় অনুরাগ ছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে পুত্র দেবপালের (রাজ্যকাল আনুমানিক ৮১০-৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ) মুঙ্গেরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের[২] সপ্তম শ্লোকে। পিতা ধর্মপালের প্রসঙ্গে এখানে বলা হয়েছে এই কথা

কেদারে বিধিনোপযুক্তপয়সাং গঙ্গাসমেতাম্বুধৌ
গোকর্ণাদিষু চাপ্যনুষ্ঠিতবতাং তীর্থেষু ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ।
ভৃত্যানাং সুখমেব যস্য সকলানুদ্ধৃত্য দুষ্টানিমান্
লোকান্ সাধয়তোঽনুষঙ্গজনিতা সিদ্ধিঃ পরত্রাভবৎ॥

[১] ধর্মপালের অনুশাসনটি তাম্রফলকে উৎকীর্ণ করেছিলেন ভোগটের পৌত্র, সুভটের পুত্র, "গুণশালী" তাতট।

[২] অনুশাসনটি উৎকীর্ণ হয়েছিল দেবপালের ৩৩ রাজ্যাঙ্কে। পিতার মতো পুত্রও দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করেছিলেন।

'কেদারতীর্থে, গঙ্গাসাগরে, গোকর্ণ ইত্যাদি তীর্থে শাস্ত্রানুসারে জল দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্মকার্য অনুষ্ঠানকারী পরিচারকদের সুখই, সকল দুষ্টদের উৎখাত ক'রে লোকের উপকারী তাঁর পরলোকে সিদ্ধির সহগামী হয়েছিল।'

দেবপালের এই অনুশাসন থেকে জানা যায় যে তাঁর মা (ধর্মপালের মহিষী) রণ্ণাদেবী ছিলেন রাষ্ট্রকূটের রাজা (অথবা মহাসামন্ত) পরবলের কন্যা।

দেবপাল বোধ করি ব্রাহ্মণ্য মতের দিকে আরও বেশি ঝুঁকে-ছিলেন। তিনি মাতা-পিতার এবং নিজের পুণ্য ও যশ বৃদ্ধির জন্যে এক ব্রাহ্মণকে মুঙ্গের অঞ্চলে একটি গ্রাম দান করেছিলেন। অনুশাসনটি সেই দানেরই দলিল।

ধর্মপালের অনুশাসনের দূতক[১] ছিলেন যুবরাজ ত্রিভুবনপাল। দেবপালের অনুশাসনের দূতক ছিলেন যুবরাজ রাজ্যপাল। রাজ্যপালের সম্বন্ধে যে উল্লেখটুকু আছে তা ইতিহাসের পক্ষে মূল্যবান্।

শ্রেয়োবিধাবুভয়বংশবিশুদ্ধিভাজং
রাজাকরোদধিগতাত্মগুণং গুণজ্ঞঃ।
আত্মানুরূপচরিতং স্থিরযৌবরাজ্যং
শ্রীরাজ্যপালমিহ দূতকমাত্মপুত্রম্॥

'শ্রেয়ঃ বিধানে পিতৃকুল ও মাতৃকুলের বিশুদ্ধির অধিকারী, নিজের মতো গুণশালী ও চরিত্রবান্, যৌবরাজ্যে স্থির প্রতিষ্ঠিত নিজপুত্র রাজ্যপালকে গুণজ্ঞ রাজা এই ব্যাপারে দূতক করেছেন।'

ধর্মপালের অনুশাসনের দূতক যুবরাজ ত্রিভুবনপাল যদি তাঁর পুত্র হন তবে তিনি পিতার উত্তরাধিকার পান নি। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে পিতার জীবৎকালেই ত্রিভুবনপাল পরলোকগমন করেছিলেন

---

[১] যে সান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী অথবা সেই মর্যাদার ব্যক্তি (রাজপুত্র) ভূমিদানের জন্য রাজাকে সাক্ষাৎভাবে অনুরোধ করেন, অর্থাৎ যাঁর দায়িত্বে ভূমিদান ঘটে, তিনিই "দূতক" (ইংরেজীতে **plenipotentiary**)।

এবং তাঁর ভাই দেবপাল রাজা হন। এই অনুমান স্বাভাবিক। তবুও আরও দুটি অনুমান করা যায় এবং সে অনুমান খুব অস্বাভাবিক নয়। এক হ'ল—ত্রিভুবনপাল মরেন নি এবং দেবপাল তাঁরই নামান্তর; দুই, ত্রিভুবনপাল ছিলেন ধর্মপালের দ্বিতীয় ছোট ভাই। (একজন নারায়ণপালের অনুশাসনে বাক্‌পাল নামে উল্লিখিত আছেন।)

উপরে উল্লিখিত দেবপালের অনুশাসনে দূতক হলেন রাজার ছেলে যুবরাজ রাজ্যপাল, কিন্তু দেবপালের পর যিনি রাজা হয়েছিলেন তাঁর নাম বিগ্রহপাল। এ সংবাদ জানা যায় বিগ্রহপালের পুত্র নারায়ণপালের অনুশাসন[১] থেকে। এই অনুশাসন অনুসারে ধর্মপালের অনুজ বাক্‌পাল, তাঁর পুত্র জয়পাল, তাঁর পুত্র বিগ্রহপাল। বিগ্রহপালের পুত্র নারায়ণপালের মহামন্ত্রী গুরবমিশ্র প্রতিষ্ঠিত গরুড়স্তম্ভ-লিপি অনুসারে গুরবমিশ্রের পিতা কেদারমিশ্র ছিলেন দেবপালের এবং শূরপালের মহামন্ত্রী। রাজ্যপালের কোনই উল্লেখ নেই। সুতরাং এখানে ধরতে হয় যে শূরপাল বিগ্রহপালেরই নামান্তর। ঐতিহাসিকদের এই অনুমানের বিরুদ্ধে প্রমাণ সম্প্রতি মিলেছে। উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলায় দেবপালের পুত্র শূরপালের তাম্রপট্ট আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম আছে, মাতার নাম আছে—ভাবদেবী। শাসনপট্ট শূরপালের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত হয়েছিল।[১]

পিতার জীবৎকালেই নারায়ণপাল রাজ্যশাসনের ভার পেয়েছিলেন অথবা নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে অনুশাসনের উক্তি উদ্ধৃত করছি।

তপো মমাস্তু রাজ্যং তে দ্বাভ্যামুক্তমিদং দ্বয়োঃ।
যস্মিন্ বিগ্রহপালেন সগরেণ ভগীরথে॥

"তপস্যা আমার হোক, রাজ্য তোমার থাক।—এই কথা দুজন দুজনকে বলেছিলেন: বিগ্রহপাল তাঁকে (অর্থাৎ নারায়ণপালকে) এবং সগর ভগীরথকে।"

[১] *Journal of the Asiatic Society*, Vol. XIII, পৃ ২০১-০২

এ কথায় কিছু সত্য নিহিত থাকলে বুঝব বিগ্রহপাল রাজ্যরক্ষায় কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি অথবা তিনি অতিরিক্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন, কিংবা গুরবমিশ্রের সঙ্গে বনিবনাও হয়নি।

ধর্মপালের মতো দেবপালও বড় যোদ্ধা ছিলেন এবং তিনি পিতৃরাজ্য যথাসম্ভব অটুট রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা ক্রমশ হীনবল হ'য়ে পড়েন। তার একটা কারণ হ'তে পারে দক্ষ ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব। মন্ত্রীদের হাতে রাজ্যভার চ'লে গেলে রাজা স্বভাবতই নিবীর্য হ'য়ে পড়েন। ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের ক্ষমতা যে কতখানি বেড়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে নারায়ণপালের অনুশাসনে এবং তাঁর মন্ত্রী গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে।[২] অনুশাসন থেকে জানি যে নারায়ণপাল নিজে "সহস্রায়তন" মঠ বা দেবকুল নির্মাণ করিয়ে শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই মঠে পূজাকর্ম ও পাশুপত আচার্য-পরিষদের প্রয়োজন নির্বাহের জন্য তীরভুক্তিতে রাজা একটি গ্রাম দান করছেন। গুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপি থেকে বুঝতে পারি যে মন্ত্রীর ক্ষমতা এতখানি বেড়ে গেছে যে তিনি স্ববংশের কীর্তি স্তম্ভে খোদাই ক'রে চিরস্থায়ী করছেন।

ধর্মপালের অনুশাসন দেওয়া হয়েছিল পাটলীপুত্র থেকে। দেবপাল ও নারায়ণপালের অনুশাসন দেওয়া হয়েছিল মুদ্‌গগিরি (আধুনিক মুঙ্গের) থেকে। মনে হয় ধর্মপাল নিজেই শেষবয়সে পাটলীপুত্র থেকে মুদ্গগিরিতে রাজধানী ("জয়স্কন্ধাবার") সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর স্থাপিত বিক্রমশীল বিহার মুদ্‌গগিরির কাছাকাছি ছিল।

বিগ্রহপালের (রাজ্যকাল আনুমানিক ৮৫০-৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) জীবৎকালেই তাঁর পুত্র, মহিষী হৈহয়-বংশজাতা লজ্জাদেবীর গর্ভে জাত, নারায়ণপাল শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন। বিগ্রহপাল ছিলেন ভালো-মানুষ এবং ধর্মক্রিয়ানিষ্ঠ (অথবা ব্রাহ্মণমন্ত্রীদের অবাধ্য)।

---

[১] ভাগলপুরে প্রাপ্ত। ১৭ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত।

[২] বাদল (দিনাজপুর) গরুড়স্তম্ভ লিপি। এটি কয়েকটি শ্লোকাত্মক কাব্য।

তিনি স্বেচ্ছায় পুত্রের হাতে রাজ্যভার দিয়ে ধর্মকর্মে নিরত হয়েছিলেন। এই কথা ভাগলপুরে প্রাপ্ত নারায়ণপালের অনুশাসন থেকেই পাওয়া যায়। (পূর্বে উদ্ধৃত শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

নারায়ণপালের এই অনুশাসন থেকে জানা যায় যে তিনি তীর-ভুক্তিতে মকুতিকা গ্রামে "সহস্রায়তন" (হাজার মন্দির যুক্ত) শৈব মঠ করিয়ে এবং সেখানে শিবের প্রতিষ্ঠা করে শৈব আচার্য্যদের স্বচ্ছন্দ-বাসের ব্যবস্থা করেন। তাঁর রাজ্যলাভের ১৭ বর্ষে এই অনুশাসনটি লেখা হয়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে নামত বৌদ্ধ হ'লেও পাল-রাজা তখন ব্রাহ্মণ্য মতের প্রতি বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়েছেন। ধর্মপাল বিষ্ণু-মন্দিরের জন্য গ্রাম দান করেছিলেন কিন্তু নিজে বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা করেন নি। পাল-রাজারা যে ক্রমশ কি পরিমাণে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের বশে আসছেন তারও প্রমাণ পাই। নারায়ণপালের রাজ্যকালে প্রথমে মহামন্ত্রী ছিলেন কেদারমিশ্র। ইনি শূরপালের সময় থেকে সাম্রাজ্যের মহামন্ত্রী। ইঁহার পিতামহ দর্ভপাণি ছিলেন দেবপালের মহামন্ত্রী এবং প্রপিতামহ গর্গ ছিলেন ধর্মপালের। কেদারমিশ্রের পর তাঁর পুত্র গুরবমিশ্র নারায়ণ-পালের মহামন্ত্রী হয়েছিলেন। ইনি এক বিরাট গরুড়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করে তার গায়ে নিজের বংশাবলীপ্রশস্তি উৎকীর্ণ করেছিলেন। এই স্তম্ভ দিনাজপুর জেলায় বাদল গ্রামে এখনও বিদ্যমান। রাজাকে ছাড়িয়ে মন্ত্রীর প্রশস্তি প্রতিষ্ঠা থেকে বুঝি যে তখন মন্ত্রীর (এবং ব্রাহ্মণের) প্রতিপত্তি রাজার চেয়ে বেশি হ'য়ে উঠেছিল। একথা আগে বলেছি।

নারায়ণপাল দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন, অন্তত ৫৪ বছর। কেন না ৫৪ রাজ্যাঙ্কে খোদাই করা লিপি একটি পিতলের পার্বতীমূর্তির পিছনে উৎকীর্ণ আছে।

নারায়ণপালের পর রাজা হন তাঁর পুত্র রাজ্যপাল। ইঁহার বিবাহ হয় রাষ্ট্রকুট-বংশীয় তুঙ্গের কন্যা ভাগ্যদেবীর সঙ্গে। নারায়ণ-পালের রাজত্বের শেষ ভাগ থেকে পাল-বংশের পতন দ্রুততর হয়। নারায়ণপাল অঙ্গ হারিয়েছিলেন। রাজ্যপালের সময়ে প্রতীহার-বংশীয়

রাজা মহেন্দ্রদেব মগধ ও তীরভুক্তি অধিকার ক'রে নেন। রাজ্যপালের কোন অনুশাসন পাওয়া যায় নি। রাজ্যপালের প্রপৌত্র মহীপালের অনুশাসন থেকে জানা যায় যে রাজ্যপাল (রাজ্যকাল আনুমানিক ৯০৮-৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ) কয়েকটি গভীর জলাশয় ও উচ্চ সৌধনির্মাণ করিয়েছিলেন।

এইখানে একটু সমস্যা আছে। সে সমস্যা জেগেছে ইর্দায় প্রাপ্ত নয়পালের ১৩ রাজ্যাঙ্কে দেওয়া তাম্রপট্ট থেকে। রাজ্যপাল ও ভাগ্যদেবীর পুত্র নয়পাল বলছেন যে তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা নারায়ণপালের পর রাজা হয়েছেন। একথা সত্য হ'লে রাজ্যপালের এক পুত্র ছিলেন দ্বিতীয় নারায়ণপাল এবং রাজ্যপালের পর পাল অধিকার দ্বিধা বিভক্ত হয়েছিল, বুঝতে হবে। নয়পালের অধিকার ছিল পশ্চিমবঙ্গে।

রাজ্যপালের পর (উত্তর মধ্য ও পূর্ববঙ্গে ?) রাজা হয়েছিলেন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় গোপাল (রাজ্যকাল আনুমানিক ৯৪০-৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ)। গোপালের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (রাজ্যকাল আনুমানিক ৯৬০-৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ)। দ্বিতীয় গোপাল অযোগ্য রাজা ছিলেন না। গুর্জরদের হাত থেকে তিনি মগধের খানিকটা অংশ পুনরধিকার করেছিলেন। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে গৌড়মণ্ডল কাম্বোজবংশীয় রাজার (নয়পালের বংশের ?) হাতে চলে যায়।

নবম শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গে দুটি রাজবংশ প্রবল হয়েছিল। খড়্গ বংশের প্রথম রাজা জাতখড়্গ ছিলেন দেবপালের সমসাময়িক। এঁদের তিনপুরুষের খবর পাওয়া গেছে। খড়্গোদ্যম, তাঁর পুত্র জাতখড়্গ, ও জাতখড়্গের পুত্র দেবখড়্গ। দেবখড়্গ নবম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

নবম শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে পূর্ববঙ্গে—হরিকেলে (কুমিল্লা অঞ্চলে) ও চন্দ্রদ্বীপে (বাক্‌লায়) এক শক্তিশালী রাজার অভ্যুদয় ঘটে। ইনি ত্রৈলোক্যচন্দ্র। এঁর পিতা সুবর্ণচন্দ্র ও পিতামহ পূর্ণচন্দ্র রাজা

ছিলেন না, সম্ভবত পাল-রাজাদের সামন্ত ছিলেন। এঁরা বৌদ্ধ ছিলেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্র কম্বোজদের হাত থেকে সমতট জয় ক'রে নেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন। এঁর পরে রাজা হন পুত্র কল্যাণচন্দ্র, তারপর তৎপুত্র লডহচন্দ্র। (লডহচন্দ্র নামক কবির দুটি কবিতাশ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে সঙ্কলিত আছে, তিনি এই রাজা হওয়া সম্ভব।) তারপর রাজা হন তাঁর পুত্র গোবিন্দচন্দ্র। ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দাক্ষিণাত্যের চোল-বাহিনী আক্রমণ ক'রে এঁকে পরাজিত করে। রাজেন্দ্র চোলের উৎকীর্ণ লিপিতে বঙ্গাল দেশের রাজা বলে গোবিন্দচন্দ্রের উল্লেখ আছে। শ্রীচন্দ্র এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন।

গোপাল-ধর্মপাল থেকে দ্বিতীয় বিগ্রহপাল পর্যন্ত পাল-রাজাদের এই দ্বিশতবর্ষের রাজ্যকাল বাংলা দেশের ও বাঙালীর পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাল। নবম-দশম শতাব্দীতে বাংলা ভাষা হামা-গুড়ি ছেড়ে চলি-চলি পা-পা করতে শুরু করেছে। তিব্বতের সঙ্গে পূর্বভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এখান থেকে সেখানে বৌদ্ধ মত গিয়েছে, সেখান থেকে এখানে তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তিপূজার আমদানি হয়েছে। পূর্বভারতে প্রচলিত তান্ত্রিক মহাযান উপাসনা-পদ্ধতিতে যে বীভৎস ও অশ্লীল মূর্তি কল্পনা দেখা যায় তার কতক ভাব দেশীয় সাধক-শিল্পীর কল্পনাপ্রসূত হওয়া সম্ভব, তবে বেশির ভাগই "মহাচীন" থেকে আগত ব'লে মনে হয়। মনে রাখতে হবে যে তান্ত্রিক মহাযানের আবির্ভাব কতকটা আকস্মিক এবং তা অষ্টম-নবম শতাব্দীর আগে নয়। বাঙালী তক্ষণ শিল্পের উৎকর্ষ পালরাজাদের প্রথম দু'শ বছরের মধ্যেই দেখা দেয়। এই উৎকর্ষ সম্ভব হয়েছিল তান্ত্রিক মহাযান দেবদেবী মূর্তির নির্মাণ-অভ্যাস থেকে।

পালরাজাদের প্রথম দু'শ বছরের রাজ্যকালে বাঙালীর সমাজে একটা বড় রকম সংহতির সূত্রপাত হয়েছিল। যদিও বাংলা দেশে

কখনো ধর্ম-বিদ্বেষের বালাই ছিল না (—ভারতবর্ষের অন্যত্রও নয়। কেননা আমাদের ধর্মের প্রধান নীতিসূত্র হচ্ছে পরমত-সহিষ্ণুতা। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা যে হিন্দু-বৌদ্ধ বিদ্বেষ অনুমান করেছেন তা পরবর্তী কালের হিন্দু-মুসলমান পোলিটিকাল দ্বন্দ্ব অনুসারে—)। শশাঙ্ক কান্যকুব্জ-রাজের কোপে পড়ায় তাঁকে কতকটা বৌদ্ধ-বিদ্বেষী রূপ নিতে হয়েছিল। এই সূত্রে সপ্তম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ দ্বন্দ্ব বাঙালীর সমাজে কিছু ঘ'টে থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু তা হোক চাই নাই হোক পাল-রাজাদের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যপন্থীর ও বৌদ্ধপন্থীর মিলনপথ প্রশস্ত হয়েছিল। পাল-রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন ("পরমসৌগত"), কিন্তু তাঁদের মহামন্ত্রীরা ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত (এবং তাঁদের অনেকে ধনুর্ধরও)। তাঁরা নিজে ব্রাহ্মণ্য দেবপূজায় ভূমিদান করতেন, এবং কেউ-কেউ নিজেও দেবমন্দির ও দেব-কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরা গঙ্গাস্নান ক'রে গঙ্গাজলের অঞ্জলি দিয়ে "বুদ্ধভট্টারকম্ উদ্দিশ্য" (অর্থাৎ বুদ্ধঠাকুরকে উদ্দেশ ক'রে) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ভূমি দান করতেন। পাল-রাজাদের রানীরা, যতদূর জানা যায়, প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ্যপন্থী বংশের কন্যা।

পাল-রাজাদের সময়েই, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ পন্থার বিরোধ না থাকার ফলে বৌদ্ধ মত ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য মতের মধ্যে মিলিয়ে যেতে থাকে এবং তা কতক বৈষ্ণব-ভাবনার সঙ্গে মিশে গিয়ে ভক্তির স্রোত প্রবল ক'রে দেয় এবং কতক শাক্ত-ভাবনাকে তান্ত্রিক পথে জাগাইয়া তোলে, তবে সে বেশ কিছুকাল পরে। পাল-রাজাদের কালেই বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য মতে প্রবেশ পেয়ে দশাবতারে স্থান গ্রহণ করেন। বাংলা দেশে বুদ্ধ-অবতার কারুণ্যমূর্তি, তিনি যে অবলোকিতেশ্বর। তিনি বেদবাদের বিরোধী ছিলেন এই কারণে যে যজ্ঞে পশুহনন হ'ত।

> নিন্দসি যজ্ঞবিধের্ অহহ শ্রুতিজাতম্
> সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
> কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জয় দেব হরে॥

পরে ভারতবর্ষের অন্যত্রও বুদ্ধ দশাবতারের মধ্যে স্বীকৃত হয়েছেন, কিন্তু

সেখানে করুণাঘন অবলোকিতেশ্বর নন, সেখানে তিনি দেববন্ধু, দানবশত্রু। দানবদের ঠকাবার জন্যেই তিনি বেদনিন্দুক হয়েছিলেন। যেমন মানসোল্লাসে উদ্ধৃত জয়দেবের গানের সহযোগী এই অংশে

বুদ্ধরূপেঁ জো দানবাসুরঁা বঞ্চড়নি বেদদূষণ বোল্লড়নি
মায়া মোহিয়া
তে দেউ মাঝি পাসাউ করু।

'বুদ্ধরূপে যিনি বাক্যে বঞ্চনাত্মক বেদনিন্দা দানব-অসুরদের মায়া-মোহিত করেছিলেন সেই দেব আমাকে অনুগ্রহ করুন।'

তখন ব্রাহ্মণ্যপন্থা ও বৌদ্ধপন্থার মধ্যে যে কিছু বিরোধ তা ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের তর্কাতর্কিতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ধর্মপাল বিদগ্ধব্যক্তি এবং বিদ্বৎপ্রিয় ছিলেন। কোন উৎকীর্ণ লিপিতে সমর্থন পাওয়া না গেলেও অনুমান হয় তাঁর বিরুদ (অর্থাৎ পণ্ডিত ও গুণী সমাজে প্রশংসিত নামান্তর) ছিল বিক্রমশীল। তিনি মুদ্‌গগিরির অনতিদূরে গঙ্গাতীরে বিক্রমশীল (এখন প্রায়ই "বিক্রমশীলা" নামে অভিহিত) মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। এই মহাবিহার সেকালে পূর্বভারতে, কেন সমগ্র ভারতবর্ষে, বৌদ্ধ (এবং অনেকটা ব্রাহ্মণ্য) বিদ্যার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান নালন্দ মহাবিহারের প্রতিস্পর্ধী হয়েছিল। নালন্দ মহাবিহারের পোষকতা ক'রত দেশ বিদেশের বৌদ্ধ রাজা ও প্রজারা। ধর্মপাল প্রমুখ পাল-রাজারা নালন্দের প্রধান পরিপোষক ছিলেন। নালন্দ তাঁদেরই রাজ্যের মধ্যে ছিল।

বৌদ্ধ বিদ্যাবত্তার ইতিহাস-লেখক তিব্বতী পণ্ডিত তারনাথ (সপ্তদশ শতাব্দী) লিখেছেন যে ধর্মপালের সময়ে এদেশে চারটি মহাবিহার ছিল। তার মধ্যে তিনি দুটির নাম করেছেন। বিক্রমশীল নবনির্মিত, এবং সোমপুর (প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের অনতিদূরে, অধুনা পাহাড়পুর নামে পরিচিত স্থানে) সংস্কারপ্রাপ্ত। আর দুটির নাম

তিনি করেন নি। একটি অবশ্যই "নালেন্দ্র", অপরটি হয়ত মধ্যরাঢ়ে পাণ্ডুভূমি মহাবিহার।

লামা তারনাথ তাঁর ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস গ্রন্থে বিক্রমশীল মহাবিহারের কিছু বর্ণনা দিয়েছেন। গঙ্গার উত্তর তীরে পাহাড়ের উপর এই মহাবিহার নির্মিত হয়। মাঝখানের মন্দিরে মহাবোধিসত্ত্বের মানবাকার মূর্তি স্থাপিত ছিল। তার চারদিকে ছিল এক শ সাতটি মন্দির। তার মধ্যে চুয়ান্নটি ছিল সাধারণ বৌদ্ধ দেবতার পূজার জন্য আর তিপ্পান্নটি ছিল গুহ্যতান্ত্রিক উপাসনার জন্য। এই এক শ আটটি সৌধ পাঁচিরে ঘেরা ছিল। এক শ চোদ্দ জনের জন্য প্রচুর বন্দোবস্ত ছিল। এঁদের মধ্যে এক শ আট জন ছিলেন "পণ্ডিত" অর্থাৎ মহাযান-আচার্য, আর অপরে ছিলেন—বলি-আচার্য, প্রতিষ্ঠান-আচার্য, হোম-আচার্য, মূষিকপাল, কপোতপাল এবং দেবদাসদের অধ্যক্ষ। এঁদের একএক জনের বৃত্তি চার জনের উপযুক্ত ছিল। প্রত্যেক মাসে একটি ক'রে উৎসবের আয়োজন হ'ত, যাঁরা মহাযানমত শুনতেন তাঁদের জন্য। তাঁদের ভালো দান দেওয়া হ'ত। যিনি সর্বাধ্যক্ষ তাঁকে নালন্দ মহাবিহারেরও অধ্যক্ষতা করতে হ'ত। প্রত্যেক পণ্ডিতকে নির্দিষ্ট রুটিন অনুযায়ী মহাযান (বা মহাযানতান্ত্রিক) মতের বিশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা করতে হ'ত। বিক্রমশীল মহাবিহারের প্রথম ব্যাখ্যাচার্য ও সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন আচার্য হরিভদ্র। ইনি ছিলেন এক রাজার ছেলে এবং মহাপণ্ডিত। ইনি রাঢ়-উড়িষ্যার সীমান্তে ত্রিকটুক বিহারে প্রজ্ঞাপারমিতার ব্যাখ্যা করতেন। হাজার লোক তা শুনত। সেখান থেকে ধর্মপাল এঁকে নিয়ে আসেন। হরিভদ্র কালগত হ'লে রাজা বুদ্ধজ্ঞানশ্রী-মিত্রকে হরিভদ্রের স্থানে বসান। বুদ্ধজ্ঞানশ্রী-মিত্রকে ধর্মপাল গুরুর মতো শ্রদ্ধা করতেন। (তারনাথের উক্তি সত্য হ'লে রাজা সস্ত্রীক এঁকে গুরু বরণ করেছিলেন।) বজ্রাসনে (অর্থাৎ বৌদ্ধ-গয়ার বিহারে) এক সময় সিংহলী বৌদ্ধরা মহাযানমতের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ আরম্ভ করেছিলেন। এঁরা বিক্রমশীল বিহারে বাংলা দেশ

থেকে আগত উপাসকদের বললেন যে মহাযান ভুল শাস্ত্র। সিংহলী বৌদ্ধরা মহাযান পুথি ছিঁড়ে ফেলে দেয় ও রূপার হেরুকমূর্তি গালিয়ে ফেলে রূপা আত্মসাৎ করে। ধর্মপাল তাঁদের বধদণ্ড দেন। বুদ্ধ-জ্ঞানশ্রীর অনুরোধে অনেকের দণ্ডাজ্ঞা মকুব হয়েছিল।

বিক্রমশীল মহাবিহারে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সঙ্গে বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতদের ('তৈর্থিক') বাদ প্রায়ই হ'ত। এই বাদসভায় বৌদ্ধ মহাযানীরা মাথার উপরে খোঁচা-তোলা টুপি প'রে আসতেন। তারনাথ বলেছেন, এইরকম টুপি পরার রীতি শেষ (?) সাত পাল-রাজার সময় থেকে সেন-রাজাদের সময় পর্যন্ত চ'লে এসেছিল। পাল-রাজাদের পূর্বে এ রীতি ছিল না। এবিষয়ে তিনি একটি গল্পও বলেছেন। বাংলা দেশে চাটিগাঁ শহরে পিণ্ড বিহারের ভিক্ষু পণ্ডিতদের তৈর্থিক পণ্ডিতেরা তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। রাত্রিকালে এক বৃদ্ধা নারী এসে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের বলেন, তাঁরা যেন সূচ্যগ্র শিরোধান প'রে বাদসভায় যান। সেইমত ক'রে ভিক্ষু পণ্ডিতরা তৈর্থিক পণ্ডিতদের হারিয়ে দেন।

নবম-দশম শতাব্দী থেকেই বোধ হয় মূর্তি এঁকে বা মাটি দিয়ে গ'ড়ে দেবদেবীর পূজা চলিত হয়। মহাযান-তান্ত্রিক উপাসনায় এই রীতি প্রথম দেখা যায়। রাজ্যপালের সময়ে বিক্রমশীল বিহারের বজ্রাচার্য অভয়ঙ্কর-গুপ্তের লেখা একটি তান্ত্রিক সাধনার পুস্তিকায় উল্লিখিত আছে যে শিল্পীকে একদিনের মধ্যেই প্রতিমাটি গড়তে হবে (সাধনমালা ২৯৫)।

পাল-রাজারা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁদের আমলে সংস্কৃতে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র এবং সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা ঘটা ক'রে চলতে থাকে। বাংলা দেশের মহাযানী বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা সংস্কৃতেই লিখতেন, পালি বা বৌদ্ধসংস্কৃত ব্যবহার করতেন না। তাঁদের নিজস্ব ব্যাকরণ ছিল। সে ব্যাকরণ লিখেছিলেন চন্দ্রগোমী (ষষ্ঠ শতাব্দী ?)। সেকালে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চায় বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ বিচার ছিল না। সেইকারণে বৌদ্ধ অশ্বঘোষের লেখা 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরনন্দ' কাব্য দুটি এদেশে খুব প্রচলিত ছিল পাঠ্য হিসাবে।

নবম শতাব্দীতে অভিনন্দ নামে এক কবি সংস্কৃতে 'রামচরিত' কাব্য লিখেছিলেন। কাব্যটির ছত্রিশ সর্গ অবধি পাওয়া গেছে। অনেক পরবর্তী কালে বাংলায় লেখা রামচরিত কবিতায় বা গানে প্রাপ্ত একটি বিশেষত্ব অভিনন্দের রামচরিতে আছে। শক্তিদেবীকে আরাধনা ক'রে তবে রামের জয়লাভ ঘটেছিল। তবে অভিনন্দের কাব্যে রাম নন, হনুমান দেবী-পূজা করেছিলেন। অভিনন্দের পোষ্টা ছিলেন "ধর্মপাল-কুলকৈরবকাননেন্দু" শ্রীযুবরাজদেব। ইনি দেবপাল হওয়া সম্ভব। অভিনন্দ খ্যাতনামা কবি ছিলেন। এঁর অনেক কবিতা-শ্লোক সুভাষিতরত্নকোশ ও সদুক্তিকর্ণামৃত এই দুই সর্বপ্রাচীন সংস্কৃত কবিতাকোষ-গ্রন্থে সঙ্কলিত আছে।

চন্দ্র-রাজাদের বিদ্যোৎসাহের উল্লেখ আগে করেছি। এখন আর একটু বিশেষ ব্যাপারের উল্লেখ করছি। শ্রীচন্দ্র চন্দ্রপুরী বিষয়ে (আধুনিক সিলেটের অন্তর্গত) একাধিক মহাবিহার-মহামঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যাকে কতকটা এখনকার দিনের ইউনিভারসিটিও বলতে পারি। ধর্মপালের বিক্রমশীল বিহারও এমনি ছিল কিন্তু সে সম্বন্ধে এতটা বিবরণ পাইনি যেমন পাচ্ছি শ্রীচন্দ্রের একটি তাম্রশাসনে তাঁর চন্দ্রপুরী মহাবিহার-মহামঠের। পরে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য॥

৭

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী

পাল-রাজাদের অবরোহপর্ব নারায়ণপালের পর থেকেই শুরু হয়েছিল। তাঁর বৃদ্ধ প্রপৌত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপালের আমলে পাল-অধিকার খুব খর্ব হয়। এঁর পুত্র মহীপাল (রাজ্যকাল আনুমানিক ৯৮৮-১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) খর্বীভূত রাজ্যসীমা কিছু পরিমাণে কিছুদিনের জন্য বাড়াতে পেরেছিলেন এবং পূর্বতন পাল-রাজবংশের কীর্তি-খ্যাতিও খানিকটা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন। এঁর আমলে প্রতাপান্বিত তামিল ভূপতি রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাজল আহরণের উদ্দেশ্য জানিয়ে বিরাট সশস্ত্র বাহিনী পাঠিয়েছিলেন অভিযানে। চোল-শক্তির কাছে মহীপাল উত্তররাঢ়ে পরাস্ত হয়েছিলেন। তারপর তিনি সম্ভবত পশ্চিমদিকে সমগ্র মগধ অধিকার ক'রে বারাণসী পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। কোন প্রশস্তি থেকে এ সংবাদ জানা যায় না, তবে তাঁর আদেশে তাঁর অনুজ স্থিরপাল ও বসন্তপাল বারাণসীতে ও সারনাথে কয়েকটি প্রাচীন স্থাপত্যের জীর্ণোদ্ধার ও নূতন মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন—এই কথা লেখা আছে সারনাথে প্রাপ্ত একটি বুদ্ধমূর্ত্তির পাদদেশে উৎকীর্ণ প্রত্ন-লেখে (১০২৬ খ্রীষ্টাব্দ)। বারাণসীতে মহীপালের অধিকার বেশি দিন টেকে নি, শীঘ্রই এ অঞ্চল কলচুরি-রাজ গাঙ্গেয়দেবের দখলে আসে। ১০৩৪ খ্রীষ্টাব্দ লামা তারনাথের উক্তি অনুসারে আচার্য দীপঙ্করশ্রী জ্ঞান দু' রাজার মধ্যে সন্ধি স্থাপনে মধ্যস্থতা করেছিলেন। পরে এ অঞ্চল কলচুরিদের অধিকার থেকে মুসলমানের হাতে চ'লে যায়। মহীপাল নালন্দাও কিছু কিছু জীর্ণসংস্কার করিয়েছিলেন।

মহীপালের পরে রাজা হন তাঁর পুত্র (দ্বিতীয়) নয়পাল (রাজ্য-কাল আনুমানিক ১০৩৮-১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দ)। নয়পালের মহিষীর নাম ছিল

উদ্দাকা। কলচুরি-বংশীয় গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণ তাঁর রাজ্য আক্রমণ ক'রে খুব ক্ষতি সাধন করেছিলেন। নয়পালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী তৃতীয় বিগ্রহপালের (রাজ্যকাল আনুমানিক ১০৫৫-১০৭০) আমলে কর্ণ আবার আক্রমণ করেন। সম্ভবত তিনি উত্তররাঢ়ের অনেকটা অংশ অধিকার করেছিলেন। তারপর বিগ্রহপাল তাঁকে পরাজিত করেন এবং কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। (এই বিবাহঘটনা নয়পালের সময়ে ঘটাও অসম্ভব নয়।) তৃতীয় বিগ্রহপালের সময়ে পাল-রাজ্য চারদিক থেকে বার বার আক্রান্ত হয়েছিল। বিগ্রলপালের তিন ছেলে ছিল। জ্যেষ্ঠ দ্বিতীয় মহীপাল মনে হয় যৌবনশ্রীর পুত্র ছিলেন, মধ্যম দ্বিতীয় শূরপাল ও কনিষ্ঠ রামপাল ছিলেন রাষ্ট্রকূটবংশীয় মহিষীর পুত্র। (এই অনুমানের কারণ, দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসন পেয়েই দু'ভাইকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। রামপাল যে রাষ্ট্রকূট-বংশীয় রানীর পুত্র তাতে সন্দেহ নেই, তাঁর মামা রাষ্ট্রকূট-বংশীয় মথন তাঁর বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। শূরপালের সম্বন্ধে অনুমান মাত্র।) তৃতীয় বিগ্রহপালের নামাঙ্কিত বহু রজত-মুদ্রা পাওয়া গেছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন তিনি বোধ হয় এদেশে বহুল রজত-মুদ্রার প্রবর্তক।

তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র পরপর সিংহাসনে বসেন। এঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ যিনি, রামপাল, তিনি ধর্মপালের পরেই পাল-বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। ধর্মপালের সম্বন্ধে আমরা টুকরাটাকরা খবর পেয়েছি মাত্র, কিন্তু রামপালের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পেরেছি—প্রধানত তাঁর জীবনী কাব্য 'রামচরিত' থেকে, অপ্রধানত পরবর্তী কালের জনশ্রুতি থেকে। রামচরিত কাব্যটি দ্ব্যর্থ ও দুরূহ রচনা,—এক অর্থে দাশরথি রামের চরিত-বর্ণনা (অর্থাৎ রামায়ণ), অপর অর্থে রামপালের কীর্তি-কাহিনী। আগাগোড়া আর্যা ছন্দে লেখা। চার পরিচ্ছেদ। কবি সন্ধ্যাকর-নন্দী রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র ও পাল-বংশের শেষ রাজা মদন-পালের সময়ে বর্তমান ছিলেন। তাঁর পিতা প্রজাপতি-নন্দী রামপালের

এক মন্ত্রী ছিলেন। সুতরাং রামচরিতের বর্ণনাকে সমসাময়িক বলতে হয়।

তৃতীয় বিগ্রহপালের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় মহীপাল (রাজ্যকাল আনুমানিক ১০৭০ হইতে ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) রাজা হ'য়ে খলের কথায় ভুলে দু' ভাইকে বন্দী করেন (রামচরিত ১.৩৭)। এঁর রাজ্যকালের গোড়ার দিকে কৈবর্তরা বরেন্দ্রীকে অধিকার ক'রে দিব্যোক বা দিব্যকে রাজা করে। ইনি পাল-রাজ্যের কর্মচারী ছিলেন। মহীপাল রাজা হ'য়ে দিব্যকে আক্রমণ ক'রতে গেলে আপোসের ছলনা ক'রে দিব্য তাঁকে ভুলিয়ে নিয়ে অথবা অন্য কোন ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে হত্যা করেন। এই অনুমানের প্রমাণ সন্ধ্যাকর-নন্দীর বচন,—মারীচ যেমন রামচন্দ্রকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তেমনি ছলনাময় ("উপধিব্রতিনা") দিব্যের দ্বারা মহীপাল অপহৃত (এবং নিহত) হয়েছিলেন (১.৩৮)।

দ্বিতীয় মহীপাল শত্রুর শঠতায় নিহত হ'লে পর তৃতীয় বিগ্রহপালের দ্বিতীয় পুত্র (দ্বিতীয়) শূরপাল সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা নেই। মদনপালের তাম্রশাসনে দ্বিতীয় মহীপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ব'লে শুধু নামটি আছে। রামচরিতে অতিরিক্ত তথ্য হ'ল এই যে তিনি রামপালের অগ্রজ ছিলেন (১.২৮) এবং মহীপাল পিতার মৃত্যুর পরেই দু' ভাইকে কারাগারে নিক্ষেপ ক'রে সিংহাসনে বসেছিলেন (১. ৩১, ৩৩)। দ্বিতীয় শূরপাল সিংহাসন ছুঁয়েছিলেন মাত্র, বেশিদিন রাজত্ব করবার অবকাশ পান নি। মদন-পালের তাম্রশাসনে উল্লেখ না থাকলে পাল-বংশের রাজা-তালিকায় তাঁর নাম উঠতই না।

রামপাল (রাজ্যকাল আনুমানিক ১০৭৭-১১২০ খ্রীষ্টাব্দ) যখন রাজা হন তখন তাঁর বয়স হয়েছে। রাখালদাস অনুমান করেন, রামপাল ভাইকে হত্যা ক'রে রাজা হয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যপাল পিতার সহায়ক ছিলেন। রামপাল সিংহাসনে বসেই হারানো রাজ্য উদ্ধারের দিকে মন দিয়েছিলেন। তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন পিতৃভূমি বরেন্দ্রীর

উদ্ধার সাধনে। ইতিমধ্যে বরেন্দ্রীতে দিব্যোকের পর তাঁর ভাই রুদোক এবং তারপর রুদোকের পুত্র ভীম রাজা হয়েছেন। ভীম সুশাসক ছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহে বিধ্বস্ত বরেন্দ্রীর শ্রী তিনি অনেকটা ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন।

রামপাল মন দিলেন সামন্ত-রাজাদের, বিশেষ ক'রে প্রত্যন্ত ও জাঙ্গল ভূমির অধিকারী রাজাদের, বন্ধু ক'রে দলে আনা। রামপাল অত্যন্ত বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি অভিমান ছেড়ে দিয়ে অশেষ কষ্ট স্বীকার ক'রে (১.৪৩) সকলের কাছে নিজে গিয়ে সহায়তা চেয়েছিলেন। সকলেই খুসি হয়ে তাঁর সাহায্যে নিজেদের সৈন্য সামন্ত নিয়ে এগিয়ে আসেন। এই সমবেত শক্তির আক্রমণে ভীম পরাজিত ও বন্দী হন। সপরিজন ভীমের মৃত্যুদণ্ড হয়। এই সময়ে পূর্ববঙ্গে (সমতটে ও হরিকেলে) এক শক্তিশালী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বর্ম-রাজাদের রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জাতবর্মার (রাজ্যকাল আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ) সঙ্গে কলচুরি-বংশীয় গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণের এক কন্যা বীরশ্রীর বিবাহ হয়। আগে বলা হয়েছে যে কর্ণের অপর এক কন্যা যৌবনশ্রীর সঙ্গে তৃতীয় বিগ্রহপালের বিবাহ হয়েছিল। যৌবনশ্রীর গর্ভে রামপালের (এবং অনুমান করি দ্বিতীয় শূরপালের) জন্ম হয়েছিল। সুতরাং জাতবর্মা ও রামপাল পরস্পর সম্পর্কে মেসো ও শালীর ছেলে। সেইকারণে জাতবর্মা একবার দিব্যকে আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু কিছু ক'রতে পারেন নি। পরে তিনি রামপালকে হস্তী ও রথ সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন (৩.৪৪)।

রামপাল প্রত্যন্ত-সামন্তদের দুর্গম স্থানে নিজে কষ্ট ক'রে গিয়ে তাঁদের দলে ভিড়িয়েছিলেন। রামপালের সাহায্যার্থে সমবেত হলেন এঁরা এঁদের বাহিনী নিয়ে। মূল রামচরিতে এঁদের নাম অত্যন্ত সংক্ষেপে দেওয়া আছে, তবে সমসাময়িক প্রাচীন টীকাতে তাঁদের তালিকা পূর্ণতর পাওয়া যায়। এই তালিকাটি ইতিহাসের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান্।

১ রামপালের মাতুল রাষ্ট্রকূট-বংশীয় মহন (বা মথন), অঙ্গদেশাধিপতি।

২ মহনের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপ্রতীহার শিবরাজদেব।

৩-৪ মহনের পুত্র কাহ্নুরদেব ও সুবর্ণদেব।

৫ মহনের জামাতা, পীঠীপিতি দেবরক্ষিত।

৬ ভীমযশাঃ, মগধের অধিপতি, কান্যকুব্জ-জেতা।

৭ দক্ষিণ আরণ্য অঞ্চল কোটাটবীর রাজচক্রবর্তী বীরগুণ।

৮ উৎকলরাজ-জেতা, দণ্ডভুক্তির অধীশ্বর জয়সিংহ।

৯ "দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধবসুধাচক্রবালবালবলভিতরঙ্গবলবহলগলহস্ত-প্রশস্তহস্তবিক্রম" বিক্রমরাজ।

১০ অপরমন্দারের মধুসূদন-স্বরূপ, "সমস্তাটবিক-সামন্তচক্র-চূড়ামণি" লক্ষ্মীশূর।

১১ কুজবটীর, হস্তিযুদ্ধবিশারদ ("প্রতিভটকরিকূটকষণকেশরী") শূরপাল।

১২ তৈলকম্পের কল্পতরু রুদ্রশিখর।

১৩ উচ্ছালের রাজা ময়গলসীহ।

১৪ ঢেক্করীর রাজা প্রতাপসীহ।

১৫ কযঙ্গল-মণ্ডলের অধিপতি নরসিংহার্জুন।

১৬ সঙ্কটগ্রামের চণ্ডার্জুন।

১৭ নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ।

১৮ কৌশাম্বীপতি দ্বোরপবর্ধন।

এই সামন্তচক্রকে মোটামুটি "আটবিক" বলা যায়। মগধের রাজা ভীমযশ, দণ্ডভুক্তির অর্থাৎ দাঁতন অঞ্চলের রাজা জয়সিংহ, দেবগ্রামের বিক্রমরাজ, এবং কৌশাম্বী-পতি দ্বোরপবর্ধন আর সম্ভবত নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ ছাড়া সকলেই আরণ্য ও পার্বত্য ভূমির অধিকারী ছিলেন। পীঠী গয়া অঞ্চল, কোটাটবী ময়ুরভঞ্জ অঞ্চল, অপরমন্দার হ'ল মান্দারন (<মন্দারবন বা মন্দারারণ্য) আধুনিক হুগলী-দক্ষিণ বর্ধমান-

মেদিনীপুর-বাঁকুড়া। (অঙ্গে মন্দার ছিল মন্দার-পর্বত অঞ্চলের জঙ্গল মহল। সুহ্মে মান্দারন হ'ল মন্দারারণ্য।) তৈলকম্প মানভূম।

পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধযাত্রা করবার আগে মহাপ্রতীহার শিবরাজদেব নৌসেতুবন্ধন ক'রে ভাগীরথী পার হ'য়ে গিয়ে বরেন্দ্রীরাজ্য ও ভীমের সেনাবাহিনী আক্রমণ দ্বারা যথেষ্ট ক্ষতিসাধন ক'রে দিয়ে আসেন। তারপরে সামন্তচক্র নিয়ে রামপাল যান এবং যুদ্ধ ক'রে ভীমকে বন্দী করেন। ভীমের সেনারা চারদিকে পালিয়ে যায়। দ্বিতীয় পুত্র বিত্তপালের উপর ভীমের ভার দেওয়া হয়। শীঘ্রই ভীমের ভ্রাতুষ্পুত্র (?) হরি পলায়নপর বাহিনী জড় ক'রে রামপালকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে হরি পরাজিত ও ধৃত হ'লে ভীম ও তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। এইরূপে রামপাল সমগ্র বরেন্দ্রী জয় করেন এবং ক্রমশ অন্যদিকে রাজ্য বিস্তারে মন দেন। তিনি উড়িষ্যা অধিকার করেন, কামরূপ জয় করেন।

গঙ্গা ও করতোয়ার মাঝখানে রামপাল তাঁর নূতন রাজধানী রামাবতীর পত্তন করলেন। (পরে সেনরাজ-প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মণাবতী যেন এরই অনুকরণে নাম পায়। রামাবতী নগরীর স্মৃতি বাংলা সাহিত্যে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত চ'লে এসেছিল। ধর্মমঙ্গল-কাহিনীতে গৌড়-রাজধানী "রমতী" এই রামাবতী।) রামাবতী নগরীর প্ল্যান করেছিলেন চণ্ডেশ্বর ও ক্ষেমেশ্বর (৩.২)। রামাবতীর সন্নিকটে রামপাল জাগদ্দল (বা জগদ্দল) মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রামপাল দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন। লামা তারনাথের মতে তাঁর রাজ্যকাল ছেচল্লিশ বছর, সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত সেকশুভোদয়ার মতে বাহান্ন বছর। তবে অন্তত বিয়াল্লিশ বছর তো বটেই, কেননা তাঁর বিয়াল্লিশ রাজ্যাঙ্কের খোদিত লিপি পাওয়া গেছে।

বৌদ্ধ পণ্ডিতাচার্য অভয়ঙ্কর-গুপ্তকে রামপাল গুরুর মতো মান্য করতেন। ইনি যখন বিক্রমশীল মহাবিহারে ছিলেন তখন তাঁর বিখ্যাত রচনা, অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার টীকা, লেখা হয়। ইনি নালন্দায়

এবং জাগন্দলেও ছিলেন। লামা তারনাথ বলেছেন সিদ্ধাচার্য বিরূপ রামপালের প্রতি সদয় ছিলেন। একটি গল্পও তিনি বলেছেন। রামপালের প্রিয় হস্তী, নাম বান-বাদল, বিরূপের পা-ধোওয়া জল খেয়ে যুদ্ধে শতাধিক ম্লেচ্ছকে বধ করেছিল।

মাতুল মহনের সঙ্গে রামপালের সবিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। শেষ বয়সে রাজা পুত্র রাজ্যপালের হাতে শাসনভার দিয়ে মুঙ্গেরে গঙ্গাতীরে পুরানো রাজধানীতে বাস করছিলেন। মাতুল মহনের তিরোধান-বার্তা শুনে তিনি গঙ্গায় অন্তর্জলী হয়ে দেহত্যাগ করেন। এ যেন ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু। সন্ধ্যাকর-নন্দী লিখেছেন,

জনজাতে রুদতি শুচাসারমবগাহ্য তজ্জলং পুণ্যম্।
বিরহসহপরিজনৈ দুর্বিষহং রামো জগাম স্বভুবম্॥ ৪.১০ ॥

'জনমণ্ডলী তীব্র শোকে কাঁদছে, তখন দুর্বিষহ বিরহভারাক্রান্ত পরিজনের সম্মুখে রাম সেই পবিত্র নীরে অবগাহন ক'রে নিজের দেশে (অর্থাৎ স্বর্গে) চলে গেলেন॥'

ঠিক এই কথাই সমর্থিত হয়েছে সেকশুভোদয়ায়। রামপাল যে অত্যন্ত ধার্মিক ন্যায়বান্ প্রজাপালক রাজা ছিলেন তা সেকশুভোদয়ায় ধৃত এই সব টুকরা কথা থেকেই বোঝা যায়। সেকশুভোদয়ার মতে রামপালের একটিমাত্র ছেলে ছিল। সে ছেলে একদিন এক নারীকে ধর্ষণ করে। এই অভিযোগ শুনে রামপাল সবিশেষ বিচার না ক'রেই পুত্রের প্রাণদণ্ড দেন।

> পুরা রামপালস্যৈকপুত্র স্তেন কদাচিৎ যোষিদ্ ধর্ষিতা। জ্ঞাত্বা স রাজা স্বপুত্রং শূলেন যোজয়ামাস। অদ্যাপি তেষাং যশো গীয়তে লোকৈঃ—রামপালো রাজা একমেব পুত্রম্ অপরাধিনমনপরাধিনং বা শূলেন যোজয়ামাস। (তৃতীয় পরিচ্ছেদ।)

সেন-বংশের রাজ্যপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে রামপালের শেষদিনের কথা সেক-শুভোদয়ায় এইভাবে আছে (একাদশ পরিচ্ছেদ),

"এতস্মিন্ সময়ে রামপালো রাজা অনশনেন মর্তুকামঃ গঙ্গায়াম্ অবতিষ্ঠতে। ক্রন্দতো লোকান্ রামপালোঽব্রবীৎ। ভো জানপদাঃ মমোক্তানি সর্বাণি পালয়িষ্যথ। ময়া শিবপ্রসাদাৎ দ্বাপঞ্চাশৎপুরুষৈঃ (=বর্ষৈঃ) রাজ্যং কৃতম্। ইদানীম্ অপুত্রোঽহং মর্তুকামঃ। যূয়মেবাস্মাকং পুত্রাঃ। ভবতাং কারণাৎ নিজপুত্রং শূলং দত্তবান্। তস্মাৎ সর্বজানপদৈর্মম শ্রাদ্ধং কর্তব্যমবশ্যম্। ময়ি মৃতে সতি কশ্চিদ্ রাজা যো ভবেৎ তস্য দাসস্য দাসোঽহং যো মে কীর্তিং ন লংঘয়েৎ ব্রাহ্মণজীবিকাধার্মিকজীব্যাতুরান্ধাদিজীব্যানি যো ন লংঘয়েৎ।

"আতুরা ব্রাহ্মণা সর্বে তথা চ মম কিঙ্করাঃ।
এতান্ যঃ পালয়ামাস স রাজা জয়তাৎ চিরম্॥
ইত্যুক্ত্বা মৌনমাস্থায় রামপালঃ স্থিতস্তদা।
রুরুদুর্জানপদাঃ সর্বে অদ্য তাতো মৃতোঽপি নঃ॥
অন্তর্জলে স্থিতো রাজা রাজপত্নীসহায়বান্॥"

'এই সময়ে রামপাল রাজা প্রায়োপবেশনে মরণ কামনা ক'রে গঙ্গায় ছিলেন। লোকেরা কাঁদছিল। রামপাল তাদের বললেন, "ওগো দেশের লোক, আমার কথা সব পালন ক'রো। শিবের অনুগ্রহে আমি বাহান্ন বছর রাজত্ব করেছি। আমি অপুত্রক, এখন মরতে চাই। তোমরাই আমাদের ছেলে। তোমাদের খাতিরে আমি নিজের ছেলেকে শূলে দিয়েছি। অতএব দেশের সকল লোক অবশ্যই আমার শ্রাদ্ধাধিকারী। আমি মরে গেলে যিনি রাজা হবেন তাঁর দাসের দাস আমি, যিনি আমার কীর্তি লোপ করবেন না, যিনি ধার্মিক লোককে পোষণ করবেন, ব্রাহ্মণের জীবিকা অন্ধ-আতুর ইত্যাদির জীবিকা লঙ্ঘন করবেন না। সব লোক এবং আতুর, ব্রাহ্মণ, আমার ভৃত্যবর্গ—এদের যে পালন করবে সে রাজা যেন চিরকাল জয়যুক্ত হয়।" এই ব'লে রামপাল চুপ ক'রে রইলেন। দেশের লোক সব কাঁদতে লাগল,— আজ আমরা সবাই পিতৃহীন হলুম (এই ব'লে)। রাজা অন্তর্জলী হলেন, কাছে রইল শুধু রাজপত্নী॥'

এর পর এই যে শ্লোক আছে, তার প্রথম চরণে দুটি অক্ষর কম,

শাকে যুগ্ম বেণু রন্ধ্র গতে কন্যাং গতে ভাস্করে
কৃষ্ণে বাক্‌পতিবাসরে যমতিথৌ যামদ্বয়ে বাসরে।
জাহ্নব্যাং জলমধ্যত স্তনশনৈ র্ধ্যাত্বা পদং চক্রিণঃ
হা পালান্বয়মৌলিমণ্ডনমণিঃ শ্রীরামপালো মৃতঃ ॥ ৯২২ ॥

'শাকে···গত হলে, সূর্য কন্যা রাশিতে থাকা কালে, কৃষ্ণপক্ষে, বৃহস্পতিবারে, দ্বিতীয়া তিথিতে জাহ্নবীর জলমধ্যে প্রায়োপবেশনে বিষ্ণুর পদ ধ্যান করতে করতে, হায়, পালবংশের মুকুটমণি রামপাল দেহত্যাগ করলেন ॥'

দুটি অক্ষর কম পড়ায় শক বৎসরটি কি তা বোঝা গেল না। শ্লোকের শেষে দেওয়া আছে—৯২২। এ শকাব্দ হয় তো ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ। ইতিহাসের সঙ্গে মেলে না।

ইতিহাসে বলে রামপাল দুই ছেলেকে রেখে মারা যান, কুমারপাল এবং মদনপাল। রামপালের পর রাজা হন কুমারপাল (রাজ্যকাল আনুমানিক ১১২০-১১২৫ খ্রীষ্টাব্দ)। কুমারপালের পর রাজা হলেন তৎপুত্র তৃতীয় গোপাল (রাজ্যকাল আনুমানিক ১১২৫-১১৪০ খ্রীষ্টাব্দ)। সন্ধ্যাকর-নন্দীর কথায় ইনি দুর্বিনীত ছিলেন। সম্ভবত ইঁহার অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল। তারপর সিংহাসন পান রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র, মদনদেবীর গর্ভজাত মদনপাল (আনুমানিক রাজ্যকাল ১১৪০-১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দ)। অঙ্গের মহামাণ্ডলিক চন্দ্রদেব—মহনের কনিষ্ঠ পুত্র সুবর্ণদেবের পুত্র—মদনপালের বিশেষ সহায় ছিলেন। মদনপালের অভিষেকে খুব ধুমধাম হয়েছিল। মদনপাল ছিলেন শান্তিপ্রিয়। তিনি প্রায় পুরাপুরি ব্রাহ্মণ্য-মতাবলম্বী হ'য়েছিলেন। মনহলি গ্রামে প্রাপ্ত তাঁর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে তাঁর পট্ট-মহাদেবী চিত্রমতিকাকে বিধিমত মহাভারত শোনানোর দক্ষিণারূপে তিনি "বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য" পণ্ডিত ভট্টপুত্রে বটেশ্বরস্বামীকে গ্রামদান করেছিলেন তাঁর রাজ্যকালের অষ্টম বৎসরে।

বাংলা দেশে মদনপালের অধিকার ছিল না। সম্ভবত রামপালের মৃত্যুর পরেই এদেশ সেন-রাজাদের হাতে চলে যায়। মদনপাল পাল-বংশের শেষ রাজা।

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ববঙ্গে (সমতট-হরিকেলে) এক শক্তিশালী রাজবংশের উদ্ভব হয়। এঁদের রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। প্রতিষ্ঠাতা জাতবর্মা পাল-রাজা তৃতীয় বিগ্রহপালের সমসাময়িক ছিলেন। দুজনের মধ্যে সম্বন্ধও ছিল। জাতবর্মা ও বিগ্রহপাল কলচুরি কর্ণের দু' কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। জাতবর্মা যোদ্ধা ছিলেন। ইনি পাল-রাজাদের অধিকারে অঙ্গমণ্ডল আক্রমণ করেছিলেন, কামরূপ আক্রমণ করেছিলেন। বরেন্দ্রীতে দিব্যের বিরুদ্ধেও অভিযান করেছিলেন। এঁর অব্যবহিত উত্তরাধিকারী হরিবর্মা বহুদিন রাজ্য করেছিলেন। তাঁর ৩৯ রাজ্যাঙ্কে লেখা বই পাওয়া গেছে। হরিবর্মার পর সিংহাসনে বসেন কলচুরি কর্ণের কন্যা বীরশ্রীর গর্ভজাত সামলবর্মা। (হরিবর্মা বোধ হয় অন্য, জ্যেষ্ঠ, মহিষীর পুত্র ছিলেন।) সামলবর্মার পুত্র ভোজবর্মা এই বংশের সব চেয়ে নামী রাজা ছিলেন। বর্ম-রাজারা উৎসাহী ব্রাহ্মণ্যপন্থী ছিলেন। এঁদের মুদ্রা বা লাঞ্ছন ছিল বিষ্ণুচক্র।

সেন-বংশের উদ্ভব পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে পাল-রাজাদের হটিয়ে এবং অন্যত্র বর্ম-রাজাদের উৎখাত ক'রে। সেন-রাজবংশের উৎপতি নিয়ে সেকশুভোদয়ায় একটি কাহিনী আছে। সেটি নেহাত গল্প হ'লেও তার মধ্যে সত্যের কিছু প্রতিধ্বনি থাকা সম্ভব ব'লে মনে করি। গল্পটিতে রামপালের মৃত্যুর জের টানা হয়েছে। রামপালের দেহত্যাগের কাহিনীটি আগে বলেছি।

সেন-রাজাদের বংশকর্তা বিজয়সেন ছিলেন দরিদ্র কাঠকুড়ানে তবে অতিশয় শিবভক্ত। বন থেকে কাঠ কুড়িয়ে অথবা কেটে এনে শহরে

বিক্রয় ক'রে যা পেতেন তার থেকে প্রত্যহ ফল-ফুল কিনে শিবপূজা করতেন। এমন এক দিন হ'ল যে কিছুই কাঠ মিলল না। শুধু-হাতে বাড়ি যান কি ক'রে, শিবেরই বা পূজা হয় কিসে। বিজয়সেন তাঁর একমাত্র হাতিয়ার দাখানি বাঁধা দিয়ে যা কড়ি পেলেন তার কিছু শিবপূজার জন্যে রেখে বাকি স্ত্রীকে দিলেন। এইভাবে দিন যায়। একদিন ঘোর বর্ষায় কাঠ কিছুই পাওয়া গেল না। সেদিন স্ত্রীর ভয়ে বিজয়সেন বাড়ি না ফিরে বনেই কাটালেন। রাত্রিতে শিব এসে তাঁকে পরীক্ষা ক'রে বুঝলেন যে সে ঘোর মূর্খ কিন্তু তাঁর পরম ভক্ত। সেইদিনই শিব মহামন্ত্রী সহদেব-ঘোষকে স্বপ্ন দিলেন যে অমুক স্থানে নিঃস্ব কাঠুরে বিজয়সেন আছে, রামপালের পাটে তাঁকে যেন রাজা করা হয়। তাই করা হ'ল।—এই গল্প সত্য নয়, তবে এর একটু মর্মার্থ সত্য। তা হল এই যে এঁরা ধনী ছিলেন না এবং এঁদের রাজ্যলাভে পাল-রাজাদের কোন মন্ত্রীর কিছু হাত হয়ত ছিল।

সেনেরা তিন পুরুষ রাজ্য করবার পর পশ্চিম বঙ্গে তুর্কি-অধিকার শুরু হয়। তারপর যে ক পুরুষ তাঁরা পূর্ববঙ্গে ও মধ্যবঙ্গে স্বাধিকার রাখতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে খাঁটি খবর পাওয়া যায় না। সেন-রাজাদের অনুশাসনে তাঁদের "ব্রহ্মক্ষত্র" বলে জানা যায়। সম্ভবত তাঁরা কর্ণাট থেকে আগত যোদ্ধাদের এক প্রাচীন উপনিবিষ্ট শাখা। (বল্লাল-সেনের নৈহাটী তাম্রশাসন ও লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য।) বাংলায় এঁদের মূল নিবাস ছিল রাঢ়ে, দামোদর ও অজয়ের উপত্যকায়। এই অঞ্চলের এক বিশেষ অংশ, বর্ধমান জেলার উত্তর-পশ্চিমের মধ্য ভাগ, সেনভূম নামে পরিচিত হ'য়ে এসেছে।

এই বংশের হেমন্তসেন প্রথম স্বাধীন রাজা হয়েছিলেন। সেক-শুভোদয়ার গল্পটি আসলে হেমন্তসেনকে লক্ষ্য করে উদ্ভূত হয়েছিল। গল্পের বিজয়সেন শিবভক্ত এবং সত্যবাদী। ইতিহাসের হেমন্তসেনও (তাঁর পুত্র বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি অনুসারে) তাই ছিলেন—"মূর্ধন্যর্ধেন্দুচূড়ামণিচরণরজঃসত্যবাক্‌কণ্ঠভিত্তৌ"। বিজয়সেন (রাজ্য-

কাল আনুমানিক ১০৯৫ (?)—১১৫৮), বল্লালসেন (রাজ্যকাল আনুমানিক ১১৫৮-১১৭৮) ও লক্ষ্মণসেন (রাজ্যকাল আনুমানিক ১১৭৮-১২০৫)—এই তিনপুরুষের রাজত্ব সেনবংশের মহিমাময় কাল। বিজয়সেন দীর্ঘকাল রাজ্য করেছিলেন। বারাকপুর তাম্রশাসন তাঁর রাজ্যাভিষেকের ৬২ অব্দে প্রদত্ত হয়েছিল। পুত্র এবং পৌত্র এঁর সেনাপতিত্ব করতেন। সুতরাং বিজয়সেনের দীর্ঘ রাজ্যকাল যথার্থই তিনপুরুষের শাসন।

বিজয়সেনের একটি প্রশস্তি ও একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। ইনি তাঁর রাজধানী বিজয়পুরের কাছে (?), রাজশাহী শহরের পশ্চিমে সাত মাইল দূরে আধুনিক দেওপাড়া গ্রামে, এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করিয়ে সেখানে প্রত্যুম্নেশ্বর নামে শিব প্রতিষ্ঠা করেন এবং পূজাভোগের জন্য প্রচুর ব্যবস্থা করেন। মন্দিরের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড দীঘি কাটিয়েছিলেন। বিজয়সেনের এই এবং অন্যান্য কীর্তি ৩৬ শ্লোকাত্মক প্রশস্তি কাব্যের আকারে মহামন্ত্রী উমাপতিধর কর্তৃক বিরচিত হ'য়ে শিলাপট্টে খোদিত হয়। এটি মন্দির গাত্রে আবদ্ধ ছিল। মন্দির বিধ্বস্ত, তবে শিলালিপিটি রক্ষা পেয়েছে। আনুমানিক ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে প্রত্যুম্নেশ্বর শিবমন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দীঘিটি এখনও আছে। তার 'পত্মমসর' নামে দেবতার স্মৃতি চ'লে এসেছে।

বিজয়সেনের ভূমিদান তাম্রশাসনটি তাঁর ৬২ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত। এটি পাওয়া গিয়েছিল বারাকপুরে। প্রদত্ত গ্রামের নাম ঘাসসম্ভোগ ভাট্টবড়া। ভাট্টবড়া আধুনিক ভাটপাড়ার পূর্বরূপ ব'লে মনে করি। গ্রাম দান করেছিলেন বিজয়সেনের পত্নী "শূরকুলাম্ভোধিকৌমুদী" বিলাসদেবী এক ব্রাহ্মণকে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে তুলাপুরুষ-দানের হোমদক্ষিণারূপে। বল্লালসেনের একটি মাত্র তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে—কাটোয়া শহরের ছয় মাইল দূরে নৈহাটি গ্রামে। এই গ্রামের পাশ দিয়ে তখন গঙ্গা প্রবাহিত হ'ত। তাঁর মাতা বিলাসদেবী সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে হেমাশ্বদান করেছিলেন, তারই দক্ষিণা এই ভূমিদানের মর্ম।

তখন বল্লালসেনের একাদশ রাজ্যাঙ্ক চলছে। লক্ষ্মণসেনের অনেকগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এগুলি সবই ব্রাহ্মণ-পুরোহিতকে দানপত্র। যেগুলিতে তারিখ আছে সেগুলি হয় তাঁর দ্বিতীয় নয় তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে দেওয়া। দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্কে দেওয়া শাসনগুলিতে লক্ষ্মণসেন "পরমনারসিংহ" ব'লে উল্লিখিত, কিন্তু তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে দেওয়া শাসন-গুলিতে সেখানে পাই "পরমবৈষ্ণব"।

হেমন্তসেন থেকে লক্ষ্মণসেন পর্যন্ত রাজাদের কাল, অর্থাৎ আয়ুষ্কাল ও রাজ্যকাল, ঠিকমত নির্ধারণ করা যায় নি, শুধু এইটুকুই স্থির যে এই চার পুরুষের রাজ্যকাল প্রায় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই ছিল। মিথিলায় ও নেপাল অঞ্চলে যে "ল-সং" বা "লক্ষ্মণ সংবৎ" প্রচলিত ছিল তা ঐতিহাসিকেরা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যলাভ-বর্ষ থেকে আবব্ধ ব'লে মনে করতেন। তা হলে লক্ষ্মণসেনের অভিষেক-বর্ষ হয় ১১১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দ। সে অসম্ভব, তবে পরে দেখা যাবে যে এইটি লক্ষ্মণসেনের জন্ম-বৎসর হ'তে বাধা নেই। লক্ষ্মণসেন বৃদ্ধ বয়সে রাজা হয়েছিলেন, তাই নূতন বৎসর গণনা তাঁর রাজ্যলাভ-বর্ষ থেকে না ধ'রে তাঁর জন্ম-লাভ বৎসর থেকে গণনা হয়েছিল।

সেন-রাজাদের কাল নির্ণয়ের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র আছে। লক্ষ্মণসেনের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সভাসদ বটুদাসের পুত্র শ্রীধর 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামে একটি সংস্কৃত কবিতা-গ্রন্থ সঙ্কলন করেছিলেন। গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছিল ১১২৭ শকাব্দে লক্ষ্মণসেনের "রসৈকবিংশেহব্দে" অর্থাৎ ২৭ বৎসরে। খ্রীষ্টাব্দ ধরলে ১২০৬, শকটি অতীতাব্দ ধরলে ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দ। সদুক্তিকর্ণামৃতের ভরতবাক্যের মতো অন্তিম শ্লোকটি এই,

> ভবতু নৃপঃ ধর্মপরঃ পরমসমৃদ্ধা চ ভবতু বসুধেয়ম্।
> ধেয়াৎ সুখানি লোকে কেশবচরণাম্বুজদ্বিতয়ম্॥

'রাজা ধর্মনিষ্ঠ হোন, এই পৃথিবী পরম সমৃদ্ধ হোক, কেশবের পাদপদ্ম দুটি সংসারে সুখ বিধান করুক॥'

'কেশব' শব্দটির মধ্যে যদি শ্লেষ থাকে তবে বুঝতে হবে যে তখন (অর্থাৎ "রসৈকবিংশ" লক্ষ্মণাব্দে) কেশবসেন রাজ্য চালাচ্ছেন। আর শ্লেষ যদি না থাকে তবে জানব যে, যে কালে এবং যে স্থানে এই অন্তিম শ্লোকটি রচিত হয়েছিল সে কালে এবং সে স্থানে লেখকের পরিচিত কোন ব্যক্তি রাজপাটে ছিল না। অর্থাৎ তখন সে অঞ্চলে মুসলমানের অধিকার। মিন্‌হাজুস্‌ সিরাজ ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 'তবকাৎ-ই নাসিরি' লিখেছিলেন। তাতে মহম্মদ-ই বখ্‌ত্যার কর্তৃক বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ অধিকারের প্রায় সমসাময়িক বর্ণনা আছে। মিন্‌হাজ ১২৪০-৪১ সালে বাংলা দেশে এসেছিলেন। তাঁর মতে ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে বখ্‌ত্যার লক্ষ্মণসেনের রাজধানী "নোদিয়া" অধিকার করেন এবং লক্ষ্মণসেন গঙ্গা-পথে পলায়ন করেন। একথা সত্য হ'লে লক্ষ্মণ-সেন ১২০৩ থেকে ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পরলোক গমন করেছিলেন ভাবতে পারি। ঠিক কবে যে বখ্‌ত্যারের নোদিয়া আক্রমণ ঘটেছিল তার কোন উল্লেখ নেই। মিন্‌হাজ শুধু বলেছেন যে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেন অশীতিবর্ষীয় ছিলেন। তবে সেকশুভোদয়ায় এই যে শ্লোকটি আছে তার থেকে মনে হয় যেন ১১২৪ শকাব্দে (১২০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দে) ঘটনাটি ঘটেছিল।

চতুর্বিংশোত্তরে শাকে সহস্রৈকশতাধিকে।
বেহারপাটনাৎ পূর্বং তুরস্কঃ সমুপাগতঃ॥

'১১২৪ শকাব্দে বিহার-পাটনা থেকে পূর্বদিকে তুর্কি এসে উপস্থিত হ'ল॥'

বখ্‌ত্যারের অভিযান সম্বন্ধে পরের অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১২০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দে যদি লক্ষ্মণসেনের বয়স আশি হয় তবে তাঁর রাজ্যলাভ সময়ে (১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে) বয়স হয়েছিল ৫৩। লক্ষ্মণসেন পিতামহের আমলেও যুদ্ধে নামতেন। সুতরাং পিতা বল্লালসেনের রাজ্যলাভ কালে তাঁর বয়স ২০ বছরের কম ছিল না। যদি ২০ বছরই

ধরা যায় তবে বল্লালসেনের রাজ্যলাভ কাল হয় ১১৪২ এবং লক্ষ্মণসেনের জন্মকাল হয় ১১২২ খ্রীষ্টাব্দ। যদি ধরা যায় যে বিজয়সেন ৬২ বছরই রাজত্ব করেছিলেন তবে তাঁর রাজ্যলাভ কাল দাঁড়ায় ১০৮০ খ্রীষ্টাব্দ। এই আনুমানিক হিসাব ধরলে বিজয়সেনকে রামপালের বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক মানতে হয়। তাহলে সেকশুভোদয়ার গল্পে কিছু সত্য আছে ব'লে ধ'রে নিতে পারি। আমার মনে হয় এই আনুমানের সমর্থন রামচরিতেও আছে। যে যে সামন্ত ও বন্ধুবর্গের সাহায্যে রামপাল পিতৃভূমি বরেন্দ্রী উদ্ধার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ। বিজয়রাজ বিজয়সেন হ'তে পারেন। আগেই দেখেছি যে এঁরা কর্ণাট থেকে আগত বীর যোদ্ধা ("রাজপুত্র" অর্থাৎ রাজপুত বা অশ্বারোহী) ছিলেন। বিজয়রাজ নামটির "রাজ" অংশে হয়ত তারই ইঙ্গিত আছে। তবকাৎ-ই-নাসিরিতে মিন্‌হাজ লক্ষ্মণসেনকে "রায় লখ্‌মনিয়া" বলেছেন। এখানে "রায়" সেই "রাজ"। বিজয়সেনেরা উত্তররাঢ়ে উপনিবিষ্ট ছিলেন। বিজয়রাজের রাজধানীর নাম ছিল নিদ্রাবলী। মনে হয় এই নিদ্রাবলীই এখনকার নিরোল (<নিড়াল <নিদ্রাবলী) গ্রাম। কাটোয়া হইতে কিছু দূরে এই গ্রাম প্রাচীন বিখ্যাত এবং সম্পন্ন। উত্তররাঢ় অঞ্চলে সেন-রাজারা নিজস্ব নামে ("বৃষভশঙ্কর") ভূমিমাপ ("নল") পদ্ধতি চালু করেছিলেন।

সেন-রাজাদের বংশের অধিদেবতা ছিলেন শিব। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনের শীর্ষে সদাশিবের মূর্তি আছে লাঞ্ছনরূপে এবং এঁদের শাসনের প্রথম শ্লোকই শিবের বন্দনা। বিজয়সেন ও বল্লালসেন ব্যক্তিগতভাবেও শিব-উপাসক ছিলেন তাই তাম্রশাসনে তাঁদের বিরুদ "পরমমাহেশ্বর"। লক্ষ্মণসেন কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে বিষ্ণু-উপাসক হয়েছিলেন। তাই তাঁর বিরুদ "পরমনারসিংহ" অথবা "পরমবৈষ্ণব"।

বিজয়সেনের বারাকপুর তাম্রশাসনে এবং লক্ষ্মণসেনের পরবর্তী কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে এঁদের একটি বিশিষ্ট বিরুদ পাওয়া যায়। সেটিও এঁদের কুলধর্ম অনুযায়ী। বিজয়সেনের তাম্র-

শাসনটি পড়লে মনে হয় যেন যুবরাজ বল্লালসেনই কর্তা, এবং তিনিই যেন ভূমিদান করছেন। তখন বিজয়সেনের বাষট্টি বছর শাসন চলছে, সুতরাং রাজা অতি বৃদ্ধ। এই শাসনে বিজয়সেন উল্লিখিত হয়েছেন 'বৃষভশঙ্কর' (পূর্ণ নাম 'অরিরাজবৃষভশঙ্কর') অর্থাৎ রাজা যেন শত্রু-রাজার পিঠে চ'ড়ে আছেন বৃষারূঢ় শিবের মতো। বল্লালসেন উল্লিখিত হয়েছেন 'নিঃশঙ্কশঙ্কর' (পূর্ণ নাম 'অরিরাজনিঃশঙ্কশঙ্কর'), অর্থাৎ প্রবলতম শত্রুকেও ভয় করেন না, শিবের মতো। বল্লালসেনের নিজস্ব ও লক্ষ্মণসেনের কোন তাম্রশাসনে এমন বিরুদ নেই, তবে "বৃষভশঙ্কর" নলের উল্লেখ আছে। সেনেরা যে ভূমি-পরিমাপ দণ্ড প্রবর্তন করেছিলেন তাতে এই বিরুদ দিয়েছিলেন। লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেনের ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে বিজয়সেন থেকে সকলেরই এই বিরুদ দেওয়া আছে। বিজয়সেন 'অরিরাজবৃষভশঙ্কর', বল্লালসেন 'অরিরাজ-নিঃশঙ্কশঙ্কর', লক্ষ্মণসেন 'অরিরাজমদনশঙ্কর' (অর্থাৎ যিনি অরিশ্রেষ্ঠকে ভস্ম করেছিলেন শিব যেমন মদনকে তেমনি), কেশবসেন 'অরিরাজ-অসহ্যশঙ্কর', এবং বিশ্বরূপসেন 'অরিরাজবৃষভাঙ্কশঙ্কর' (অর্থাৎ অরিশ্রেষ্ঠকে যিনি লাঞ্ছিত করেছেন বৃষারূঢ় শিব যেমন)।

সেন-রাজারা অত্যন্ত বদান্য ছিলেন, বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণদের প্রতি। দ্বাদশ শতাব্দীতে তাঁদের রাজ্যকালেই বাঙালীর সমাজে ব্রাহ্মণের একছত্র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে এঁরা কর্ণাট থেকে আগত, অব্রাহ্মণ। ('বল্লাল' নামটি কানাড়ী ভাষার শব্দ, সুতরাং মনে হয় যে বিজয়সেনের সময়েও তাঁদের পরিবারে কানাড়ী ভাষার শব্দব্যবহার অবলুপ্ত হয় নি।) বল্লালসেন পশ্চিম থেকে আগত ব্রাহ্মণদের মর্যাদা অনুসারে শ্রেণীবিভাগ ক'রে দিয়েছিলেন, এ কিংবদন্তী বহুকালের—অন্তত ষোড়শ শতাব্দী থেকে তো বটেই—এবং সত্য হওয়া খুবই সম্ভব। লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকরণিক হলায়ুধ ব্রাহ্মণের নিত্যকৃত্য নির্দেশ ক'রে বই লিখেছিলেন। লক্ষ্মণসেন গুণী ব্যক্তিদের সমাদর করতেন। বিজয়সেন, বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেন—

তিন পুরুষের নাম-যশ লোকের মুখে মুখে চ'লে এসেছিল,—বিজয়সেন নিষ্ঠাবান্ শিবভক্ত ব'লে, বল্লালসেন ব্রাহ্মণ-পোষক ব'লে, আর লক্ষ্মণ-সেন সর্বগুণসম্পন্ন রাজা ব'লে। বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেন পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। লক্ষ্মণসেন উপরন্তু ছিলেন কবি। আমাদের দেশের ইতিহাসে যে সব রাজার সম্বন্ধে খাঁটি খবর পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে লক্ষ্মণসেনকে সব চেয়ে সংস্কৃতিমান্ বলা যায়। লক্ষ্মণসেনের নাম-যশ উত্তরাপথের সর্বত্র এমন কি গুজরাট পর্যন্ত পৌঁছেছিল। বাংলা দেশে তিনি জয়দেবের পোষ্টা এবং গীতগোবিন্দের ভক্ত ব'লেই প্রসিদ্ধ। তাঁর বীরত্বের খ্যাতি জৈনদের কথা-গ্রন্থে এবং বিদ্যাপতির পুরুষ-পরীক্ষায় বর্ণিত আছে। তীরন্দাজরূপে লক্ষ্মণসেনের খ্যাতি সেকশুভো-দয়ার একটি গল্পে নিবদ্ধ আছে।

বিজয়সেন বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন ছাড়াও আর একজন সম-সাময়িকের খ্যাতি অধিকতর ব্যাপ্তিলাভ করেছিল। ইনি ছিলেন এই তিন পুরুষেরই মহামন্ত্রী এবং সে সময়ের শ্রেষ্ঠ কবি উমাপতিধর। উমাপতিধরের কবিখ্যাতি অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। এঁর অনেক কবিতা সদুক্তিকর্ণামৃত প্রভৃতি প্রাচীন কবিতা-সংকলন গ্রন্থে সংগৃহীত আছে। বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তি কাব্যটি এঁরই রচনা। বল্লালসেনের তাম্রশাসনের ও লক্ষ্মণসেনের একাধিক তাম্রশাসনে উমাপতিধরের হাত ছিল, অনুমান হয়। সেকশুভোদয়ার এবং মেরু-তুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণির (চতুর্দশ শতাব্দী) গল্প অনুসারে অনুমান হয় যে শেষ বয়সে উমাপতিধরের সঙ্গে লক্ষ্মণসেনের বিরোধভাব দাঁড়িয়েছিল। রাজা মহামন্ত্রীকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকালের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার অখণ্ড ইতিহাসে নূতন পালার প্রস্তাবনা শুরু হয়েছিল। বাংলায় তুর্কী অধিকারের প্রথম পদক্ষেপ পড়েছিল। তার আগেই বাংলা দেশে—এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে—উচ্চসমাজে ব্রাহ্মণশাসন দৃঢ়মূল হয়েছিল এবং সে শাসন

শাসনের অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক এবং কঠিন হ'য়েছিল। পরবর্তী দু-তিন শতাব্দীর মধ্যে এদেশে ব্রাহ্মণশাসনের আওতায় ব্রাহ্মণেতর জাতিবর্গের শ্রেণীবিভাগ ও তদনুযায়ী সামঞ্জস্য গ'ড়ে উঠতে থাকে। সেই ক্রিয়াকাণ্ডের গতি খানিকটা রুদ্ধ হয়েছিল চৈতন্যের ধর্মের দ্বারা এবং সে গতি সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে এল উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসনের ও ইংরেজী বিদ্যার ফলে॥

৮

ত্রয়োদশ শতাব্দী

তুর্কী লুটেরা-দলের অধিপতি মুহম্মদ্-ই বখ্ত্যার খিল্জি গোপনে প্রবেশ ক'রে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী অধিকার করেন এবং সুবৃদ্ধ রাজা সেখান থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হন। এই কাহিনী পাই মিন্হাজুদ্দীনের তবকাৎ-ই নাসিরি গ্রন্থে। এই ঘটনার চল্লিশ বছরের মধ্যেই মিন্হাজুদ্দীন-সিরাজ দিল্লী থেকে বাংলা দেশে এসেছিলেন এবং এখানে দু'বছর থেকে (১২৪২-৪৩) এখানকার ইতিহাস সংগ্রহ ক'রে তাঁর বই লেখেন (১২৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি)। সুতরাং এঁর বর্ণিত কাহিনী যে অনেকটাই সত্য হওয়া সম্ভব সে কথা স্বীকার্য। ম্লেচ্ছ সৈন্যের সঙ্গে লক্ষ্মণসেনের যুদ্ধ একাধিকবার ঘটেছিল এবং তিনি জয়লাভও করেছিলেন, একথা তাঁর প্রশস্তিকারেরা বলেছেন। আমরা সত্য ব'লে নিতে পারি। বখ্ত্যার খিল্জির গোপন আক্রমণের জন্য রাজা প্রস্তুত ছিলেন না, সেকথাও সত্য। এই দুটি সত্য যে অসমঞ্জস নয় তা দু-পক্ষের সাক্ষ্য থেকেই প্রতিপন্ন করা যায়। মিন্হাজ বলেছেন, রাজার বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও জ্যোতিষীরা মগধের বৌদ্ধ বিহার (নালন্দা) লুটের পর থেকেই লক্ষ্মণসেনকে বুঝিয়ে আস্‌ছিলেন যে অতঃপর যবনের অধিকার হবে। এমন কি তাঁরা বখ্ত্যার খিল্জির চেহারাও বিজয়ী যবনের চেহারা ব'লে প্রচার করেছিলেন। সেকশুভোদয়া থেকে বোঝা যায় যে তুর্কী আক্রমণের কিছুকাল আগে থেকেই লক্ষ্মণসেনের রাজ্যে মুসলমান দরবেশের আগমন ও জনমধ্যে প্রভাব বিস্তার শুরু হয়েছিল এবং তাঁর কোন কোন বিশ্বস্ত কর্মচারী মুসলমান দরবেশের প্রভাবে পড়েছিলেন। জ্যোতিষীর উপর আস্থা সেন-রাজাদের গোড়া থেকেই ছিল, তবে সে বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল লক্ষ্মণসেনের আমলে। তাঁর সভায় জ্যোতিষী ও গ্রহশান্তিকারীদের খাতির যেন সেনাপতিদের ও মহামন্ত্রীদের উপরে ছিল। এ অনুমান না ক'রে উপায় নেই যে লক্ষ্মণসেনের কোন কোন

মন্ত্রী ও উচ্চকর্মচারী তুর্কী অভিযানের পক্ষে, এখনকার ভাষায় ফিফ্‌থ্‌ কলাম্‌নিষ্টের মতো, কাজ করেছিল। সুতরাং কলঙ্ক লক্ষ্মণসেনের পলায়ন নয়, কলঙ্ক এঁদেরই একরকম বিশ্বাসঘাতকতার। সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে তখনকার দিনে মুসলমানের বিরুদ্ধে পরবর্তী কালের মতো বিদ্বেষবিরূপতা ছিল না। এর প্রমাণ উমাপতিধরের এই কবিতায় ম্লেচ্ছ যোদ্ধার শৌর্যপ্রশংসা,

সাধু ম্লেচ্ছনরেন্দ্র সাধু ভবতো মাতৈব বীরপ্রসূর্‌
নীচেনাপি ভবদ্‌বিধেন বসুধা সুক্ষত্রিয়া বর্ততে।
দেবে কুট্যতি যস্য বৈরিপরিষন্‌মারাঙ্কমল্লে পুরঃ
শস্ত্রং শস্ত্রমিতি স্ফুরন্তি রসনাপত্রান্তরালে গিরঃ॥

'সাধু ম্লেচ্ছরাজ সাধু! আপনার মাতাই যথার্থ বীরপ্রসবিনী। পতিত হ'লেও আপনার মতো লোকের জন্য পৃথিবী সুক্ষত্রিয়া রয়েছে। মারাঙ্কমল্লদেব (অর্থাৎ লক্ষ্মণসেন?) যখন সম্মুখ সমরে শত্রুমণ্ডল বিধ্বংস করছিলেন তখন আপনার জিহ্বাপত্রান্তরাল থেকে "হাতিয়ার, হাতিয়ার!" এই কথা স্ফুরিত হচ্ছিল॥'

বখ্‌ত্যার খিল্‌জি লক্ষ্মণসেনের তদানীন্তন রাজধানী নূদিয়ায় গোপন আক্রমণ চালিয়েছিলেন। এই নূদিয়া বা নোদিয়া স্পষ্টতই গঙ্গাতীরে, এবং পরবর্তী কালের নদিয়া ও নবদ্বীপের পূর্বরূপ। তবে প্রশ্ন এই যে নামটি আমরা অন্যত্র এবং আমাদের পুথিপত্রে বা শাসনপট্ট ইত্যাদিতে কখনও পাই নি কেন। অনুরূপ প্রশ্ন জাগে আর একটি নামে, পূর্বতন (বা স্থায়ী) রাজধানীর মিন্‌হাজুদ্দীন-উল্লিখিত নামে, 'লখনাওতী'তে। রামপাল 'রামাবতী' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মদনপাল 'মদনাবতী' স্থাপিত করেছিলেন। (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে পাদরি উইলিয়ম কেরী এইখানে, "মদনাবাটি"-তে, কিছুকাল ছিলেন, পরে শ্রীরামপুরে চ'লে আসেন।) সুতরাং লক্ষ্মণসেন যে লক্ষ্মণাবতী প্রতিষ্ঠা করবেন তাতে বিস্ময় কী? বিস্ময়ের কথা এই যে তবকাৎ-ই নাসিরি ছাড়া অন্যত্র

তখন এবং তার আগে এই নামের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। নূদিয়া-নোদিয়াও ঠিক তেমনি। বখ্‌ত্যার খিল্‌জি নূদিয়া ধ্বংস করে লক্ষ্মণাবতীকে "রাজধানী" করেছিলেন। মনে হয়, প্রাচীন গৌড়ের এক উপকণ্ঠ ছিল লক্ষ্মণাবতী। এবং লোকে তখন গৌড়কে লক্ষ্মণাবতীই ('লখনাউতী') বল্‌ত। মিন্‌হাজ সেই প্রচলিত নামটি নিয়েছিলেন। গঙ্গাতীরে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ("জয়াস্কন্ধাবার") ছিল ধার্যগ্রামে। এখান থেকে তাঁর দুটি শাসনপট্ট দেওয়া হয়েছিল। এ স্থান নামটির এখন কালানুযায়ী রূপ হ'য়েছে 'ধাইগাঁ', সাধুভাষায় পুনর্গঠিত রূপ 'ধাত্রীগ্রাম'। এই স্থান নোদিয়া (নবদ্বীপ) থেকে দশ বারো মাইল ভাটিতে। মিন্‌হাজের সময়ে বোধ হয় রাজধানী উত্তরে উঠে এসেছিল। বল্লালসেন ভাটপাড়ায় বামুন বসিয়েছিলেন, লক্ষ্মণসেন হয়ত নোদিয়ায়। আরও একটি কথা। মিন্‌হাজুদ্দীন গৌড়েশ্বরের নাম বলেছেন "রায় লখমনিয়া"। 'রায়' হল 'রাজা'র তদ্ভব রূপ, আর 'লখমনিয়া' লক্ষ্মণ নামের বিকৃত লৌকিক রূপ। মিন্‌হাজুদ্দীন রাজার লোকপ্রচলিত নামটিই নিয়েছেন। নামটি লোকপ্রচলিত হ'লেও হয়ত বাঙালী লোকের দেওয়া নয়, অবাঙালী লোকের দেওয়া। হয়ত বা নামটির মধ্যে "অলক্ষ্মণিক" ধ্বনি আছে। তাঁর জন্মসম্বন্ধে মিন্‌হাজ যে কাহিনীটি বলেছেন—তাঁর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃবিয়োগ ঘটে—সে গল্প এই নামটিরই সমর্থনে গ'ড়ে ওঠা ব'লে মনে হয়।

বঙ্গভূমিতে মুসলমানদের অধিকারের প্রথম প্রচেষ্টার কথা মিন্‌হাজ ছাড়া আর কেউ বলেন নি। এ বিবরণের জন্য মিন্‌হাজের উপরই নির্ভর করতে হবে। এঁর নূদিয়া-দখল বিবরণের সংক্ষিপ্তসার দিই।

বিহার দখল ক'রে পরের বছরে বখ্‌ত্যার এক সৈন্যবাহিনী খাড়া ক'রে নূদিয়া অভিযানে বেরুলেন। তিনি এত দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়েছিলেন যে যখন নূদিয়ার দ্বারদেশে উপনীত হলেন তখন সঙ্গে শুধু আঠারোজন অশ্বারোহী, বাকি সেনা সব পিছনে প'ড়ে। নগর প্রবেশ কালে বখ্‌ত্যার কোন বল প্রকাশ করেন নি, তিনি এমন স্বচ্ছন্দে ও ধীর

গতিতে নগরে ঢুকেছিলেন যে লোকে মনে করেছিল তারা সদাগর, বোধ হয় ঘোড়া বেচতে এসেছে। প্রাসাদে ঢোকবার আগে পর্যন্ত লোকে ভাবতে পারে নি যে ইনি মুহম্মদ বখ্ত্যার।[১] রায় লখ্মনিয়ার প্রাসাদে হঠাৎ ঢুকে প'ড়ে তিনি তলোয়ার খুলে বিধর্মীদের খুন করতে লেগে গেলেন। অতর্কিত আক্রমণে ত্রস্ত হ'য়ে রাজা ("রায়") খালি পায়েই প্রাসাদের পিছন দিক দিয়ে স'রে পড়লেন। বখ্ত্যারের বাহিনী এসে পৌঁছলে পর নগর এবং আশপাশ অধিকৃত হ'ল এবং তিনি সেখানে থানা গাড়লেন। রায় লখ্মনিয়া মুসলমান বাহিনীর কবল এড়িয়ে সঙ্কনাট (Sankanat) ও বঙ্গের অভিমুখে চলে গেলেন, কিন্তু সেখানে তাঁর আধিপত্যের কাল শীঘ্রই শেষ হ'য়ে গেল। (মিন্হাজ যখন এই বিবরণ লিখছিলেন তখন পর্যন্ত তাঁর—অর্থাৎ রাজার—বংশধরেরা বঙ্গের অধিপতি ছিলেন।) নূদিয়া অঞ্চল অধিকার ক'রে বখ্ত্যার নগরকে ধ্বংস ক'রে সেখানকার পাট উঠিয়ে "লখ্নাওতী" (=লক্ষ্মণাবতী) নামক স্থানে রাজধানী করলেন।

মিন্হাজের কোন কোন উক্তির তাৎপর্য ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা বুঝতে পারেন নি। আঠারো ঘোড়সওয়ার নিয়ে অতর্কিতে রাজপ্রাসাদ অধিকার অলীক অথবা অবিশ্বাস্য ব্যাপার নয়। আগেই আলোচনা করেছি যে লক্ষ্মণসেন অনেক অমাত্যকে চটিয়েছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি জ্যোতিষ তুকতাক ও ফকীর-দরবেশদের উপর আস্থাশীল হয়েছিলেন। মুসলমানেরা ভবিষ্যতে দেশাধিকারী হবে এমন জনরব সাধারণ লোকে হয়ত জানত এবং রাজার কানেও উঠেছিল। সুতরাং নোদিয়ায় লক্ষ্মণসেনের পরাভব যতই শোচনীয় হোক কিছুতেই অসঙ্গত নয়। নোদিয়া বৃদ্ধ রাজার গঙ্গাবাস ছিল, সুতরাং সেখানে সৈন্যবাহিনী বিশেষ ছিল না।

[১] মুহম্মদ-ই বখ্ত্যার খর্বকায় ও বিরূপদর্শন ছিলেন। সুতরাং সদাগর অথবা উদাসীন ফকীরের ভাব দেখানো তাঁর পক্ষে সহজ ছিল।

মিন্‌হাজের উক্তি অনুধাবন না ক'রে ঐতিহাসিকেরা বলেছেন যে লক্ষ্মণসেন সরাসরি বঙ্গদেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সেকথা ঠিক নয়। তিনি গিয়েছিলেন সঙ্কনাটে।[১] এইখানে তিনি শেষ কটা দিন কাটিয়েছিলেন। এই তথ্য মিন্‌হাজের কথায় স্পষ্টভাবে জানা যায়। এক সঙ্কনত (বা সঙ্কনড ?) গ্রামের উল্লেখ আছে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কাব্যের একটি প্রাচীন পুথির ভনিতায়, নিজের বংশপরিচয় উপলক্ষ্যে।

কৃত-রাজপ্রিয়া সত্র বেদগর্ব্ব আদিগোত্র
সজ্ঘনত পাসে রঘুপতি
বিখ্যাত মাধব ওঝা সাবর্ণ গোত্রের রাজা
কর্ণপুরে যাহার বসতি।[২]

বখ্‌ত্যার কর্তৃক নূদিয়া বিজয় কোন সালে হয়েছিল সে বিষয়ে মতানৈক্য আছে। তবে মোটামুটি বলা যায় যে ৫৯৬ হিজিরার (১২০০ খ্রীষ্টাব্দে) দিকে নূদিয়া আক্রান্ত হয়েছিল। নূদিয়া বিধ্বস্ত ক'রে বখ্‌ত্যার সেস্থান ছেড়ে দিয়ে পুরানো এবং যথার্থ রাজধানী লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) অভিমুখে ধাবিত হন এবং সেস্থান অধিকার ক'রে সেখানে থেকে গঙ্গার দুপাশে অধিকার বিস্তার করতে থাকেন। গঙ্গার পশ্চিম পারে রাঢ় অঞ্চলে বাধা পেয়েছিলেন ব'লেই বোধ করি বখ্‌ত্যার পূর্বদেশ (বরেন্দ্রী) বিজয়ে মন দিয়েছিলেন এবং অবিলম্বে তিব্বত-বিজয় উদ্দেশ্যে কামরূপের দিকে অভিযান চালিয়েছিলেন। এ অভিযান সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল এবং অসুস্থ হ'য়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেছিলেন ৬০২

১ মিন্‌হাজের উক্তি অনুসারে প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ ও ধনী বণিক অনেকে আগেই পূর্ববঙ্গ সমাশ্রয় করেছিলেন। নূদিয়া আক্রমণের ফলে লক্ষ্মণসেনের বংশধরদেরও বোধকরি সেই গতি হয়েছিল।

২ অনুমান করতে ইচ্ছা হয় যে এই সঙ্কনাট আধুনিক শাঁকনাড়া গ্রাম। বর্ধমান জেলায় দক্ষিণ পূর্বাংশে এই গ্রাম বহুকাল থেকে ব্রাহ্মণপণ্ডিত-অধ্যুষিত ছিল। গ্রামের সন্নিকটবর্তী 'রায়না' ও 'রায়নগর' গ্রাম-নাম দু'টিও অনুধাবনযোগ্য।

হিজিরায়। নূদিয়ায় মুসলমান অধিকার বখ্‌ত্যারের পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়েছিল। নূদিয়া এবং আশেপাশের অঞ্চল মুসলমানের দৃঢ় দখলে এসেছিল প্রায় পঞ্চান্ন বছর পরে। ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নূদিয়া দখল ক'রে ইখ্‌ত্যার-উদ্দীন (মুনীম্‌-উদ্দীন) য়ুজ্‌বক বিজয়জ্ঞাপক মুদ্রা প্রচার করেছিলেন। সপ্তগ্রাম অঞ্চল বিজিত হয় আরও প্রায় বছর চল্লিশেক পরে। একাজ করেছিলেন রুকন্‌-উদ্দীন কৈকাউস। এঁর সেনাপতি জফর খাঁ পাণ্ডুয়া-ত্রিবেণী অঞ্চলের মন্দির প্রাসাদ ইত্যাদি ধ্বংস ক'রে মসজিদ বানিয়েছিলেন ৬৯৮ হিজরায়। দরাফ খাঁ পীর নামে এঁর দরগা হিন্দুদের পূজা পেয়ে এসেছে। ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দে রাঢ়ে মঙ্গলকোট অঞ্চলে যে সেনবংশীয় রাজা ছিল তার প্রমাণ রয়েছে প্রাচীন শিলালেখের টুকরোয়। মনে হয় শিলালেখটি কোন দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি ছিল। একটি টুকরোয় "শ্রীচন্দ্রসেন নৃপ" পাওয়া গেছে।[১] পূর্ববঙ্গ অধিকার করতে মুসলমানদের ত্রয়োদশ শতাব্দী পেরিয়ে যেতে হয়েছিল। একাজ করেছিলেন শম্‌স্‌-উদ্দীন ফিরোজ শাহ (অধিকারকাল ১৩০২-২২)।

নোদিয়া জয়ের পর দেশে অখণ্ড রাজ্যের কাঠামো যা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকালের শেষের দিকে নড়বড়ে হ'য়ে এসেছিল—তা একেবারে ভেঙে পড়ল। তুর্কীরা দেশকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার ক'রে তবেই আবার নূতন কাঠামো খাড়া করেছিল। তাতে শতাধিক বৎসরেরও বেশি সময় লেগেছিল।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব শেষ হবার বেশ কিছুকাল আগে থেকেই রাজ-শাসনে কিছু শিথিলতা দেখা দিয়েছিল। রাজার বদলে মণ্ডলাধি-পতিরা তাম্রপট্ট দিয়ে ভূমি দান করছেন এমন উদাহরণ যথেষ্ট পাওয়া

[১] 'উজানি ও মঙ্গলকোট' প্রবন্ধ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস পালিত ও মণীন্দ্রমোহন বসু। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের কার্যবিবরণী দ্রষ্টব্য।

গেছে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকালে। মনে হয় লক্ষ্মণসেন নিজেই তাঁর কোন কোন উচ্চ কর্মচারীকে এ অধিকার দিয়েছিলেন। এখানে একটা ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মণসেনের যেসব শাসনপট্ট অখণ্ড পাওয়া গেছে, অর্থাৎ যাতে দানবৎসরের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, তার থেকে দেখা যায় সেগুলি সবই তাঁর দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত। লক্ষ্মণসেন দাতা ছিলেন, তিনি যে তৃতীয় রাজ্যাব্দের পর আর ভূমিদান করেনি এমন ধারণা নিতান্ত অসঙ্গত। মনে হয় তিনি এমন সব ঝঞ্ঝাট অপরের উপর নিক্ষেপ করেছিলেন। বিশ্বরূপসেনের একটি তাম্রশাসনে কুমার শ্রীসূর্যসেন ও কুমার শ্রীপুরুষোত্তমসেন প্রদত্ত ভূমির উল্লেখ আছে। এঁরা লক্ষ্মণসেনের আত্মীয় এবং তাঁর প্রতিরাজ অথবা মহামাণ্ডলিক ব'লে অনুমান হয়। লক্ষ্মণসেনের রাজ্য তুর্কী লুটেরার দ্বারা আক্রান্ত হবার বেশ কিছুকাল আগে থেকেই তাঁর কোন কোন মহামাণ্ডলিক (অর্থাৎ আঞ্চলিক শাসনকর্তা) স্বাধীন রাজার নাম নিয়ে, অথবা না নিয়েই, স্বাধীন রাজার মতো ব্যবহার করতেন। সুন্দরবন রাক্ষসখালি অঞ্চলে পাওয়া একটি ভূমিদানপট্ট থেকে এই অনুমান করা হয়েছে। পূর্ব খাটিকার অন্তর্গত দ্বারহাটা থেকে এই শাসন দিচ্ছেন "মহাসামন্তাধিপতি মহারাজাধিরাজ" শ্রীমৎ ডোম্মনপাল তাঁর সৎমিত্র বাসুদেবশর্মাকে। দানের বিষয় হ'ল একটি গ্রাম, নাম "শ্রীধামহিঠা" (?)। এঁর পিতা ছিলেন "মহামাণ্ডলিক শ্রীশ্রী···"পাল। দলিলটিতে তারিখ আছে, ···বৈশাখ ১১১৮ শকাব্দ (১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

লক্ষ্মণসেনের পর তাঁর দু' পুত্র কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন সমতটে (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে) রাজত্ব করতে থাকেন। মিনহাজুদ্দীনের সাক্ষ্য অনুসারে সেন-বংশের রাজত্ব পূর্ববঙ্গে ১২৪২ খ্রীষ্টাব্দেও অনবলুপ্ত ছিল। কেশবসেনের শাসনে পাওয়া যায় যে তাঁর মাতা ছিলেন চন্দ্রাদেবী, আর বিশ্বরূপসেনের একটি শাসনে তাঁর মায়ের নাম পাওয়া যায় তাড়াদেবী, অপর শাসনে ত্যষ্টনদেবী বা অষ্টন দেবী ("শ্রীমত্ত্যষ্টনদেবী")। লক্ষ্মণসেনের যে দুই পত্নী ছিল তার উল্লেখ বিশ্বরূপসেনের দুটি শাসনেই

আছে ("সপত্ন্যৌ", "সপত্ন্যোর্দ্ধয়ং")। (বিশ্বরূপসেনের শাসনে অনপেক্ষিতভাবে মাতার সপত্নীর উল্লেখ সন্দেহ জাগায়। আরও সন্দেহ জাগায় দুটি শাসনে নামের ভিন্নতা। 'ত্যষ্টন' (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পড়িয়াছিলেন 'টট্টন') সম্ভবত 'তাড়া'-র সংস্কৃতরূপ দিবার চেষ্টার ফলে। 'তাড়া' নাম, তখনকার কোন অভিজাতবংশের কন্যার নাম হওয়া সম্ভব নয়। সেকশুভোদয়ার ইঙ্গিত আছে যে শেষ বয়সে রাজা তুচ্ছকুলজাত রানী "বল্লভা"-র (—এটি নাম নয়—) দাস ছিলেন। অনুমান করতে ইচ্ছা হয় যে কেশবসেনের পর তাঁর আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত ক'রে বিশ্বরূপসেন সিংহাসন অধিকার করেছিলেন এবং সে অধিকার যে ন্যায়সঙ্গত তা জানাবার জন্যই তিনি স্বীয় জননীর নাম ও তাঁর সপত্নীর উল্লেখ করেছেন।)

সমতটের কতটুকু সেন-বংশের অধিকারে ছিল তা বলা যায় না। তুর্কীরা পূর্ববঙ্গে হানা দিচ্ছিল কিন্তু অনেকদিন কিছু সুবিধা করতে পারে নি। পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে স্বাধীন রাজত্ব গ'ড়ে উঠেছিল, কোথাও কোথাও বা আগে থেকেই স্বাধীনতা ছিল। সমতটের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল আগে থেকে হরিকেল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে রণবঙ্কমল্ল[১] নামে এক স্বাধীন হরিকেল-রাজার শাসনপট্ট পাওয়া গেছে। এঁর রাজধানী ছিল পট্টিকের (বা পট্টিকেরা),—এখানে বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার ছিল। (পরে এই স্থাননামটি নিয়ে যোগীদের সাহিত্যিক ঐতিহ্য, ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র কথা, গড়ে উঠেছিল। এই স্থান এখন 'ময়নামতী' বা 'লালমাই' নামে প্রসিদ্ধ।) ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝখানে পূর্ব সমতট অঞ্চলে এক শক্তিশালী রাজবংশের উদ্ভব হয়েছিল। এঁদের নামের শেষে আছে "দেব" এবং এঁরা ছিলেন

[১] ঐতিহাসিকেরা বলেন এঁর নাম ছিল "রণবঙ্কমল্ল শ্রীহরিকালদেব", কেননা এই কথাই শাসনপট্টে আছে। কিন্তু "শ্রীহরিকালদেব" ব্যক্তিনাম ব'লে মনে হয় না, মনে হয় হরিকালের ঈশ্বর। দেশনামের আগে "শ্রী" ব্যবহার শাসনপট্টে অজ্ঞাত নয়।

বিষ্ণু-উপাসক। এই বংশের রাজা দামোদরদেবের প্রদত্ত তিনখানি শাসনপট্ট পাওয়া গেছে। এগুলির দানকাল ১২৩৬ থেকে ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দ। দামোদরদেবের একটি শাসনে (১১৫৮ শকাব্দে = ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত) এঁর যে দূতক ছিলেন, গৌতমদত্ত, তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ("শ্রীগৌতমাঙ্ঘ্রিপর")। সমতট অঞ্চলে তখনও বৌদ্ধমতের বিলোপ যে ঘটে নি, এর থেকে তা বোঝা যায়।

লক্ষ্মণসেনের বৃদ্ধাবস্থায় তাঁর রাজ্যশাসনে স্বভাবতই ভাঙন দেখা দিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে উমাপতিধর প্রভৃতি মন্ত্রীর মতানৈক্যের গল্প-গুলিতে সেই ইঙ্গিত স্পষ্টভাবে আছে। বাংলা দেশের বাইরে লক্ষ্মণসেন মুসলমান-শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং বিজয়ীও হয়েছিলেন। কিন্তু পূর্বদেশ আক্রমণকারী বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে স্থায়ী কোন প্রচেষ্টা বা জোটবাঁধা তিনি করেন নি—এ অনুমান অসঙ্গত নয়। এ অনুমানের পক্ষে অনেক যুক্তিও আছে। আগেই বলেছি যে সে সময়ে গৌড় রাজসভায় জ্যোতিষীর প্রভাব বেশিরকম পড়েছিল। ইতিমধ্যে কল্কি-অবতারের—ঘোড়ায় চড়া যোদ্ধা-বেশী বিষ্ণুর—গল্পও খুব ছড়িয়ে পড়ে-ছিল। মুসলমান দরবেশ-ফকীরদেরও প্রভাব দরবারে এবং দরবারীদের আওতায় পড়তে শুরু হ'য়ে গিয়েছিল। এইসব নানা কারণে মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে কোন রকম চেষ্টাই দেখা দেয় নি। সুতরাং জনগণের চিত্তে মুসলমান-শক্তি বিধাতার বিধান সুতরাং অবশ্যম্ভাবী মনে হয়েছিল। প্রায় চার-পাঁচ শ বছর পরে একটি লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের ছড়ায় এই ভাবনার ছবি উঠেছে। সেখানে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার দেখে স্বয়ং পরমেশ্বর তাঁর দলবল নিয়ে মুসলমান সেজে হানা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বিচার-ব্যবস্থায় ও রাজস্ব-সংগ্রহে মুসলমান-শক্তি হিন্দুদের, বিশেষ করে প্রাক্তন রাজকর্মচারীদের, সহায়তা পেয়েছিল। হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ বিহার দুইই মুসলমান-শক্তি বিধ্বস্ত করেছিল। তবে মন্দির ধ্বংসে তত ক্ষতি হয় নি যত হয়েছিল বিহার-ধ্বংসে। দেবমন্দির

আবাসিক ছিল না, দেবকুল আবাসিক ছিল। দেবকুল আবাসিক ছিল বটে তবে সেখানে অধিবাসী স্বল্প। কিন্তু বৌদ্ধ বিহারগুলি সব জনপূর্ণ আবাসিক ছিল। দেবমন্দির বা দেবকুল রক্ষার্থে কোন চেষ্টা হয়েছিল ব'লে মনে হয় না, তবে বিহার রক্ষায় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও তাঁদের শিষ্যরা যে যথাসাধ্য যত্নবান্ হয়েছিলেন তা অনুমান করি, এবং সেই কারণেই বিহার যেমন বিধ্বস্ত হ'ল আবাসিক বৌদ্ধরাও সেইসঙ্গে নিহত হয়েছিল। বিহার শুধু দেবপূজার আগার ছিল না, বিদ্যাচর্চ্চার ভাণ্ডারও ছিল। সুতরাং বৌদ্ধবিহার ভূমিসাৎ হওয়ার ফলে সেই অঞ্চলে বিদ্যার ভাণ্ডারও ধূলিসাৎ হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক বড় বৌদ্ধ পণ্ডিত জন্মেছিলেন বরেন্দ্রীতে। নাম রামচন্দ্র কবিভারতী। ইনি বোধ করি বাধ্য হয়েই দেশ ছেড়ে সিংহলে চ'লে গিয়েছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান-শক্তির আবির্ভাবে যে সংঘাত হয়েছিল তা প্রচণ্ড সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সংঘাতের ঢেউ সাধারণ মানুষের জীবনে বেশি বিপর্যয় আনে নি। তার বড় প্রমাণ পাই ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষার উন্নতিতে। মুসলমানেরা বাংলা শিখে তা ব্যবহার করত এবং হিন্দুরাও ফারসী শিখে তা ব্যবহার করত। এইকারণে দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলা ভাষা তার অপভ্রংশের ছেঁড়া খোলসটুকু দ্রুত ঝেড়ে ফেলে চতুর্দশ শতাব্দীতে আমাদের পরিচিত রূপ গ্রহণ করেছিল। ফারসীর সংঘাতেই বাংলার কতকগুলি বিশিষ্ট ইডিয়ম দানা বেঁধে উঠেছিল এবং চৌপই ছন্দ পয়ারে প্রবহমাণ হয়েছিল॥

ধর্মে

১

খ্রীষ্টপূর্ব কাল

বৈদিক সাহিত্যে যে ধর্মমতের প্রকাশ আছে তা আগাগোড়া একরকম নয়। এ সাহিত্যে তিনটি প্রধান স্তর—সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ্। সংহিতায় আছে দেবারাধনার স্তবস্তুতি, ব্রাহ্মণে আছে যজ্ঞে দেবারাধনার রীতি ও তদুপলক্ষ্যে যাজক-যজমানদের অনুষ্ঠেয় উৎসবের বিধান। দেবারাধনার উদ্দেশ্য ছিল সাংসারিক জীবনে সুখলাভ, পুত্রপৌত্রাদির মাঙ্গল্য, গোরু-ঘোড়ার নিরাময়, আপনাদের দীর্ঘায়ু কামনা এবং জীবনান্তে পিতৃলোকে স্বাচ্ছন্দ্য। আগাগোড়া দেহি দেহির ব্যাপার, তবে একতরফা নয়, (গীতার উক্তি অনুসারে)

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরম্ অবাপ্স্যথ ॥

'এইভাবে দেবতাদের ভাবনা কর, সেই দেবতারাও তোমাদের ভাবনা করুন। পরস্পর ভাবনা ক'রে (দেবতা ও তোমরা উভয় সম্প্রদায়) পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হও ॥'

উপনিষদের বাণী কিন্তু সংহিতা ও ব্রাহ্মণের কথার সঙ্গে একটুও মেলে না। এখানে দেবতার কোন প্রসঙ্গই নেই। আছেন এক ব্রহ্ম, তিনি সবকিছু এবং সবকিছু ছাড়াও অতিরিক্ত। ব্রহ্ম ঈশ্বর নন, তাঁকে ধ্যানে ছোঁয়া যায় না, কোন যজ্ঞ বা তপস্যার দ্বারাও পাওয়া যায় না। যে পায় সে এমনিই পায়, এবং সে পাওয়া অনুভূতিসঞ্জাত বোধে।

সংহিতা-ব্রাহ্মণের ও উপনিষদের চিন্তার মধ্যে যে মৌলিক অমিল তার কিছু সঙ্গতি পাওয়া যায় ব্রাহ্মণের দেবাসুরবিরোধ-গল্পগুলির তলায়। দেবতারা যজ্ঞ-উৎসবপরায়ণ, অসুরেরা ব্রহ্মবিচার-পরায়ণ। উপনিষদ্গুলির পটভূমি পূর্বভারতে পরিকল্পিত। পূর্ব-ভারত অসুরদের অধিকারে ছিল, সুতরাং উপনিষদের ব্রহ্মবাদকে আসুর-চিন্তা বলা যায়।

আগেই বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ্য মতের পরিপন্থী জৈন মত ও ভিক্ষু মত পূর্বভারতে মগধ-বিদেহ অঞ্চলে উদ্ভূত হয়েছিল। এই দুই মতে দেবপূজা নেই, তবে তপস্যার প্রয়োজন আছে—সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হবার জন্যে। দুই মতেরই উদ্দেশ্য সারতত্ত্ব উপলব্ধি ক'রে জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খল ছিন্ন করা। জৈন মত তপস্যার দিকে বেশি দৃষ্টি দিয়েছে, বৌদ্ধ মত জ্ঞানের পথ নিয়েছে। বৌদ্ধ মতের বোধি, উপনিষদের ব্রহ্মবোধ। ফল উভয়ত্রই এক—নির্বাণ (দীপের সাদৃশ্যে) ও মুক্তি (শৃঙ্খলের সাদৃশ্যে)।

আমাদের দেশে কালানুগত ইতিহাসের আরম্ভ অশোকের সময় থেকে। তাঁর অনুশাসনগুলি আমাদের সবচেয়ে পুরানো ইতিহাসের প্রমাণপত্র। অশোকের কোন অনুশাসনে বঙ্গভূমির উল্লেখ নেই। তিনি কলিঙ্গ জয় করেছিলেন এবং সে দেশের লোকের জন্যে দুটি অনুশাসন উৎকীর্ণ করেছিলেন। কলিঙ্গ বঙ্গভূমির দূর প্রতিবেশী নয়। সেকালে দুটি দেশের ভাষা ও লোকব্যবহার একই রকম ছিল ব'লে মনে হয়। একথা আগেই বলেছি। কলিঙ্গ আক্রমণের ফলে কলিঙ্গের খুব ক্ষতি হয়েছিল। সেই অনুতাপে অশোক কলিঙ্গ অনুশাসন দুটিতে কলিঙ্গের প্রজাদের আশ্বাস দেবার জন্যে কিছু ভালো কথা বলেছেন। অশোক নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁর এই অনুশাসন যেন তিষ্য নক্ষত্রের উৎসবে অবশ্যই পড়িয়ে শোনানো হয়। তিষ্য নক্ষত্রের উৎসব হ'ল পৌষমাসে ফসল তোলার উৎসব। কলিঙ্গে যেমন বঙ্গভূমিতেও তেমনি এই উৎসব প্রচলিত ছিল। এদেশে এখনও তার জের রয়েছে "তুসু (টুসু)", "তুষ তুসুলি" ইত্যাদি নামের মেয়েলি লৌকিক অনুষ্ঠানে। তিষ্য (বা তিষ্যা) নক্ষত্রের নাম পরে পরিবর্তিত হয় "পুষ্যা" (ফসল তোলার সময়—এই লোক ব্যুৎপত্তির ফলে, পুষ্ ধাতু থেকে)। বাংলা 'তুষু' এসেছে 'তিষ্যা' ও 'পুষ্যা' নাম দুটির জোড়-কলম থেকে। 'তুসুলি'ও এসেছে এই ভাবে এবং 'পৌষলি'-র সাদৃশ্যে।

অশোকের অনুশাসনে পূর্ব-ভারতের লোক-ব্যবহার সম্বন্ধে এই একটিমাত্র খাঁটি খবর পাওয়া গেল।

বাংলা দেশে (তথা পূর্বভারতে) আর্য ভাষা যখন থেকে এসেছিল তখন থেকে আমাদের ইতিহাসের ভিত গাঁথা শুরু। তার আগে এদেশের ব্যাপার যেন ইতিহাসের ভিতের তলাকার বোনেদ। সে বোনেদ অনেক কালের, হয়ত একাধিক সহস্রাব্দীর, অজ্ঞাতের ও অজ্ঞাতব্যের মৃত্তিকা-গর্ভে বিলীন। আর্য ভাষার এবং সেই ভাষাবাহী জনগণের আবির্ভাব এদেশে কখন ঘটেছিল তাও জানা যায়নি। যা কিছু অনুমান করা হয় তা হ'ল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী, অর্থাৎ অশোক অনুশাসনগুলির কাল, কেন্দ্র ক'রে। একটি ছোট ভগ্ন শিলালিপি ছাড়া এদেশে সম-সাময়িক লিখিত দলিল পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় চতুর্থ দশক থেকে। তখন থেকেই আমরা এদেশের লোকের—উচ্চস্তরের—ধর্মবিশ্বাসের খণ্ড ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত পরিচয় কিছু কিছু পাই। তার আগেকার সময়ে অবস্থা আন্দাজ করতে পারি। আর্য ভাষা যখন এসেছে আর্যভাষীদের দ্বারা বাহিত হয়ে তখন সেই সঙ্গে আর্যভাষীর ধর্মমতও এসেছে। যদি অনুমান করি যে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বা তার কিছু আগে এদেশে আর্য ভাষীরা এসেছিল তাহ'লে ধ'রে নিতে হবে যে এখনকার আর্যভাষীদের ধর্মমত, বৈদিক-অবৈদিক দেবদেবীর উপাসনা রীতি, সেই সঙ্গেই এদেশে চলিত হয়েছিল। তার পরে এসেছে পূর্বভারতে উদ্ভূত দুটি বিশিষ্ট বেদ-বিরোধী ধর্মমত, বৌদ্ধ ও জৈন মত। এ মত দুটি পুরোপুরি অধ্যাত্ম-চিন্তামূলক। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী, যখন থেকে আমাদের ইতিহাসের গোড়াকার ছিন্নপত্রাবলীর টুকরা মিলছে, তখন এদেশে দেবপূজা এবং বৌদ্ধ ও জৈন মত সবই সমভাবে বিদ্যমান ছিল।

এদেশের দেবপূজা-রীতিতে নূতন, অর্থাৎ সংস্কৃত শাস্ত্র-পুরাণে তখনও অপ্রাপ্ত, কিছু কিছু নূতন পূজ্য বস্তু দেখা দিয়েছিল। এখনও সেগুলির

কোন কোনটি ব্রাহ্মণ্য মতে স্বীকৃত দেখা যায়। যেমন বৃক্ষপূজা (তুলসী, বিল্ব, সিজ) ও স্তূপ এবং পর্বত পূজা।

মধ্যবঙ্গের মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ভগ্ন শিলাচক্রলিপিটি এদেশে প্রাপ্ত প্রাচীনতম প্রত্নলেখ, সেকথা একাধিকবার বলেছি। এই লেখটির সমসাময়িক অর্থাৎ আনুমানিক তৃতীয় (অথবা চতুর্থ ?) খ্রীষ্টপূর্বাব্দে লেখা সেইরকম ভাবার্থের একটি তাম্রপট্টলেখ পাওয়া গিয়েছিল পশ্চিম বিহারে গোরখপুর জেলায় সোহ্‌গৌরা গ্রামে। এই গ্রাম তখনকার দিনের বৃহত্তর বাংলা দেশের সীমানার বেশি বাইরে ছিল না যেহেতু দুটি লেখেরই ভাষা একরকম। সোহ্‌গৌরা গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রপট্টলেখটির শীর্ষে একসারি চিত্র অঙ্কিত আছে। ইতিহাসের উপাদান হিসাবে অদ্যাবধি ঐতিহাসিকদের উপেক্ষিত এই চিত্রগুলি অত্যন্ত মূল্যবান্। এই প্রত্নলিপির পরিচয় উপলক্ষ্যে চিত্রগুলির বিবরণ আগে দিয়েছি। এখন আবার দিই।

প্রথমে একটি চৌখুপি চতুষ্কোণ টবের উপরে একটি তিনপাতা-যুক্ত গাছ। পাতা ত্রিকোণাকৃতি, সূক্ষ্মাগ্র। তারপর একটি খড়ের আটচালা চারটি বাঁশের খুঁটির উপর, উপরের চাল থেকে তিনটি দণ্ড বেরিয়ে আছে। তারপর একটি দণ্ড, দণ্ডের মাথা ত্রিকোণাকৃতি বৃক্ষপত্রের মতো, তবে সূক্ষ্মাগ্র নয়। তারপর তিনটি দীর্ঘ অর্ধ-বৃত্তের পিরামিডের উপরে অর্ধবৃত্ত ও তারমধ্যে একটি বিন্দু। তারপর উপর পানে একটি গোলক, তার উপর একটি দীর্ঘ অর্ধবৃত্ত, সে অর্ধবৃত্তের খোঁচ দুটির উপর ছোট পাতের মতো লাগানো। তারপর একটি ছ-খুপি চতুষ্কোণ টবের উপর পত্রহীন বক্রকাণ্ড বৃক্ষ। তারপর আবার একটি খড়ের আটচালা, চার খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে, উপরে তিনটি দণ্ড বেরিয়ে আছে। প্রথম আটচালাটির তুলনায় এই শেষ আট-চালাটি কিছু বড়। ('নিদর্শনে' চিত্র দ্রষ্টব্য।)

আটচালা দুটি মণ্ডপ এবং স্কম্ভাগার, তাই মাটির দেওয়ালের বদলে বাঁশের খুঁটি। আমাদের দেশে আগাগোড়া তৈরি আবাসগৃহের এই সব

চেয়ে পুরানো নক্‌শা। ঠিক এই রকমের বারোয়ারি আটচালা এখনো দেখা যায়। প্রথম গাছটি তুলসী গাছ হ'তে পারে, দ্বিতীয় গাছটি মনসা সিজ হওয়াই সম্ভব। এই গাছে অথবা গাছের তলায় পশ্চিমবঙ্গে এখনো মনসা-পূজা হয়। দণ্ডটি কোন লাঞ্ছন হ'তে পারে, অস্ত্র হ'তে পারে, নৌকার দাঁড় বা কেরোয়ালও হ'তে পারে। চন্দ্রবিন্দুশীর্ষ অর্ধবৃত্তের পিরামিডটি স্থাণ্বীশ্বরের অথবা বাস্তুস্তূপের প্রতীক হওয়া সম্ভব। গোলক ও অর্ধবৃত্তাকার পাত্রটির অর্থ অনুমান করা দুরূহ॥

২

দেবপূজা

এদেশে বিষ্ণুপূজার সাক্ষ্য প্রাচীন দলিলগুলির মধ্যে—মহাস্থান চক্রলিপি বাদে—ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যায়। বিষ্ণু নানা ভাবে ও রূপে পূজিত হ'তেন এবং তাঁর নামের বিশিষ্ট অংশ ছিল 'স্বামী' (অর্থাৎ এখনকার 'ঠাকুর')। শুশুনিয়া গুহাতে বিষ্ণুচক্রের চিত্র আছে, পাশে লেখা আছে "চক্রস্বামিন...." (অর্থাৎ 'চক্রধারী ঠাকুরের...')। পঞ্চম শতাব্দীর তাম্রশাসনপট্টে পাই 'কোকামুখস্বামী'র ও 'শ্বেতবরাহ স্বামী'র দুটি ছোট দেউলের ("কোষ্ঠিকাদ্বয়ং" "দেবকুলকোষ্ঠিকা") উল্লেখ, আর একটি তাম্রশাসনপট্টে পাই শিবনন্দী প্রতিষ্ঠিত 'গোবিন্দ-স্বামী'র দেউলের উল্লেখ। বঙ্গ-সমতটের বৌদ্ধ চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রের পৌত্র লডহচন্দ্র (একাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদ) পট্টিকেরে 'লডহমাধব' নামে কৃষ্ণ-বিষ্ণু (?) মূর্তি প্রতিষ্ঠা কল্লে কিছু ভূমিদান করেছিলেন। ময়নামতীতে প্রাপ্ত তাঁর দুটি তাম্রপট্টে এই দেবমূর্তি-প্রতিষ্ঠার এবং ভূমিদানের কথা আছে।[১] 'লডহ' মানে কমনীয়কায়। রাজা যদি নিজের নামে দেবতা প্রতিষ্ঠা ক'রে থাকেন তবে বিষ্ণুমূর্তি হ'তে পারে, আর যদি কমনীয়কায় অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে তবে কৃষ্ণমূর্তি—বালক অথবা গোপালমূর্তি—হওয়াই বেশি সম্ভব। মনে রাখতে হবে যে পট্টিকের-হরিকেল অঞ্চলে কৃষ্ণলীলা-কাহিনীর সমাদর অধিক ছিল। লডহচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র 'নট্টেশ্বর' শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

লডহচন্দ্রের একটি শাসনপট্টে দেবকুলে (অর্থাৎ দেবতার পূজারীর, জোগানদারদের ও অতিথির আশ্রয়ে) প্রদত্তভূমির চৌহদ্দি বর্ণনায় আগেকার প্রতিষ্ঠিত শিবঠাকুরের ভূমির উল্লেখ আছে ("শঙ্কর ভট্টারক-

[১] *Epigraphic Discoveries in East Pakistan*, D. C. Sircar, Sanskrit College, Calcutta,

ভুজ্যমান-ভূমেঃ”), দ্বিতীয় শাসনপট্টে এইভাবে বৌদ্ধ দেবতা লোকনাথের ভূমি উল্লিখিত (“লোকনাথ-ভট্টারকীয় শাসনভূমেঃ”)। এই সব প্রতিষ্ঠান চালাবার জন্যে প্রতিষ্ঠাতারা, তাঁদের উত্তরাধিকারীরা অথবা অন্য লোকে, প্রয়োজনমতো ভূমিদান করতেন, সেকথা এই অনুশাসন-গুলি থেকে জানতে পারি। নানা ভাবে শিবের পূজাও বহুকাল থেকে নিশ্চয়ই চ'লে এসেছিল। তার সাক্ষ্য পাই পঞ্চম শতাব্দীর তাম্র-শাসনপট্টে প্রাপ্ত এই নামগুলিতে,—শিবশর্ম, শিবনন্দী, স্তম্ভেশ্বরদাস, স্থাণুনন্দী ; এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর পট্টগুলিতে—রুদ্রদত্ত, স্থাণুদত্ত, স্কন্দপাল। শিবালয়ের জমির উল্লেখ পাই (“প্রদ্যুম্নেশ্বর-দেবকুলক্ষেত্র”) ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দশকের এক অনুশাসনে (গুণইঘর তাম্রশাসনপট্ট)।

‘ভগবান্ সহস্ররশ্মি’র অর্থাৎ সূর্যের দেবকুল প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে ১২৮ গুপ্তাব্দে প্রদত্ত জগদীশপুর তাম্রশাসনে।[১] পৌণ্ড্রবর্ধনে গুল্মগন্ধিকা গ্রামে আগে থেকেই জৈন বিহার ছিল। সেখানে এই সূর্যের দেউল বোধ হয় নূতন প্রতিষ্ঠা।

পাশুপত শৈব আচার্যদের জন্য মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নারায়ণপাল (নবম শতাব্দীর শেষ)। তারপরে শিবমূর্তি-প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পাই চন্দ্রবংশীয় শ্রীচন্দ্রের প্রপৌত্র গোবিন্দচন্দ্রের (একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) তাম্রপট্টে (ময়নামতীতে প্রাপ্ত)। ইনি সমতটের একস্থানে ‘নট্টেশ্বর’ শিব প্রতিষ্ঠা ক'রে কিছু ভূমিদান করেছিলেন।[২] বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে ইনি (একাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে) অত্যন্ত জাঁকজমকে ‘প্রদ্যুম্নেশ্বর’ শিব ও তাঁর বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিজয়সেনের বংশ ছিল

---

১ ঐ, পৃ ৮০।

২ দীনেশবাবু ভুল করেছেন (পৃ ৪৬), পিতা লডহচন্দ্র ও পুত্র গোবিন্দচন্দ্র কেহই তাম্রপট্টে নিজেদের “পরমসৌগত” বলেন নি। এঁরা ব্রাহ্মণ্যমতাশ্রিত ছিলেন। লডহচন্দ্রের তাম্রপট্ট “নমো ভগবতে নারায়ণায়” দিয়ে আরম্ভ

শৈব, তাঁদের রাজকীয় লাঞ্ছন ছিল সদাশিব মূর্তি। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনের রাজ্যকালেও লিঙ্গপূজক পাশুপতাচার্যদের একটি মঠ কজঙ্গল অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল। এইরকম এক মঠপতি চিহোককে পাশুপত সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য দমচাদিত্য শিবলিঙ্গ আবৃত রাখবার জন্যে একটি ধাতুনির্মিত ঢাকা ("তাম্রখোলি") দিয়েছিলেন বল্লালসেনের নবম রাজ্যাঙ্কে।[১]

অষ্টম শতাব্দীর অনুশাসন থেকে একটি এমন নারী দেবতার ইঙ্গিত পাই যা এদেশের আর কোন রচনায় উল্লিখিত হয় নি। ধর্মপালের খালিমপুর অনুশাসনে প্রদত্ত গ্রামের সীমা বর্ণনায় "কাদম্বরী দেবকুলিকা" (অর্থাৎ কাদম্বরীর ছোট দেউল) উল্লিখিত আছে। এই দেবী হলেন বারুণী মদ্যভাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বরুণের স্ত্রী বা ভগিনী, পরে সরস্বতীর এক রূপ। কালিদাসের শকুন্তলায় (বঙ্গীয় পাঠে) জেলে-পুলিশ দৃশ্যে এই দেবীর উল্লেখ আছে ("কাদম্বলী-শদ্ধিকে কৃখু পঢমং অম্মাণং শোহিদে ইশ্চীঅদি। তা শুণ্ডিকাগালং যেব গশ্চম্ম।"— 'আমাদের প্রথম ভাব ক'রতে হয় কাদম্বরীকে পূজা দিয়ে। তাই শুঁড়িবাড়িই যাই চল।')। ধর্মপালের মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্মা নন্ননারায়ণের দেবকুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই দেবকুল পরিচালনার জন্য উল্লিখিত ভূমিদান হয়েছিল। নন্ননারায়ণ যদি অনন্তনারায়ণের বিকৃত পাঠ না হয় তবে সম্ভবত বামন-বিষ্ণু।

অন্য ধর্মের প্রসঙ্গ তোলবার আগে দেবপূজার অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্বের কথা বলতে হয়। ব্রাহ্মণ্য মতের সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন মত এদেশে আলোচ্য সময়ে সমভাবে প্রচলিত ছিল। কালের গতিতে ব্রাহ্মণ্য মত বৌদ্ধ ও জৈন মতকে যথাসাধ্য আত্মসাৎ ক'রে ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ হবার আগেই একছত্র হয়েছিল। কিন্তু ধর্মমত তিনটি নিয়ে জনসমাজে, সম্ভবত জনসংসারেও, কোন বিরোধ বাধে

[১] *Ephigraphia Indica* XXXIII প্রবন্ধ সংখ্যা ১৬ (দীনেশবাবু লিখিত) দ্রষ্টব্য।

নি। বিরোধ ঘটত দু'মতের পণ্ডিতদের দার্শনিক-তার্কিকতার মধ্যে। বৌদ্ধ মহাযানীরা তর্কশাস্ত্রে প্রবীণ ছিলেন, বাংলায় ও মিথিলায় অনুশীলিত নব্য-ন্যায় বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রেরই অনুবৃত্তি। সমাজে-সংসারে বৌদ্ধ ও জৈন মত নিয়ে ব্রাহ্মণ্য মতের যে সংঘাত হয় নি তার যথেষ্ট প্রমাণ ঐতিহাসিক দলিলগুলিতে পাওয়া যায়। জগদীশপুর তাম্রশাসনে দেখি যে ভোয়িল নামে এক ব্যক্তি জৈন বিহারে এবং সূর্য-দেবকুলে ("শাম্বপুরে") ভূমিদান করছেন। পাহাড়পুর তাম্রশাসনে পাই যে ব্রাহ্মণ নাথশর্মা ও তাঁর পত্নী রামী বটগোহালীর জৈন[১] বিহারে প্রতিমার সেবাপূজার জন্য ভূমি দান করছেন। গুণইঘর তাম্রশাসন (ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দশক) থেকে জানা যায় যে মহারাজ রুদ্রদত্ত মহাযানিক শাক্যভিক্ষু শান্তিদেবের উদ্দেশে তাঁর প্রতিষ্ঠিত অবলোকিতেশ্বর আশ্রম-বিহারে ভিক্ষুসংঘের সেবার জন্য ও বিহার মন্দিরের ভাঙা ফুটো মেরামতের জন্য ভূমি দান করেছিলেন। "পরমসৌগত" ধর্মপাল তাঁর এক মহাসামন্তের প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুদেবতার সেবাপূজার জন্য গ্রাম দান করেছিলেন। "পরমসৌগত" নারায়ণপাল পাশুপত আচার্যদের বৃহৎ মঠ ("সহস্রায়তন") নির্মাণ করিয়ে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (ভাগলপুর তাম্রশাসনপট্ট দ্রষ্টব্য)। পালবংশের শেষ রাজা মদনপালের প্রধান রানী ("পট্টমহাদেবী") চিত্রমতিকা মহাভারত পাঠের জন্য "পণ্ডিত ভট্টপুত্র" বটেশ্বরস্বামিশর্মাকে "বুদ্ধভট্টারকম্ উদ্দিশ্য" একটি গ্রাম দান করেছিলেন (মনহলি তাম্রশাসনপট্ট দ্রষ্টব্য)। "পরমবৈষ্ণব" সামলবর্মা (একাদশ শতাব্দী) ভীমদেব প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ দেবী প্রজ্ঞাপারমিতা মূর্তির সেবাপূজার জন্য "ভগবন্তং বাসুদেব ভট্টারকম্ উদ্দিশ্য" ভূমি অথবা গ্রাম দান করেছিলেন (বজ্রযোগিনী তাম্রপট্ট দ্রষ্টব্য)। ত্রয়োদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে সমতটের পরমবৈষ্ণব দামোদরদেব যে ভূমিদান তাম্রপট্ট লিখিয়েছিলেন তাতে "দূতক" ছিলেন তাঁর মুদ্রাধিকৃত

[১] "নিগ্রন্থনাথাচার্য-গুহনন্দী-শিষ্য-প্রশিষ্যাধিষ্ঠিত"

সচিব গৌতমদত্ত (শোভারামপুর তাম্রশাসনপট্ট দ্রষ্টব্য)। নামে ইনি বৌদ্ধ, ধর্মেও ইনি বৌদ্ধ। তাম্রপট্ট থেকে এঁর পরিচয় উদ্ধৃত করছি। রাজা দু'জন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন।

মুদ্রাধিকারি-সচিবাতিবিশুদ্ধ বুদ্ধি[ঃ]
শ্রীগৌতমাঙ্ঘ্রিপর-গৌতমদত্তনামা।
অভ্যর্থিতোঽবনিপতিঃ স দদৌ দ্বিজাভ্যাং
গ্রামত্রয়ান্তমিলিতং বিধিবৎ স্বশাসনম্॥

'টাঁকশালের অধ্যক্ষ সচিব, অতিবিশুদ্ধ-বুদ্ধি, গৌতমবুদ্ধের পাদপদ্মরত, নাম গৌতমদত্ত, তাঁর দ্বারা অনুরুদ্ধ হ'য়ে সেই রাজা দুজন ব্রাহ্মণকে তিনটি গ্রামের মিলিত ভূমি যথারীতি নিজ আদেশে দান করলেন॥'

৩

জৈন মত

এদেশে বৌদ্ধ মতের আগমনের ও প্রসারের কিছু পূর্বেই জৈন মতের আগমন ও প্রসার হয়েছিল। দু-মতই দুদিক দিয়ে—জলপথে ভাগীরথী ধ'রে, স্থলপথে কলিঙ্গ-ওড্র হ'য়ে—এদেশে পৌঁছেছিল। জৈন মত বৌদ্ধ মতের তুলনায় কিছু প্রাচীন। জৈন মত জনসাধারণের মধ্যে সমাদর লাভ করেছিল। তার একটা কারণ হ'ল, এ মতে গৃহস্থ থেকে গিয়েও ধর্মচর্চা করা যায়। বৌদ্ধ মত উচ্চস্তরের সমাজকে, চিন্তাশীল ও ভাবুকদের, বেশি টেনেছিল। এ মতে প্রব্রজ্যা না নিলে ধর্মচর্চা হয় না। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সংসার ত্যাগ করা সম্ভব নয়, পরিবার পরিজনেব মুখ চেয়ে। এদেশে বৌদ্ধদের মতো জৈনদেরও বিহার বা মঠ ছিল। তার উল্লেখ আগে করেছি। অল্প কিছুকাল পূর্বে আবিষ্কৃত একটি গুপ্ত আমলের তাম্রপট্টে এরও প্রায় বছর তিরিশ-বত্রিশ বছর আগে পৌণ্ড্রবর্ধনে শৃঙ্গবের বীথীতে (আধুনিক বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার পুঁটিয়া থানায়) প্রতিষ্ঠিত জৈন বিহারের ("এচিকাম্র-সিদ্ধায়তনে ভগবতার্হতাকারিৎক-বিহারে") উল্লেখ আছে।[১] এই জৈন বিহারে এবং অদূরবর্তী ক্ষুদ্রতর বিহারে ("বিহারিক") সংলগ্ন সূর্যদেবতার মন্দিরে ("ভগবতস্ সহস্ররশ্মেঃ কারিতক-দেবকুলে" নৈবেদ্য ("বলি") পায়সভোগ ("চরু") ও অতিথিভোজন ("সত্র") চালাবার জন্যে, ভাঙা ফুটো সারাবার জন্যে ("খণ্ডফুট্ট-প্রতিসংস্কার-করণায়" এবং গন্ধ ধূপ ও তৈল জোগানের জন্যে চিরস্থায়ী দান রূপে ভূমিদান করেছিলেন তিন গৃহস্থ—মূলকবস্তুক নিবাসী ক্ষেমার্ক এবং গুল্মগন্ধিকা নিবাসী ভোয়িল ও মহীদাস—টাকা দিয়ে কিনে। দান গ্রহণ করেছিলেন বিহারপতি "শ্রবণকাচার্য" বলকুণ্ড। দীনেশবাবু

[১] *Epigraphic Discoveries in East Pakistan*, পৃ ৬১-৬২।

বিহারটিকে বৌদ্ধ বিহার বলেছেন। তা ঠিক নয়। 'শ্রবণ (শ্রমণ)' বৌদ্ধদের একচেটে পারিভাষিক শব্দ নয়। কোন বৌদ্ধ স্থবির 'আচার্য' অভিহিত হয় নি। তা ছাড়া কোন বৌদ্ধ স্থবির গৃহস্থাশ্রমের পদবী বহন করেছেন এমন প্রমাণও নেই। এখানে জৈনাচার্যের নাম বলকুণ্ড, পাহাড়পুরের তাম্রপট্টে জৈনাচার্যের নাম গুহনন্দী। জৈন বিহারের সঙ্গে সূর্যদেবতার—অথবা শাম্বের—মন্দিরের ঘনিষ্ঠতা ততটা অসম্ভব ছিল না, যতটা বৌদ্ধ বিহারের সঙ্গে যে কোন ব্রাহ্মণ্য দেবমন্দিরের।

হিউয়েন-সাঙ ও ই-সিঙের সাক্ষ্য অনুসারে পৌণ্ড্রবর্ধনে ও সমতটে—অর্থাৎ উত্তর ও পূর্ববঙ্গে—দিগম্বর জৈন মতের খুব প্রাবল্য ছিল। পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র দিগম্বর জৈন (প্রাচীন) প্রতিমা পাওয়া গেছে। সুতরাং সপ্তম শতাব্দীতে এবং তারপরে কর্ণসুবর্ণে এবং তাম্রলিপ্তেও জৈন মতের অপ্রচার ছিল না। তাঁতি প্রভৃতি শিল্পকারদের মধ্যে জৈনধর্মের প্রতি আনুগত্য বিশেষভাবে ছিল ব'লে মনে হয়। জৈন মত স্বাভাবিক-ভাবেই ব্রাহ্মণ্য মতের মধ্যে নিলীন হ'য়ে গেছে, বৈষ্ণবধর্ম ও অহিংসার মাধ্যমে। সমতটে ময়নামতী অঞ্চলে জৈনধর্ম ও যোগপন্থা মিলিত হ'য়ে গিয়ে এক অভিনব নিরীশ্বর গুরুবাদী যোগী মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমসাময়িক দলিলে এই অভিনব ধর্মের কোন সাক্ষ্য নেই, তবে পুরানো বাংলা সাহিত্যে আছে।

জৈন প্রবন্ধগ্রন্থে বাংলা দেশে বিশেষ ক'রে পৌণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলে এ ধর্মের প্রসারের উল্লেখ আছে, এদেশে জৈন শাস্ত্রের বড় বড় আচার্যও জন্মেছিলেন সে কথার উল্লেখও আছে। এক জনের খ্যাতি গল্পাকারে চ'লে এসেছে। সংক্ষেপে এঁর কথা বলছি।

বিখ্যাত স্কন্দিলাচার্য একদা গৌড়দেশে কোশল গ্রামে এসেছিলেন। সেখানে এক ব্রাহ্মণ, নাম মুকুন্দ, তাঁর দেশনা শুনে বৈরাগ্যভাবাপন্ন হন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরুর সঙ্গে তিনি পশ্চিম দেশে চ'লে আসেন। মুকুন্দ খুব ভোরে উঠে চেঁচিয়ে গ্রন্থ পাঠ করতেন ছেলে মানুষের মতো, তাতে মঠের অন্য সাধুদের বিরক্তি লাগত। জানতে

পেরে গুরু তাঁকে বলেন, 'বাপু মনে মনে বন্দনা ইত্যাদি প'ড়ো। রাত্রিতে চেঁচিয়ে পড়লে হিংস্রজীব জেগে উঠে অনর্থ করতে পারে।' তখন মুকুন্দ দিনের বেলায় পড়তে লাগলেন। তাও শ্রাবক-শ্রাবিকাদের কানে বাজতে লাগল। সকলে তাঁকে উপহাস করতে লাগল। মুকুন্দ দুঃখিত হ'য়ে জিনালয়ে (অর্থাৎ ঠাকুরঘরে) একুশ দিন উপবাসে কাটিয়ে ব্রাহ্মী আরাধনা (অর্থাৎ সরস্বতীর সাধনা) করলেন। তুষ্ট হ'য়ে দেবী বর দিলেন, 'সর্ববিদ্যাসিদ্ধ হও'। তাই হলেন মুকুন্দ, "অপ্রতি-মল্লো বাদী"—অর্থাৎ তর্কযুদ্ধে অদ্বিতীয়। তাঁর খ্যাতি হল "বৃদ্ধবাদী" (=বুড়ো তার্কিক) নামে। পরে গুরু তাঁকে নিজের পাটে বসিয়ে দিলেন।

অবন্তী দেশে এক ভালো ব্রাহ্মণের সন্তান, নাম সিদ্ধসেন, অত্যন্ত মেধাবী ও পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যার ও বুদ্ধির গরবে তিনি "জগদ্ অপি তৃণবদ্ গণয়তি"। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে তাঁকে তর্কে পরাজিত করবে তার তিনি শিষ্য হবেন। বৃদ্ধবাদীর যশ তাঁর কানে পেঁছিলে সিদ্ধসেন ভৃগুপুরে বৃদ্ধবাদীর কাছে এলেন তর্কযুদ্ধ ক'রতে। দুজনের মধ্যে কিছুক্ষণ আলাপের পর সিদ্ধসেন বললেন, "বাদং দেহি।" বৃদ্ধবাদী বললেন, 'তর্ক করতে রাজি আছি কিন্তু সভ্য (অর্থাৎ মধ্যস্থ) হবে কারা? সভ্য না থাকলে বাদে জয়পরাজয় কে নির্ণয় করবে?' সিদ্ধসেন বললেন, 'এই তো গয়লারা রয়েছে, এরা সভ্য হোক।' বৃদ্ধবাদী বললেন, 'তাই হোক। তুমি আরম্ভ কর।' তখন সিদ্ধসেন সেই নগরপ্রান্তে গোচারণ ভূমিতে ব'সে সংস্কৃতে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন ("চিরং সংস্কৃতেন জল্পম্ অনল্পম্ অকরোৎ")। সিদ্ধসেনের বক্তৃতা শেষ হ'লে পর গোপেরা বললে, 'এ কিছু জানে না, কেবল ফুঃফুঃ করে চীৎকার ক'রে কানের জ্বালা ধরিয়েছে—"কেবলম্ উচ্চৈঃ ফুৎকারং ফুৎকারং কর্ণৌ নঃ পীড়য়তি"—ধিক্ ধিক্। বুড়ো, তুমি কিছু বল।' তখন কালজ্ঞ বৃদ্ধবাদী কোমর বেঁধে নাচতে নাচতে দুটি ছড়া পড়লেন। তার প্রথমটি এই,

নবি মারিয়ই নবি চোরিয়ই
পরদারহু গমণু নিবারিয়ই।
থোবাথোউং দাইয়ই
সগিগ টুকুটুকু জাইয়ই॥
'নাহি মারে নাহি চুরি করে,
পরদার হতে মন নিবারণ করে।
অল্পস্বল্প ভিক্ষা দেয়,
অনায়াসে স্বর্গে চ'লে যায়॥'

বৃদ্ধবাদী ক্ষান্ত হ'লে গোপেরা বললে, 'বৃদ্ধবাদী সর্বজ্ঞ, চমৎকার বলেছে।' তখন সিদ্ধসেন বৃদ্ধবাদীর কাছে প্রব্রজ্যা চাইলে, বললে 'আমি তোমার শিষ্য হব, হেরে গিয়েছি ব'লে।' বৃদ্ধবাদী বললেন, 'সহরের ভিতরে রাজসভায় চল, গোপসভায় একি বাদ?' সিদ্ধসেন বললেন, 'আমি অকালজ্ঞ, আপনি কালজ্ঞ। আপনারই জয়।' বৃদ্ধবাদী তাঁকে দীক্ষা দিলেন। জৈন পণ্ডিত-সমাজে তাঁর নাম হ'ল সিদ্ধসেন দিবাকর।

সিদ্ধসেন অধ্যাত্মশক্তি-বলে অত্যন্ত গর্ববোধ ক'রতে লাগলেন, ধর্ম-কর্মে তাঁর শৈথিল্য এল। শিষ্যের এই অপযশ সুবৃদ্ধ গুরুর কানে গেল। শিষ্যকে নিস্তার করবার জন্যে তিনি গোপনে এলেন উজ্জয়িনীতে। এসে একাকী সিদ্ধসেনের আবাসের দুয়ারে বসে রইলেন। দ্বারী খবর দিলে, এক বৃদ্ধ এসেছেন। তাঁকে সভায় আনা হ'ল। বৃদ্ধবাদী এলেন আপাদমস্তক বস্ত্রাবগুণ্ঠিত হ'য়ে। এসে তিনি এই ছড়াটি ব'লে তার মানে জানতে চাইলেন,

অণফুল্লিয় ফুল্ল ম তোড়হিঁ
মা বোরা মোড়হিঁ।
মণকুসুমেহিঁ অচ্চি নিরঞ্জণু
হিণ্ডহি কাঁই বণেন বণু॥

'আ-ফোটা ফুল তুলো না, মুকুল মুচড়িয়ো না। মনঃকুসুমে নিরঞ্জনকে অর্চনা ক'রতে হয়। বৃথা (লোকে) বেড়ায় বন থেকে বনে॥'

অনেক ভেবে চিন্তেও সিদ্ধসেন দিবাকর ছড়াটির অর্থ খুঁজে পেলেন না। শেষে নিরীক্ষণ ক'রে বুঝলেন, ইনিই তাঁর গুরু, তাঁকে চৈতন্য দিতে এসেছেন। বৃদ্ধবাদীর উদ্দেশ্য সফল হ'ল॥

৪

বৌদ্ধ মত

এদেশে বৌদ্ধ মতের প্রবলতার উল্লেখ পাওয়া যায় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর সন্ধিকাল থেকে। ফা-হিয়েনের বিবরণে পূর্বভারতে দুটি বৌদ্ধ মতের পীঠস্থানের বিশেষভাবে উল্লেখ পাওয়া গেছে। এক পাটলীপুত্র (—তখনো নালন্দা বা নালেন্দ্র বিহারের প্রতিষ্ঠায় দেরি ছিল), দুই তাম্রলিপ্ত। এই দু জায়গায় ফা-হিয়েন যথাক্রমে তিন বছর ও দু-বছর অধ্যয়নে ও পুথি লেখায় এবং ছবি আঁকায় কাটিয়েছিলেন আর শেষের স্থান থেকেই তিনি স্বদেশমুখী হয়েছিলেন। ফা-হিয়েন লিখেছেন, চম্পা থেকে পূবদিকে প্রায় পঞ্চাশ যোজন গিয়ে তিনি তাম্রলিপ্তি দেশে আসেন।[১] সেখানে সমুদ্রবন্দর আছে। এই দেশে চব্বিশটি বিহার-সঙ্ঘারাম আছে, সে সব পরিচালিত হয় আবাসিক প্রধানদের দ্বারা। এদেশে বৌদ্ধধর্ম খুবই জাগ্রত। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হিউয়েন-সাঙ এদেশে বৌদ্ধ মতের প্রচলন ও প্রসার সম্বন্ধে বেশ কিছু বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর সময়ে পৌণ্ড্রবর্ধনে প্রায় বিশটি সঙ্ঘারাম-বিহার ছিল, তাতে ভিক্ষুর সংখ্যা তিন হাজারের কম ছিল না। রাজধানীর প্রায় ২০ লি (কিছু বেশি সাত মাইল) দূরে সবচেয়ে বড় সঙ্ঘারামটি ছিল। সু-যু-কীতে এর নাম পাই "পো-চি-পো'"، দেশী নাম কী ছিল তা এই চীনীয় বিকৃতি থেকে বোঝা যায় না। কামরূপে হিউয়েন-সাঙ কোন বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম দেখেন নি। এখানে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে বৌদ্ধ মতের প্রতি জনসাধারণের কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। এখানে ছিল দেবতাপূজার বাহুল্য এবং সে দেবতাপূজায় বলি দেওয়া

[১] ফা-হিয়েনের বর্ণনা থেকে মনে হয় তাঁর উল্লিখিত তাম্রলিপ্তি দেশের নাম, স্থানের নয়। ফা-হিয়েন কর্ণসুবর্ণের নাম করেননি। কর্ণসুবর্ণের "রক্তমৃত্তি" (তুলনীয় 'তাম্রলিপ্তি') বিহার অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল সপ্তম শতাব্দীতে। কর্ণসুবর্ণ যে প্রাচীন কালে বন্দর ছিল তার প্রমাণ আছে।

হ'ত (অর্থাৎ তান্ত্রিক পুজা-আচার)। সমতটে বিভিন্ন সঙ্ঘারাম-বিহারের সংখ্যা ছিল তিরিশের মতো। বৌদ্ধ-ধর্মের সব মতের ভিক্ষু এখানকার বিহারে বাস করতেন, এবং তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় দু-হাজার। তাম্রলিপ্তে হিউয়েন-সাঙ দেখেছিলেন দশটি সঙ্ঘারাম-বিহার, তাতে প্রায় হাজার ভিক্ষু থাকতেন। কর্ণসুবর্ণেও সঙ্ঘারাম-সংখ্যা তাম্রলিপ্তের মতো, তবে ভিক্ষুসংখ্যা দু-হাজার। এঁদের মধ্যে বিভিন্ন মতের বৌদ্ধ ছিলেন—যেমন সম্মিতীয় ও দেবদত্তপন্থী। (দেবদত্তপন্থীরা ঘন দুগ্ধ-ক্ষীর—পান করতেন না।) রাজধানীর পাশেই ছিল 'লো-তো-বেই-বেই' বা 'লো-তো-মি-চি' (রক্তভিত্তিক বা রক্তমৃত্তিকা) সঙ্ঘারাম-বিহার। এই বিহারের প্রাসাদগুলি খুব উঁচু এবং শালাগুলি খুব প্রশস্ত ছিল। এই সঙ্ঘারাম দেশের মধ্যে সর্ববিখ্যাত বিদ্যাস্থান ছিল। অন্য মতের এবং নাস্তিক্যবাদী পণ্ডিতেরাও এখানে আসতেন বিচার ও তর্ক করতে।

হিউয়েন-সাঙের সময়ে বৌদ্ধ মত সবচেয়ে প্রবল ছিল ওড্রদেশে। সেখানে সঙ্ঘারাম-বিহারের সংখ্যা প্রায় এক শ এবং ভিক্ষুর সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। তাঁরা সকলেই মহাযান মত অনুসরণ করতেন।

হিউয়েন-সাঙের প্রায় চল্লিশ বছর পরে ই-সিঙ এদেশে এসেছিলেন। তিনি তাম্রলিপ্তে পৌঁছন ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং এই স্থান থেকেই তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন তেরো বছর পরে (৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে)। ইনি তাম্রলিপ্তে পাঁচ-ছটি সঙ্ঘারাম-বিহারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। তার মধ্যে তিনি নাম করেছেন একটির—"ভ-র-হ"। এই বিহারের পরিচালনা ও অনুষ্ঠান ইত্যাদি লক্ষ্য ক'রে তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা দিয়েছেন। আগে সে কথা বলেছি। একটি কথা আগে বলা হয় নি এখন বলছি। সে হ'ল তাম্রলিপ্তের বিহারে সান্ধ্য অনুষ্ঠানের কথা। ই-সিঙ বলেছেন, অপরাহ্নে অথবা ঠিক সন্ধ্যাসময়ে চৈত্যবন্দনা ও সাধারণ উপাসনা হ'ত। ভিক্ষুরা সমবেত হয়ে বিহারের তোরণ পেরিয়ে বাইরে এসে স্তূপকে তিনবার প্রদক্ষিণ করতেন, ধূপ ও ফুল

দিতে দিতে। তারপর সকলে নতজানু হয়ে বসতেন, এবং তাঁদের মধ্যে একজন, যিনি সুকণ্ঠ, তিনি বুদ্ধের মহিমা-স্তব গান করতেন উচ্চকণ্ঠে সুরলয়ে। এইভাবে দশবিশটি শ্লোক গীত হ'ত। তারপর ভিক্ষুরা সার বেঁধে বিহারে ফিরে আসতেন। তারপর তাঁরা প্রায়ই বিহারে একত্র হয়ে উপবেশন করতেন। তাঁদের একজন, সূত্র-পাঠক, সিংহাসনে ব'সে ছোটখাট একটি সূত্র পাঠ করতেন। পাঠ সাঙ্গ হ'লে সমবেত ভিক্ষুরা সমস্বরে বলতেন "সুভাষিত!" অথবা "সাধু!" সূত্র-পাঠক সিংহাসন থেকে নেমে এলে প্রধান ভিক্ষু দাঁড়িয়ে উঠে মাথা হেঁট ক'রে সিংহাসনকে নমস্কার করতেন। তারপর তিনি অর্হৎদের আসনের কাছে গিয়ে বন্দনা জানাতেন সেইভাবে। তারপর উপপ্রধান ভিক্ষুও সিংহাসন ও অর্হৎদের আসনের কাছে গিয়ে বন্দনা জানিয়ে শেষে প্রধান ভিক্ষুকেও বন্দনা জানাতেন।

এদেশে ভিক্ষুণীদের সঙ্ঘারামও ছিল। ভিক্ষুণীরা খুব সংযতভাবে থাকতেন। ভিক্ষুদের বিহারে যাবার প্রয়োজন হলে তাঁরা আগে থেকে সে খবর ভিক্ষু-সঙ্ঘকে জানিয়ে দিতেন।

ই-সিঙের অল্পকাল পরে এদেশে এসেছিলেন চীনীয় পরিব্রাজক সেঙ-চি। এঁর লেখায় সমতটের রাজার বুদ্ধভক্তির ও বৌদ্ধ-ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় আছে। প্রবোধচন্দ্র বাগচী এঁর কথা আমাদের প্রথম শুনিয়েছেন। রাজার নাম ছিল রাজভট। ইনি প্রতিদিন মাটির বুদ্ধপ্রতিমা গড়তেন লক্ষসংখ্যক, এবং প্রত্যহ লক্ষ শ্লোক পড়তেন মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র থেকে। অবলোকিতেশ্বর প্রতিমা পুরোভাগে নিয়ে ইনি বুদ্ধ-যাত্রা করতেন। এঁর রাজধানীস্থিত সঙ্ঘারামগুলিতে আবাসিক ভিক্ষুভিক্ষুণীর সংখ্যা ছিল চার হাজার। এ হ'ল সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধের কথা।

হিউয়েন-সাঙের সাক্ষ্য অনুসারে এদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রায় সব মতই অল্পবিস্তর চলিত ছিল। সে সব মতাবলম্বীদের মধ্যে বিভেদ বেশি ছিল না। মহাযান মত বিশেষভাবে প্রবল ছিল সমতটে ও ওড্রে। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে অথবা সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে এদেশে

প্রচলিত মহাযান মতে শক্তিদেবতার পূজারীতি দেখা দেয়। এই শক্তি-দেবতা হলেন বুদ্ধের শক্তি করুণা ও অবলোকিতেশ্বরের শক্তি প্রজ্ঞা-পারমিতা। শৈব মতের প্রভাব এর মধ্যে অবশ্যই খানিকটা ছিল। আর ছিল তিব্বতের মারফৎ চীনের কিছু প্রভাব। তবে সে প্রভাব কার্যকর হ'তে কিছু দেরি হয়েছিল।

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যেই মহাযান মতে শক্তি-উপাসনার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল বটে, তবে তখনও সে উপাসনায় তান্ত্রিকতার ছাপ স্পষ্ট হ'য়ে ফোটে নি। পাল-রাজবংশের আদিপুরুষ গোপাল ও তাঁর পুত্র ধর্মপাল যে ধর্ম-মত পোষণ করতেন তাতে বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর শক্তি দেবী করুণা সমানভাবে সম্পূজিত। এর প্রমাণ রয়েছে ধর্মপালের প্রদত্ত তাম্রশাসন-পট্টের প্রথম শ্লোকে।

সর্বজ্ঞতাং শ্রিয়মিব স্থিরমাশ্রিতস্য
বজ্রাসনস্য বহুমারকুলোপলম্ভাৎ[১]।
দেব্যা মহাকরুণয়া পরিপালিতানি
রক্ষন্তু বো দশবলানি দিশো জয়ন্তি॥

'মারগণকে অজস্র পরাজিত ক'রে যিনি অবিচলিত-আসন হয়েছেন, যিনি কান্তির মতো অচঞ্চলভাবে সর্বজ্ঞতা আশ্রয় করেছেন, দেবী মহাকরুণার দ্বারা পরিপালিত তাঁর যে দশ বল দশদিক জয় করেছে, তা তোমাদের রক্ষা করুক॥'

ধর্মপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বোধ হয় পুরাতন মতের দিকে ঝুঁকেছিলেন, তাই তাঁর শাসনপট্টের প্রারম্ভ শ্লোকে দেবীর উল্লেখ নেই, বন্দনা আছে শুধু সিদ্ধার্থ সুগতের।

নবম শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে মহাযান মতে দেব-আরাধনায় তান্ত্রিকতা[২] পরিস্ফুট হতে থাকে। অন্তত নারায়ণপালের শাসনপট্ট

[১] পাঠ 'লম্ভাঃ'। [২] অর্থাৎ শক্তির ভার্যারূপে ভূমিকা।

থেকে তাই মনে হয়। এখানে দেখছি গৃহিণী মহাকরুণা দেবী হয়েছেন—অর্ধ-নারীশ্বর শিবের পার্বতীর মতো—লোকনাথের অর্ধাঙ্গিনী প্রেয়সী।

মৈত্রীং কারুণ্যরত্নপ্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ···

এই আরম্ভশ্লোক পরবর্তী পালরাজাদের তাম্রশাসনপট্টেও দেখা যায়। বঙ্গভূমিতে বৌদ্ধ ও শৈব মতের মধ্যে সংযোগ ঘটেছিল হয়ত এই এক সূত্রে।

ফুসে-র বৌদ্ধ প্রতিমাতত্ত্ব গ্রন্থে (*Etude sur L'Iconographie Bouddhique de L'Inde*) বর্ণিত চিত্রগুলির মধ্যে বরেন্দ্রীর অন্তর্গত দেদ্দাপুরে লোকনাথের উল্লেখ আছে (১.৫৭)। ধর্মপালের মাতার নাম ছিল দেদ্দা। মনে হয় এই লোকনাথ-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ধর্মপাল অথবা গোপাল, মাতার অথবা পত্নীর পুণ্য ও যশ অভিবৃদ্ধির জন্য।

বাংলা দেশে জ্ঞানচর্চায় বৌদ্ধ মতের পণ্ডিতেরাই অগ্রণী ছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মতো তাঁরা ঘরে ব'সে অথবা ধনীর আশ্রয়ে থেকে স্বতন্ত্র-ভাবে বিদ্যাচর্চা করতেন না। বৌদ্ধেরা সঙ্ঘারাম-বিহারে থেকে সমবেত ভাবে বিদ্যাবিবর্ধন এবং বিদ্যাবিতরণ করতেন। তাঁদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় শুধু সৌগত মত এবং সে মতের পোষক তত্ত্বদর্শনই ছিল না, তাঁরা ব্রাহ্মণদের বিদ্যাও আলোচনা করতেন এবং নিজেদের বিশিষ্ট ধর্ম-মতের আনুষঙ্গিক মূর্তি চিত্র স্থাপত্য ও লিপি শিল্পও রীতিমত অনুশীলন করতেন। আমাদের দেশে সেকালের বৌদ্ধ মহাবিহারগুলিই এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ছিল। পূর্ব-ভারতে সবচেয়ে বড় এবং বিখ্যাত মহাবিহার ছিল নালন্দায় (বা নালেন্দ্রায়)। নালন্দা মহাবিহারের উল্লেখ ফা-হিয়েন করেন নি। তাঁর সময়ে বজ্রাসনের (গয়ায় মহা-বোধির) কাছে মহাবিহারই প্রসিদ্ধ ছিল। নালন্দা মহাবিহার সম্ভবত ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দা শুধু পূর্ব-ভারত কেন সমগ্র ভারতবর্ষে একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হয়েছিল। বজ্রাসনের সন্নিহিত ব'লে দেশদেশান্তর থেকে বৌদ্ধ-মতাবলম্বী রাজারা এখানে পূজা উপঢৌকন পাঠাতেন, মন্দির তৈয়ারি ক'রে দিতেন, আর পণ্ডিতেরা

দিগ্‌দিগন্ত থেকে এসে এখানে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন। ধর্মপাল এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা নালন্দা মহাবিহারে অজস্র দান ক'রে গেছেন। পাল-বংশের প্রথম বড় রাজা ধর্মপাল (অষ্টম শতাব্দীর শেষে অথবা নবম শতাব্দীর শুরুতে) গঙ্গাতীরে মুদ্‌গগিরির পার্বত্য অঞ্চলে বিক্রমশীল মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এই মহাবিহার নালন্দার সমকক্ষ হয়েছিল। পাল-বংশের শেষ বড় রাজা রামপাল তাঁর রাজধানী রামাবতীর অনতি-দূরে জগদ্দল (বা জাগন্দল) মহাবিহার স্থাপন করেছিলেন। এদেশে আরও অনেক বিহার ও মহাবিহার থাকলেও বিক্রমশীল ও জগদ্দল মহাবিহারের কর্ম ও খ্যাতি সব চেয়ে বেশি ছিল। মহাযান মতের মধ্যে তান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবেশ ও পুষ্টি পাল-রাজাদের রাজ্যকালেই সংঘটিত হয়েছিল। তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বিক্রমশীল ও জগদ্দল মহাবিহারে। প্রাচীন সোমপুর বিহারও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। এখানে বিরাট বিহারমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন ধর্মপাল। একাদশ শতাব্দীতে সমতটের এক বর্মরাজা (?) এই বিহার ধ্বংস করেন। অধ্যক্ষ অশোকশ্রী-মিত্র পুড়ে মারা যান। এই বিধ্বস্ত বিহারের অবশেষই পাহাড়পুরের ভগ্নস্তূপ।

সোমপুর, বিক্রমশীল, জগদ্দল প্রভৃতি বিহার থেকে অনেক বাঙালী পণ্ডিত তিব্বতে যান এবং কেউ কেউ সেখান থেকে চীনেও গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে দীপঙ্করশ্রী-জ্ঞান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

দশম শতাব্দীতে সমতটের রাজা শ্রীচন্দ্র হরিকেলে অনেকগুলি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্যমতে বিদ্যা ও শাস্ত্রচর্চার জন্য। এর বিবরণ পরের অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

মহাবিহারগুলি ছাড়াও দেশের সর্বত্র বৌদ্ধ মতের দেবস্থান ও তীর্থ-ভূমি ছড়িয়ে ছিল। মনে হয় এগুলির সঙ্গে ভিক্ষুদের সঙ্ঘারাম ও বিহারও ছিল। একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লেখা একটি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুথির (কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত) এইরকম

অনেক দেবস্থানের দেবতা-মূর্তির চিত্র আছে (ফুসে-র গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। সেইগুলির উল্লেখ করছি।

পৌণ্ড্রবর্ধনে ত্রিশরণ-বুদ্ধ ভট্টারক ; বরেন্দ্রীতে হলদি গ্রামে ও দেদ্দাপুরে[১] লোকনাথ (অর্থাৎ অবলোকিতেশ্বর), রাণা গ্রামে তারা (নাম "ইচ্ছা মহত্তরায়ী" অর্থাৎ ইচ্ছা ঠাকুরাণী) ; রাঢ়ে কন্থারাম, রামজাত ও বৈত্রবনা গ্রামে লোকনাথ, তাড়িহা গ্রামে তারা ; দণ্ডভুক্তিতে যজ্ঞপিণ্ডি গ্রামে লোকনাথ ; সমতটে ও চন্দ্রদ্বীপে তারা ; সমতটে জয়তুঙ্গ ও চম্পিতলা (?) গ্রামে লোকনাথ ; হরিকেলে "শিলা" লোকনাথ ; সুবর্ণপুরে শ্রীবিজয় গ্রামে লোকনাথ। পূজ্য স্তূপের চিত্র আছে দুটি—তুলাক্ষেত্র গ্রামে বর্ধমানস্তূপ এবং রাঢ়ে ধর্মরাজিকা চৈত্য। রাঢ়ে লুতু গ্রামে বজ্রাসনের চিত্রও আছে।

খাড়ী মণ্ডলে (ভাগীরথীর ভাটি অংশ, আধুনিক চব্বিশপরগনা ও হাওড়া জেলা) এক গ্রামে (নাম খসর্পণ[২]) প্রতিষ্ঠিত লোকনাথ খুব জাগ্রত ছিল। এই দেবমূর্তির প্রতিষ্ঠা বিষয়ে এই কাহিনীটি আছে সাধনমালায়। — শুভঙ্কর নামে এক উপাসক বণিক্ নৌবাণিজ্য ক'রতে পশ্চিম ভারতে পোতলক বন্দরের উদ্দেশে চলেছিলেন। পথে তিনি খাড়ী মণ্ডলের খসর্পণ গ্রামে রাত কাটিয়েছিলেন। রাত্রিতে অবলোকিতেশ্বর স্বপ্নে প্রত্যাদেশ দিয়েছিলেন, 'তুমি আর যেয়ো না, এইখানেই আমাকে স্থাপনা কর বৈরোচনতন্ত্র-পদ্ধতি অনুসারে, তাহলে তোমার খুব লাভ ও পুণ্য হবে।' সেই অনুসারে তিনি শীঘ্র অবলোকিতেশ্বর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এইরকম শোনা যায়॥

[১] দেদ্দ(া) ছিল ধর্মপালের মায়ের (?) নাম। হয়ত তাঁরই নামে এই গ্রাম।

[২] খসর্পণ (=আকাশে গমনকারী) অবলোকিতেশ্বরের বিশিষ্ট বিশেষণ। ভুল ক'রে গ্রামের নাম ধরা হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত দেবতার নামই খসর্পণ অবলোকিতেশ্বর।

৮

যোগী মত

বহুকাল আগে থেকেই আর্যাবর্তে তপস্বী সাধকদের একাধিক সম্প্রদায় ছিলেন যাঁরা সংসারের অর্থাৎ সাধারণ সমাজের বাইরে থেকে অধ্যাত্ম-সিদ্ধির জন্য ইচ্ছা ক'রে দৈহিক কষ্টভোগ করতেন। বাংলা দেশেও গোড়া থেকে এমন সাধক সম্প্রদায় ছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর আগে এঁদের অস্তিত্বসূচক কোন ইতিহাসগ্রাহ্য প্রমাণ মেলে নি। অষ্টম-নবম শতাব্দীর দুএকটি ভাস্কর্যে এবং দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর ছড়ায় ও গানে এই "যোগী" বা যোগসিদ্ধি সম্প্রদায়ের পরিচয় কিছু পাওয়া গেছে। ক্লিষ্ট তপশ্চর্যা এবং সম্পূর্ণভাবে সাংসারিক ভোগ-বিরতি এই ধর্মের বিশিষ্ট সাধনা। বৌদ্ধ ও জৈন মতের মতো এই যোগী মতও নিরীশ্বর। বৌদ্ধ ও জৈন মতে যেমন শাস্ত্রবিধান ছিল যোগী মতে তেমন ছিল না। সাধক-শিষ্যকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হ'ত গুরু-উপদেশের উপর। যোগী মতের আর একটি বিশিষ্টতা হ'ল গুরুবাদ। পরে এই গুরুবাদ ব্রাহ্মণ্য মতে, বিশেষ ক'রে বৈষ্ণব মতে, সঞ্চারিত হয়েছে।

পাহাড়পুরে সোমপুর বিহারের যে বিধ্বস্ত বিরাট মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে (অষ্টম শতাব্দীর শেষে ধর্মপাল কর্তৃক বিনির্মিত ব'লে অনুমিত), তার ভিত্তিগাত্রে বহু ভাস্কর্য চিত্র (পাথরের ও পোড়ামাটির) পাওয়া গেছে। তার মধ্যে অন্তত দুটি হ'ল যোগী সাধকের (নিদর্শনে দ্রষ্টব্য)। তপস্যায় শীর্ণকায়, পাঁজরের হাড় বার করা, মাথায় দীর্ঘ কেশ ঝুঁটি-বাঁধা, লম্বা সরু পাকানো দাড়ি, কানে কুণ্ডল, গলায় হাড়ের মালা, বুকে উপবীতের মতো দড়া—যোগপট্ট। একটি মূর্তি উপবিষ্ট। আর একটি মূর্তি ঘাড়ে বাঁকে বোঝা নিয়ে কষ্টে চলেছেন, তাঁর পরণে লিঙ্গপট্ট, হাতে শিঙ্গাবেণু (বা বক্রশীর্ষ দণ্ড)।

নবম শতাব্দী, কিংবা তার কিছু আগে থেকে, যোগসিদ্ধি মতের সাধনায় দুটি পৃথক্ পন্থা দেখা দিয়েছিল। একটি ছিল পুরানো

তপশ্চর্যা-পরায়ণ ও ব্রহ্মচর্য-নিষ্ঠ, অপরটি ছিল দুঃখসুখে উদাসীন বৌদ্ধ-তান্ত্রিক মতানুবিদ্ধ ও নারী সাধিকা-সঙ্গ। প্রথমটিকে বলা যায় হঠযোগ-যান। দ্বিতীয়টিকে বলা যায়, তান্ত্রিকযোগ-যান। যোগ-সিদ্ধি মতে আদিগুরু ছিলেন দু'জন—মৎস্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথ, অথবা জালন্ধরিপাদ ও তাঁর শিষ্য কৃষ্ণপাদ। প্রথম দুজন "নাথ" চিহ্নিত এবং হঠযোগ-যানের গুরুরূপে স্বীকৃত। শেষের দুজন হঠযোগ-যানের স্বীকৃতি লাভ করলেও আসলে এঁরা তান্ত্রিকযোগ-যানের আদিগুরু ও আদিশিষ্য। তলিয়ে দেখলে মনে হয় গুরুশিষ্য দু'জোড়া আসলে এবং আদিতে তাঁরা এক জোড়াই ছিলেন। হঠযোগ-যানের পরবর্তী কালের রূপ যে "নাথ"-পন্থা তার পুরানো ছড়ায় আদিগুরুর নাম "মছন্দলি"। নামটি এসেছিল মৎস্যন্ধরি (বা মৎস্যন্ধরিক) থেকে। "মৎস্যেন্দ্র" সংস্কৃতায়িত রূপ মাত্র। নামটি তাহলে জালন্ধরির সমার্থক। মনে হচ্ছে এই মতের আদিগুরুর কল্পনায় জালিকের (=জেলের) উপমা ছিল। যোগীর সাধনা মায়াজাল-মুক্ত হয়ে অজর অমর সিদ্ধ হওয়া। সংসারের জীব মায়াজালে বদ্ধ সুতরাং মায়াজালের বশ। সিদ্ধ-গুরু মায়াজালের বাইরে, মায়াজাল তাঁর হাতিয়ার। আদিগুরুর মতো আদিশিষ্যও জেলে। নাথ-পন্থীর পুরানো ছড়ায় গোরক্ষকে বলা হয়েছে কেওট—"গোরখ কেওটিয়া"। এদিক দিয়ে গোরক্ষনাথের সঙ্গে কাহ্নুপার (কৃষ্ণপাদের) মিল পাওয়া যায় না বটে তবে অন্যদিক দিয়ে মিল দুর্লক্ষ্য নয়। গোরক্ষ মানে গোরুর রাখাল অর্থাৎ গোপাল, অর্থাৎ কৃষ্ণ। আদিগুরু ছিলেন ধীবর আর আদিশিষ্য ছিলেন গোপালক, —এই ভাবনা যে যোগসিদ্ধি-যানের প্রাচীন সাধকদের মনে ছিল সে অনুমান করতে পারি। প্রসঙ্গত ব'লে রাখি "মৎস্যেন্দ্রনাথ" এই পরিবর্তিত নাম অবলম্বন করেই নাথ-পন্থী গাথায় মৎস্যেন্দ্রনাথের মৎস্যরূপ ধারণ ক'রে গোপনে শিবের মুখ থেকে মহাজ্ঞান শিখে নেওয়ার কাহিনীটি কল্পিত। তার সঙ্গে বিষ্ণুর মৎস্যাবতার কল্পনাও জড়িত। জয়দেবের কল্পনায় যে মৎস্যাবতার ("বেদান্ উদ্ধরতে") সে মৎস্যাবতারের

সঙ্গে শতপথ-ব্রাহ্মণের কথিত মনু-উদ্ধারকারী মৎস্যরাজের সম্পর্ক নেই। পৌরাণিক মৎস্যাবতার-কল্পনা প্রাচীন যোগসিদ্ধি-যানের কাহিনী থেকেই প্রতিফলিত। এ কাহিনীর উদ্ভব বাংলা দেশ (পূর্ব ভারত) হওয়া সম্ভব।

নবম-দশম শতাব্দীতে আরও একটি তপশ্চর্যা-যান দানা বেঁধে উঠছিল। এ তপস্যা দৈহিক বটে তবে হঠযোগের অর্থাৎ শ্বাসবায়ু-রোধের সাধনা নয়, অগ্নি ও সূর্যের তাপ সহ্য করার এবং শারীরিক যন্ত্রণা ও উপবাসের কষ্টভোগের সাধনা। এ হ'ল তপস্যা, অধ্যাত্মসাধনা নয়, ব্রত সাধনা, অর্থাৎ বিশেষ সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য তপশ্চর্যা। এ সাধনা নিরীশ্বরও নয়। এ মতে ঈশ্বর আকারহীন—নির্লেপ নিরঞ্জন। সেইসঙ্গে তিনি বৈদিক যম ও সূর্যও বটেন এবং পৌরাণিক সূর্য দেবতাও বটেন। এঁরই এক রূপ পুরাণে ধর্মযমের নামান্তর। এই দেবতার, সূর্যরূপী ধর্মের, প্রথম আভাস পাই মল্লসারুলে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসনে (ষষ্ঠ শতাব্দী)। (এই শ্লোকটির আগে লেখা কোন মৌলিক কবিতা বাংলা দেশ থেকে পাওয়া যায় নি।) তাম্রপট্টশীর্ষে সপ্তরশ্মিহস্ত সূর্যের চিত্র আছে, তার পিছনে ধর্মরথচক্র। শ্লোকটি এই,

[জয়তি ত্রিলো]কনাথঃ যঃ পুংসাং সুকৃতকর্মফলহেতুঃ।
সত্যতপোময়মূর্তি র্লোকদ্বয় সাধনো ধর্মঃ॥

'[জয় হয় ত্রি]লোকনাথের যিনি পুরুষের সুকৃত কর্মফলের হেতু, সত্য এবং তপস্যা যাঁর মূর্তি, (যিনি) উভয়লোকে সিদ্ধিদাতা, ধর্ম॥'

প্রায় এক শ বছর পরেকার একটি অনুশাসনে (ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রপট্ট) প্রথমে শিবের বন্দনা, তারপরে এই ধর্মের।

জয়তি জগদেকবন্ধু র্লোকদ্বিতয়স্য সম্পদো হেতুঃ।
পরহিতমূর্তিরদৃষ্টঃ ফলানুমেয়স্থিতি র্ধর্মঃ॥

'জয় হয় জগতের একমাত্র বন্ধু, উভয় লোকের সম্পদের হেতু, পরহিতে মূর্তিমান্, অগোচর, ফলের থেকে (যাঁর) উপস্থিতি অনুমিত (হয়), (সেই) ধর্মের॥'

৬

ব্রাহ্মণ্য মতে নবাগত দেবতা

নবম-দশম শতাব্দীর মধ্যে এদেশে ব্রাহ্মণ্য মতে কয়েকটি নূতন দেব-দেবীর পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাচীন কাল থেকেই পূর্ব-ভারতের, বিশেষ ক'রে বাংলা দেশের, পুরাতন গ্রামগুলিতে গ্রামের প্রভুরূপে দেব ও দেবীর উপাসনা চলিত ছিল।[১] দেবের প্রতীক শিলাখণ্ড (সাধারণত একটু দীর্ঘাকৃতি) এবং দেবীর প্রতীক ঘটপূর্ণ বারি, কদাচিৎ বা শিলাখণ্ড (সাধারণত চেপ্টা আকারের)। যখন থেকে এই গ্রাম-দেবদেবীর উল্লেখ পাচ্ছি তখন গ্রামদেব হয়েছেন ধর্মঠাকুর আর গ্রামদেবী হয়েছেন মনসা (বিষালাক্ষী ; পরে বিশালাক্ষী হ'য়ে বাশুলী বা চণ্ডী হয়েছেন)।

ধর্মের মতো মনসাও খানিকটা বৈদিক গল্পাশ্রিত। তিনি একাধারে প্রজাপতির কন্যা এবং নদী ও পুষ্টি দেবতা—ইলা, সরস্বতী। পরবর্তী কালের বাংলা মিথলজিতে কার্তিকের মতোই মনসা অযোনিজ শিবের বীর্যসম্ভূত সন্তান, তবে স্বর্গে জাত নয়, পাতালে নাগদের কর্মশালায় নির্মিত। শিবের কন্যা হ'য়েও মনসা তাঁর মনে প্রেম উদ্রেক করেছিল। সেইজন্য শিবভার্যা চণ্ডীর সঙ্গে মনসার চির-বিবাদ। মনসার জলময়ী রূপ যমুনা-গঙ্গা (অর্থাৎ জোড়া গঙ্গা), পরে শুধুই গঙ্গা, শিবের মাথায় ঠাঁই পেয়েছিল।

মনসা চণ্ডী ও গঙ্গার পূজা অষ্টম-নবম শতাব্দীর আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব'লে মনে করি।[২] মনসার উৎপত্তি অপর দুই দেবতার আগে, তবে এ দেবতার স্বীকৃতি সবার আগে দিয়েছিল নিরীশ্বর যোগী

[১] যে গ্রামে এখনও গ্রামদেবী আছেন সেখানে দুর্গাপূজায় আগে গ্রাম-দেবীর পূজা ও বলি দিতে হয়। গ্রামদেব অনেক স্থানেই শিবঠাকুরে পরিণত হ'য়েছেন

[২] দেবপালের অনুশাসন থেকে জানা যায় যে ধর্মপালের কোন কোন কর্মচারী গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান করেছিলেন।

সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণ্য মতের পুরাণ কাহিনীতে মনসা (বা বিষহরি) অনেক পরে ঠাঁই পেয়েছে, এবং তাও এককোণে। ব্রাহ্মণ্য মতের পূজা-পদ্ধতিতে অষ্টনাগের পূজা মনসার পূজার অনেক আগে থেকে প্রচলিত হয়েছিল। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে এবং তার পরে নির্মিত মনসার স্থাপত্য মূর্তি উত্তরবঙ্গে অনেক পাওয়া গেছে। এই মূর্তি তিন রকমের, চতুর্ভুজ অথবা দ্বিভুজ আসীন, এবং কোলে শিশু, অথবা গজারূঢ়। শেষোক্ত মূর্তি গজলক্ষ্মী নামে পরবর্তী কালে পুজিত হয়েছে। তবে পুরানো ভাস্কর্যগুলি আদিতে পূজার জন্য নয় প্রধানত অলঙ্করণের জন্যই নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়। (এ কথার প্রমাণ রয়েছে লক্ষ্মণসেনের মহামন্ত্রী আচার্য গোবর্দ্ধনের আর্যাসপ্তশতীর এই শ্লোকে,

> পূজা বিনা প্রতিষ্ঠাং নাস্তি ন মন্ত্রং বিনা প্রতিষ্ঠা চ।
> তদুভয়বিপ্রতিপন্নং পশ্যতু গীর্বাণপাষাণম্॥

'প্রতিষ্ঠা ছাড়া পূজা হয় না, প্রতিষ্ঠাও মন্ত্র ছাড়া হয় না। এই উভয় ধারণাই পরস্পর বিরুদ্ধ প্রতিপন্ন হয়েছে। দেবতার পাষাণমূর্তি দেখুন॥')

গোবর্ধন আচার্যের উক্তি থেকে মনে হয় যে তাঁর সময়েও লোকে প্রাচীন মূর্তিকে ফুল জল নৈবেদ্য দিয়ে পূজা মানসিক ক'রত॥

৭

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য মতের মিলন

একাদশ শতাব্দীর অনেক আগে থেকেই সাধারণ লোকের মধ্যে বৌদ্ধ-ভাবনার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যভাবনার মিশ্রণ—অর্থাৎ বুদ্ধ-বোধিসত্ত্ব উপাসনার সঙ্গে শিব-বিষ্ণুর উপাসনার বিরোধ লুপ্ত হ'য়ে আসছিল। ঝোঁক প'ড়ছিল ব্রাহ্মণ্যভাবনার প্রতি। তার কারণ রাজসভার মারফৎ, এবং রাজসভার বাইরেও, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্রুতবর্ধমান প্রভাব। রাজসভা ও ধনী সমর্থিত ব্রাহ্মণ্য আচার জনগণের মধ্যে জাতিবিচারের মধ্যে দিয়ে কিছু বিভেদ এনে দিয়েছিল। এই বিভেদ ঘটেছিল ধীরে ধীরে এবং ধন ও ক্ষমতা সঞ্চয়ের সূত্র-পথে। তার উপর বৌদ্ধ মতে তান্ত্রিকতা এসে পড়ায় সে মতের সর্বসাধারণের জন্যে খোলা সদর রাস্তা আর রইল না, মুষ্টিমেয়ের জন্যে দরজা রইল গোপন খিড়কি পথে। তাই ব্রাহ্মণ্যপন্থীদের কোন চাপে নয়, অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই বৌদ্ধ মত ক্ষীণবল হ'য়ে প'ড়তে লাগল এবং খাঁটি বৌদ্ধরা সংখ্যায় ক'মে আসতে লাগল। সংখ্যালঘুত্বের ফলেই উচ্চতর সমাজে বৌদ্ধ আচার নিন্দনীয় হ'ল, ব্রাহ্মণ্য আচার প্রতিষ্ঠিত হ'ল। শিক্ষিত ও বোদ্ধা সমাজে কিন্তু দু মতের মধ্যে বিরোধ হয়ত থাকলেও বিদ্বেষ বিশেষ ছিল না। নবম-দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে (এবং তার কত আগে থেকে জানি না) ভদ্র উচ্চতর সমাজে দু মতের সমন্বয়ের অনুকূল স্রোত প্রবাহিত ছিল। এবং আরও জানা যায় সে বৌদ্ধপন্থীরা ধীরে ধীরে শৈবপন্থীদের সঙ্গে মিলে আসছিল। এই প্রসঙ্গে চান্দ্রব্যাকরণের বৃত্তিকার ধর্মদাসের উদ্ধৃত এই শ্লোকটি তাৎপর্যপূর্ণ,[১]

> রুদ্রো বিশ্বেশ্বরো দেবো যুষ্মাকং কুলদেবতা।
> মারজিদ্ ভগবান্ বুদ্ধঃ অস্মাকং কুলনন্দনঃ॥

মনে হয় কোন রাজা বা তত্তুল্য ব্যক্তির প্রতি আশীর্বাদ শ্লোক।

'রুদ্র বিশ্বেশ্বর দেব তোমাদের বংশের ঠাকুর। মার-জয়কারী ভগবান্ বুদ্ধ আমাদের বংশের আনন্দবর্ধন॥'

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য মতের মধ্যে প্রথম সন্ধি হয়েছিল পাশুপত অর্থাৎ এক সম্প্রদায়ের শৈবদের উপাসনায়। তার কিছু বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ কারণ আছে। বহিরঙ্গ কারণ হ'ল শিবলিঙ্গ ও বৌদ্ধস্তূপের মধ্যে আকৃতিগত কিছু মিল। (শিব-লিঙ্গের ঢাকা স্পষ্টতই বৌদ্ধ স্তূপকে স্মরণ করায়।[১]) অন্তরঙ্গ কারণ হ'ল দু সম্প্রদায়ের ভিক্ষু-আচার্যেরা বিহার অথবা মঠবাসী, এবং বুদ্ধ ও শিব দু দেবতাই যোগী। দু মতের মিলনের এক উজ্জ্বল সাক্ষ্য দিচ্ছে একটি ব্রোন্‌জের শিবমূর্তি, শিবের মাথার উপরে বুদ্ধ-বোধিসত্ত্ব (নিদর্শনে দ্রষ্টব্য)।[২]

নারায়ণপাল যে পাশুপত বিহার (মঠ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে ব্যাপারও এইসঙ্গে স্মর্তব্য।

বৈষ্ণব মতের সঙ্গে বৌদ্ধ মতের মিল হয়েছিল গভীরতর। তার কারণ বাংলা দেশে যে মহাযান মত চলিত ছিল তাতে আগে থেকে ভক্তিরসের গভীরতা দেখা দিয়েছিল এবং সেই সূত্র ধরেই বাংলা দেশের বৈষ্ণবধর্ম বৌদ্ধ মতকে আত্মসাৎ ক'রে ফেলেছিল। বৌদ্ধ সাধকদের সমস্ত বাহ্য প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল একটিমাত্র—"সর্বজনহিতসুখায়"। বৈষ্ণবদের নিবেদনও তাই "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়"। বরেন্দ্রভূমির থেকে রামচন্দ্র কবি-ভারতী (ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) সিংহলে গিয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র প'ড়ে মহাপণ্ডিত হন। সিংহলের রাজা পরাক্রমবাহ তাঁকে "বৌদ্ধাগমচক্রবর্তী" উপাধি দেন। সেখানে থেকে রামচন্দ্র 'ভক্তিশতক' রচনা করেন এবং বৃত্তরত্নাকরের টীকা লেখেন 'বৃত্তমালা' নামে। এই দুটি গ্রন্থে তাঁর আত্মপরিচয় যৎকিঞ্চিৎ আছে। ভক্তিশতকের একটি চমৎকার শ্লোকে

[১] বল্লালসেনের রাজ্যাঙ্ক নবম বর্ষের লিপি-যুক্ত ঢাকাটির চিত্র দ্রষ্টব্য (এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা ৩৩ খণ্ড)। [২] এটি একটি পাশুপত মঠে অর্থাৎ শৈব বিহারে প্রদত্ত হয়েছিল।

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য মতের সমন্বয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। এতে বুদ্ধ ও শিবের অভিন্নত্ব কল্পিত।

জ্ঞানং যস্য সমস্তবস্তুবিষয়ং যস্যানবদ্যং বচো
যস্মিন্ রাগলবোঽপি নৈব ন পুনর্দ্বেষো ন মোহস্তথা।
যস্যাহেতুরনন্তসত্ত্বসুখদানল্পা কৃপামাধুরী
বুদ্ধো বা গিরিশোঽথবা স ভগবাংস্তস্মৈ নমস্কুর্মহে॥

'জ্ঞান যাঁর সমস্ত বস্তু ও বিষয় ব্যাপী, বাক্য যাঁর নির্মল, চিত্তে যাঁর আসক্তির কণামাত্র নেই এবং দ্বেষ ও মোহও নেই, যাঁর অহেতু অজস্র কৃপামাধুরী অনন্ত সুখ দান করছে,—(তাঁকে) বুদ্ধই (বলি) অথবা গিরিশই (বলি)—সেই ভগবান্‌কে আমরা নমস্কার করি॥'

ভক্তিশতকের আর দুটি শ্লোকে যেন চৈতন্যের শিক্ষাষ্টকের পূর্বধ্বনি শুনতে পাই।

মাতেবাসীৎ পরস্ত্রী ভবতি পরধনে ন স্পৃহা যস্য পুংসো
মিথ্যাবাদী ন যঃ স্যান্ন পিবতি মদিরাং প্রাণিনো যো ন হন্যাৎ।
মর্যাদাভঙ্গভীরুঃ সকরুণহৃদয়স্ত্যক্তসর্বাভিমানো
ধর্মাত্মা তে স এব প্রভবতি ভগবন্ পাদপূজাং বিধাতুম্॥

'পরস্ত্রী যে-পুরুষের কাছে মায়ের মতো, পরধনে যার স্পৃহা নেই, যে কখনো মিথ্যা বলে না, মদ্যপান করে না, যে প্রাণিদের হিংসা কখনো করে না, মানী ব্যক্তিকে অবমাননা করতে যে পরাঙ্মুখ, যার হৃদয় করুণায় পূর্ণ, সকল অভিমান যে ত্যাগ করেছে—সেই ধর্মাত্মাই, হে ভগবান্, তোমার পায়ে পূজা দেবার অধিকারী॥'

তদপকৃতি স্তব লোকনাথ পীড়া।
জিন জগদপকৃৎ কথং ন লজ্জে
গদিতুমহং তব পাদপঙ্কজভক্তঃ॥

'জগতের উপকারসাধনই বুদ্ধের পূজা। তার (অর্থাৎ জগতের) অপকারসাধনই, হে লোকনাথ, তোমার পীড়া। হে জিন, জগতের

অপকারী আমি কেন লজ্জা বোধ করছি না এই কথা উচ্চারণ করতে যে আমি তোমার পাদপঙ্কজের ভক্ত ॥'

বৌদ্ধ মত ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য মতে নিলীন হ'য়ে এল এবং তার স্পষ্ট চিহ্ন র'য়ে গেল বিষ্ণুর দশাবতার-মধ্যে বুদ্ধের অন্তর্ভুক্তিতে। এই ব্যাপার দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই ঢুকে গিয়েছিল। বিদ্যাকর বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁর শ্লোকসংগ্রহে হরিব্রজ্যায় মৎস্য কূর্ম বরাহ নৃসিংহ ও বামন —দশাবতারের মধ্যে এই পাঁচ অবতারের বন্দনা আছে। শ্রীধরদাস বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁর সংগ্রহে মৎস্য কূর্ম বরাহ নরসিংহ বামন পরশুরাম শ্রীরাম হলধর (বলরাম) বুদ্ধ ও কল্কী—দশাবতারের বন্দনা শ্লোকগুচ্ছ। আছে। নরসিংহ ও শ্রীরাম ছাড়া আর সকলেরই, এবং বুদ্ধেরও, পাঁচটি ক'রে শ্লোক। নরসিংহের পনেরোটি। (তার কারণ লক্ষ্মণসেন নরসিংহের ভক্ত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর কোন কোন অনুশাসনে প্রাপ্ত বিরুদ "পরমনারসিংহ"।) শ্রীরামের বিষয়ে আছে দশটি শ্লোক।

সুভাষিতরত্নকোশে রামের বন্দনাপদ নেই এবং রাম-কাহিনী নিয়ে রচিত কোন শ্লোকও নেই। কিন্তু হরিপ্রজ্যায় উদ্ধৃত দুটি শ্লোকে রামের যে ভাবে উল্লেখ আছে তাতে তিনি বিষ্ণুর অবতার রূপে স্বীকৃত। শ্লোক দুটি সদুক্তিকর্ণামৃতেও আছে। একটি উদ্ধৃত করছি। এটি শুভাঙ্কের (বা শুভাঙ্গের) রচনা।

> এতে লক্ষ্মণ জানকীবিরহিণং মাং খেদয়ন্ত্যম্বুদা
> মর্মাণীব চ ঘট্টয়ন্ত্যলম্ অমী ক্রূরা কদম্বানিলাঃ।
> ইত্থং ব্যাহৃতপূর্বজন্মবিরহো যো রাধয়া বীক্ষিতঃ
> সের্ষ্যং শঙ্কিতয়া স বঃ সুখয়তু স্বপ্নায়মানো হরিঃ ॥

'হে লক্ষ্মণ, জানকীবিরহিত আমাকে কষ্ট দিচ্ছে মেঘাড়ম্বর, ওই কদম্ব-গন্ধবাহী নিষ্ঠুর বায়ু আমার মর্ম পীড়িত করছে।—এই ভাবে পূর্বজন্মের বিরহস্মৃতি-ব্যক্তকারী যাঁকে শঙ্কিত রাধা ঈর্ষাময় কটাক্ষে অবলোকন করেছিলেন স্বপ্নের ঘোরে প্রলাপকারী সেই হরি তোমাদের সুখ প্রদান করুন ॥'

৮

রাম-ভজনা

ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে রাম-পূজার প্রচলনের কিছুমাত্র প্রমাণ নেই। রামের কীর্তি কাব্যগাথায় প্রসিদ্ধ ছিল এবং পরবর্তী কালে মন্দির-ভিত্তির অলঙ্করণে সমাদৃত হয়েছিল। কিন্তু রামের কোন প্রস্তর বা ধাতু প্রতিমা (icon) মেলে নি। তবে মন্দিরগাত্রে রামায়ণ-কাহিনীর চিত্রাবলী মিলেছে। মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই রাম-বিষ্ণু-মন্ত্রে উপাসনা এদেশে প্রচলিত হয়েছিল। রামায়েত বৈষ্ণবেরা পশ্চিমের আমদানি। এদেশে রামসীতা-মূর্তির উপাসনার কোন নজির ষোড়শ শতাব্দীর আগে পাওয়া যায় না।

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুর দশাবতার-ভাবনা জনসমাজে প্রচলিত হয়েছিল। এগুলি সবই এদেশে পূজিত অথবা মানিত দেবতা অথবা দেবকল্প সিদ্ধ। মৎস্য হ'লেন যোগীসিদ্ধদের মৎস্যেন্দ্রনাথ। কূর্ম সূর্যদেবতার প্রতীক ও ধর্মদেবতার আসন। বিষ্ণুর তিন অবতার বিগ্রহরূপে পূজা পেয়েছিল—বরাহ, বামন ও নরসিংহ। হলধর-বলরামের পূজার উল্লেখ ষোড়শ শতাব্দী থেকে পাওয়া যাচ্ছে, তবে বলরামের পূজা প্রাচীনতর ব'লে মনে হয়। পরশুরাম ও কল্কী গল্পকথায় সম্ভ্রম আকর্ষণ করেছিল, কখনোই পূজা পায় নি। দাশরথি রামের কথা আগেই বলেছি। কৃষ্ণ-পূজা তখনো অজ্ঞাত, সুতরাং কৃষ্ণ এই তালিকা-ভুক্ত হন নি। তা ছাড়া, তিনি অবতারের উর্ধ্বে—ষোল আনা বিষ্ণু।

শতপথ-ব্রাহ্মণে যে মনু-মৎস্য কাহিনী আছে তার সঙ্গে মৎস্যাবতারের কোন সম্পর্ক নেই। তার সম্পর্ক আছে বাবিলোনীয় পুরাণকাহিনীর সঙ্গে। পরবর্তী কালের নাথ-সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যে যে মৎস্যেন্দ্রনাথের গল্প আছে, তার সঙ্গেও এর সম্পর্ক নেই। মনে হয় মৎস্যাবতারের মূলে ছিল খুব পুরানো এক রূপকথা যাতে বেদ (বা মহাজ্ঞান) মৎস্য গ্রাস ক'রে রক্ষা করেছিল।

বিষ্ণুর বরাহ-রূপের পূজা পঞ্চম শতাব্দীর অনুশাসনে উল্লিখিত আছে, সে কথা যথাস্থানে বলা হয়েছে। পরবর্তী কালে বরাহ-মূর্তি বেশির ভাগ স্থাপত্য অলঙ্কারেই ব্যবহৃত হয়েছে। সদুক্তিকর্ণামৃতের সঙ্কলনকারী শ্রীধরদাসের পৈতৃক দেবতা ছিল আদিবরাহ।[১] পঞ্চম শতাব্দীর অনুশাসনে যে কোকামুখস্বামীর উল্লেখ আছে তা মনে হয় বিষ্ণুর নরসিংহ-মূর্তির। স্থাপত্যে ও ধাতুনির্মিত প্রতিমায় নরসিংহের মুখ পরিচিত সিংহের মুখ নয়, নেকড়ে বাঘের মুখ। নরসিংহ-মূর্তির পূজা এদেশে ক্রমশ লোপ পেয়ে আসে। তবে লক্ষ্মণসেন যে নরসিংহভক্ত হয়েছিলেন তার দুটি কারণ অনুমান করি। এক, দক্ষিণ দেশে অভিযানের সময়ে হয়ত তিনি এই উপাসনা শিখে আসেন। দুই, হয়ত বা অভিচারকর্মের জন্য তিনি নারসিংহ মত আশ্রয় করেছিলেন। শেষ বয়সে লক্ষ্মণসেন জ্যোতিষে ও তুকতাকে বিশ্বাসী হ'য়ে পড়েছিলেন ব'লে মনে করি।

বামন-অবতারে বিষ্ণুর বোধ করি সবচেয়ে প্রাচীন একটি রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। বৈদিক গদ্য সাহিত্যে বিষ্ণুর শিশুরূপ হ'ল যজ্ঞের প্রতীক। অসুরেরা দেবতাদের স্বাধিকারচ্যুত করলে তাঁরা কি ক'রে ক্রমবর্ধমান শায়িত শিশুবিষ্ণুর মাহাত্ম্যে অসুরদের বহিষ্কৃত ক'রতে পেরেছিলেন সে কাহিনী কোন কোন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে বর্ণিত আছে। পৌরাণিক বলি-বামন উপাখ্যান সেই বৈদিক কাহিনীরই পরবর্তী কালের রূপান্তর। ধর্মপালের খালিমপুর অনুশাসনে উল্লিখিত "নন্ন-নারায়ণ" আমি বামন-অবতার মূর্তি ব'লে মনে করি।[২] পরবর্তী কালে বামন-মূর্তি বিষ্ণু শিশু গোপালকৃষ্ণের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে॥

[১] সদুক্তিকর্ণামৃত ৩. ৭৫. প্রতিবাজস্তুতি ১। [২] নম্ন<নম্র ?

৯

চণ্ডী মনসা ও গঙ্গা পূজা

ভারতবর্ষের পুণ্যতম নদী ব'লে গঙ্গার প্রসিদ্ধি সুদীর্ঘকালের। গঙ্গা হরজটানিবাসিনী, তাঁকে স্বর্গ থেকে মর্তে অবতরণ করিয়ে সাগরে মিলিয়ে দিয়েছিলেন ভগীরথ—এ পৌরাণিক কাহিনীও অর্বাচীন নয়। গঙ্গাবিধৌত অঞ্চলে কৃষি-সমৃদ্ধির হেতু এবং পূর্বভারতে প্রধান সদানীর নদী ব'লে গঙ্গার এই সম্মানের সূত্রপাত। তারপরে বাণিজ্য-পথ বলে গঙ্গার মূল্য আরও বেড়ে যায়। অবশেষে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অবসান-কাল থেকে পূর্ব-ভারতের তথা বাংলা দেশের প্রশাসনে যখন নৌবলের গুরুত্ব বেড়ে গেল তখন থেকে গঙ্গার মাহাত্ম্য যেন পরিপূর্ণ রূপ পেলে। দশম শতাব্দী থেকে বাংলা দেশে শৈব মতের প্রসার বেড়ে যায় এবং শিবসঙ্গিনী ব'লে গঙ্গার মাহাত্ম্যও সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু গঙ্গা তো শুধু শিবজটাসন নন, তিনি আবার বিষ্ণুর দ্রবীভূত রূপও, ব্রহ্মার কমণ্ডলুস্থিত। প্রধানত এই শেষের ভাবনাই পরবর্তী কালের গঙ্গাভক্তির মূলে আছে।

নদীদেবতা গঙ্গার দেবভাবনা দশম শতাব্দীর আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যোগপন্থী বৌদ্ধ আচার্যের লেখা অবহট্‌ঠ ছড়ায় প্রসিদ্ধ তীর্থ ব'লে গঙ্গাসাগরের নাম আছে প্রয়াগ ও বারাণসীর সঙ্গে। এ দুটি তীর্থও গঙ্গাতীরে অবস্থিত। গঙ্গার মাহাত্ম্য তার জলে পূর্ণভাবে নিহিত বলে গঙ্গাদেবীর মূর্তিপূজা স্বতন্ত্রভাবে প্রচলিত হয় নি। সব পৌরাণিক দেবদেবীর পূজাতেই গঙ্গাজল লাগে এবং গঙ্গাজল ছাড়া কোন পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান চলে না। দশম-একাদশ শতাব্দীতে দেখি যে বৌদ্ধ রাজারাও গঙ্গাস্নান ক'রে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান ক'রছেন।[১] বৌদ্ধ বিদ্যাকরের সঙ্কলিত এই গঙ্গাপ্রশংসা শ্লোকটি চমৎকার,

[১] "বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য···গঙ্গায়াং স্নাত্বা শাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ।' (মহীপালের বাণগড় শাসনপট্ট)।

গৌরীবিভজ্যমানার্ধসংকীর্ণে হরমূর্ধনি।
অম্ব দ্বিগুণগম্ভীরে ভাগীরথি নমোঽস্তু তে॥

"গৌরী অর্দ্ধেক ভাগ নেওয়ায় সঙ্কীর্ণ হর-শিরে তুমি দ্বিগুণ গভীর হয়েছ। মা ভাগীরথী, তোমাকে নমস্কার॥'

শক্তিদেবীর অনেক রূপ এবং তার অনেক মূল। কোন কোন মূলের শিবকাহিনীর সঙ্গে কোনই সম্পর্ক ছিল না। গৌরী দুর্গা চণ্ডী চর্চিকা (চর্চা) কালরাত্রি (কালী)—ইত্যাদি দেবী যা পূর্বে অল্প বিস্তর স্বতন্ত্র ছিল তা দশম-একাদশ শতাব্দীতে শিবগৃহিণীর বিচিত্র রূপ ব'লে গৃহীত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে গৌরীই পুরোপুরি সৌম্যদেবতা এবং শিবের অর্ধাঙ্গভাগিনী হিসাবে পূজিত। দুর্গা আসলে দুর্গম পন্থায় অভয়দায়িনী দেবী, ঋক্‌বেদের অরণ্যানী। তার সঙ্গে মিশে গেছে মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর কাহিনী। চণ্ডী দুর্গার নামান্তর। দুর্গা-চণ্ডীর মূর্তি পূজিত হয় সাধারণত দশভুজা রূপে, তবে অষ্টভুজা ও অষ্টাদশভুজা মূর্তিও অজ্ঞাত নয়। দ্বিভুজা মূর্তি হল অরণ্যানীর, অভয়দায়িনী চণ্ডীর। চতুর্ভুজা মূর্তি মঙ্গলবিধায়িনী। চর্চিকা (চর্চা) মূর্তি ক্ষুধিত হিংস্র ডাকিনীর। নামটির ধাতুগত অর্থ হল 'ভয়দেখানে, ক্ষতিকর'। ত্রয়োদশ শতাব্দীর থেকে চর্চিকার পরিবর্তে চামুণ্ডা নামটি বেশি ব্যবহৃত হ'তে থাকে। কালরাত্রি (বা কালী) ভৈরবের সঙ্গিনী, যেমন গৌরী শিবের।

এদেশের রাঢ় অঞ্চলে আরণ্য-চণ্ডীর পূজা নিম্নস্তরের জন-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই বনদেবী চণ্ডী শুম্ভ-নিশুম্ভদলনী মহিষাসুরমর্দিনী পৌরাণিক দশভুজা চণ্ডীর সঙ্গে প্রথমে পৃথক ছিলেন, পরে (একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দে ?) দুটি দেবী-ভাবনা মিশে যায়। তার ফলে মঙ্গলচণ্ডীর ও অভয়া-চণ্ডীর ভিন্নমূর্তির সৃষ্টি হয়। উচ্চতর সমাজে মঙ্গলচণ্ডীর (এবং অভয়-চণ্ডীর) প্রতিষ্ঠা সেনরাজাদের সময়েই ঘটেছিল। (সেনরাজারা আগে রাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন।) মঙ্গলচণ্ডী চতুর্ভুজা, অভয়াচণ্ডী দ্বিভুজা। লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত

মঙ্গলচণ্ডীর মূর্তি পাওয়া গেছে। অভয়া-চণ্ডীর বর্ণনা পেয়েছি হরি নামক কবির এই চমৎকার শ্লোকে,

ত্রিভুবনশুভপঞ্জিকাঞ্জিকেব
স্ফূরতি ভবানি তবাঙ্কুশঃ করাগ্রে।
ডমরুরপি বিভর্তি দেবি
তত্তদ্‌বিপদাবসানবিসর্জনীয়ত্বম্‌॥

'হে ভবানী, তোমার (দক্ষিণ) করাগ্রে শোভা পায় অঙ্কুশ ত্রিভুবনের শুভ-পঞ্জিকার আঞ্জিকার[১] মতো। হে দেবী, (তোমার বাম হাতে) ডমরুও[২] সেই সেই[৩] বিপদনাশের বিসর্জনীয়-রূপ[৪] ধারণ করে॥'

বনদুর্গার বা অরণ্যচণ্ডীর পূজার একটু বিবরণ পাওয়া যায় অজ্ঞাত-নাম কবির একটি শ্লোকে, সদুক্তিকর্ণামৃতে।

তৈস্তৈর্জীবোপহারৈর্গিরিকুহরশিলাসংশ্রয়ামর্চয়িত্বা
দেবীং কান্তারদুর্গাং রুধিরমুপতরু ক্ষেত্রপালায় দত্ত্বা।
তুম্বীবীণাবিনোদব্যবহিতসরকামহ্নি জীর্ণে পুরাণীং
হালাং মালূরকোষৈ র্যুবতিসহচরা বর্বরাঃ শীলয়ন্তি॥

'গিরিগুহায় শিলাখণ্ডরূপিণী দেবী বনদুর্গাকে নানাবিধ জীব বলি দিয়ে পূজা ক'রে, (অধিষ্ঠিত) গাছের তলায় ক্ষেত্রপালকে রক্ত দিয়ে, একতারা বাজিয়ে আমোদ-প্রমোদে সময় কাটিয়ে দিন শেষ হ'য়ে এলে বর্বর লোকেরা যুবতী সহচরী নিয়ে পুরানো মদ বেলের খোলায় ক'রে চেকে চেকে খায়॥'

গাছের তলায় শবোপরি উপবিষ্ট চামুণ্ডার শিলামূর্তি রাজসাহী অঞ্চলে পাওয়া গেছে। পাদপীঠের লিপি থেকে জানা যায় যে ইনি দেবী চর্চিকা॥

[১] গ্রন্থ লিখতে গেলে প্রথমেই যে শুভ চিহ্ন দেওয়া হ'ত। [২] এখানে কবি পাশকে ডমরু বলে ভুল করেছেন। [৩] অর্থাৎ যেমন যেমন আসে। [৪] এখানে শ্লেষ আছে, (১) একেবারে পরিত্যাগ, (২) বিসর্গ (ঃ)।

বিদ্যাকরের সময়ে চর্চা যে শিবগৃহিণীর ডাকিনী পরিজন মধ্যে গণ্য ছিল তা নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোক থেকে বোঝা যায়। শ্লোকটিতে ব্যঙ্গের ব্যঞ্জনা উপভোগ্য।[১]

চর্চায়াঃ কথমেষ রক্ষতি সদা সদ্যোনৃমুণ্ডস্রজং
চণ্ডীকেশরিণো বৃষং চ ভুজগান্ সূনোর্ময়ূরাদপি।
ইত্যন্তঃ পরিভাবয়ন্ ভগবতো দীর্ঘং ধিয়ঃ কৌশলং
কুষ্মাণ্ডো ধৃতিসংভৃতামনুদিনং পুষ্ণাতি তুন্দশ্রিয়ম্॥

'কি ক'রে যে ইনি সর্বদা টাটকা নৃমুণ্ডমালা চর্চার গ্রাস থেকে রক্ষা করেন, চণ্ডীর সিংহ থেকে বৃষকে, এবং পুত্রের ময়ূরের থেকে সাপগুলিকে! (শিব) ভগবানের বুদ্ধির কৌশল দীর্ঘকাল ধ'রে মনে ভেবে ভেবে কুষ্মাণ্ড[২] দিনের পর দিন ধৈর্য ধ'রে (নিজের) ভুঁড়ির বহর বজায় রেখে চলেছে॥'

ক্ষুধার্ত ডাকিনী চর্চা যে শিবগৃহিণীর রূপান্তর হয়ে পড়েছে তা সদুক্তিকর্ণামৃতের এই শ্লোক থেকেও বোঝা যায়। শ্লোকটি নীলাঙ্গের।

চর্চেয়ং ক্ষুধিতা সদৈব গৃহিণী পুত্রোঽপ্যয়ং ষণ্মুখো
দুষ্পূরোদরভারমন্থরবপুর্লম্বোদরোঽপি স্বয়ম্।
ইত্যেব স্বকুটুম্বমেকবৃষভো দেবঃ কথং পোক্ষ্যতী-
ত্যালোক্যৈব বিশুষ্কপঞ্জরতনু র্ভৃঙ্গী চিরং পাতু বঃ॥

'এই গৃহিণী চর্চা সর্বদাই খাই-খাই, এই ছেলেটিরও ছটা মুখ, লম্বোদর নিজেও বিরাট উদরের ভারে নড়ে চড়ে কম। এই তো নিজের সংসার। প্রভুর সম্বল একটি ষাঁড়। কি ক'রে নিজের সংসার পুষবে!—এই ভাবনায় ভৃঙ্গীর দেহের পাঁজর শুকিয়ে এল। সে তোমাদের চিরকাল পালন করুক॥'

চর্চিকা বৌদ্ধ তন্ত্রে বাদ পড়েন নি। সেখানে ইনি রক্তচর্চিকা।

[১] সদুক্তিকর্ণামৃতেও শ্লোকটি আছে। [২] শিবের এক অনুচর, অপদেবতা

কালরাত্রির নামান্তর যে-কালীর সে ঠিক কালিদাসের উল্লিখিত কালী নয়। কুমারসম্ভবে শিবের বরযাত্রার বর্ণনায় কালিদাস কালীকে বরযাত্রী শিবগণের মধ্যে ধরেছেন। "কালী কপালাভরণা চকাশে" (অর্থাৎ নরাস্থিভূষণা কালীকে বেশ দেখাচ্ছিল)। এখানে কালী ভৈরব-শিবের ভার্যা নয়, বিপত্নীক শিবের এক পরিচারিকা মাত্র। এখনকার কালী-কল্পনা আগেকার কালরাত্রি-কালী কল্পনা থেকে যে কতটা পৃথক্ তা উমাপতিধরের এই শ্লোক থেকে প্রতিপন্ন হবে,

> সদ্যঃপ্রধ্বস্তদেবাসুরসরসশিরঃশ্রেণিশোণারবিন্দ-
> স্রগ্ দামানদ্ধমূর্তের্ঘনরুধিরকণাক্লিন্নচর্মাংশুকস্য।
> নিষ্পর্যায়ত্রিলোকীভবকবলরসব্যাত্তবক্ত্রস্য জীয়াদ্
> আনন্দঃ কালরাত্রীকুচকলসপরীরম্ভিণো ভৈরবস্য॥

'সদ্য নিহত দেব ও অসুরের আর্দ্র মুণ্ডের রক্তকমল-মালাধারী, ঘন রুধিরকণায় সিক্ত চর্মাম্বর পরিহিত, ত্রিভুবনের জীব জীবন-রস যথেচ্ছ গ্রাস কাজে যাঁর মুখ হাঁ করা, কালরাত্রির কুচকুম্ভ আলিঙ্গন-কারী সে ভৈরবের আনন্দ জয়ী হোক॥'

এ ছবি যেন বৌদ্ধ-তান্ত্রিক হেরুক-নৈরাত্মা (মহামায়া) যুগনদ্ধ-রূপের ব্রাহ্মণ্য প্রতিচ্ছবি। ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক কালরাত্রি-ভৈরব ভাবনা পরে (?) বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের অজ্ঞাত ছিল না। অদ্বয়বজ্র (ত্রয়োদশ শতাব্দী) রচিত বজ্রবারাহী-সাধনে দেবীকে বর্ণনা করা হয়েছে "প্রত্যালীঢ়পদাক্রান্তভৈরবকালরাত্রিকাম্"।

সাহিত্যে উল্লিখিত হয় নি এমন একটি প্রাচীন দেবীর পূজা দশম শতাব্দী থেকে কোন কোন অঞ্চলে জনসমাজে বিশেষ আগ্রহের সহিত অনুষ্ঠিত হ'ত। ব্রাহ্মণ্য মতে ইনি বিষহরি-মনসা। পরবর্তী কালে, পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে, মনসার কাহিনী সাহিত্যে প্রকাশ পেতে থাকে। তবে স্থাপত্যে এঁর মূর্তি দশম শতাব্দী থেকে পাওয়া যাচ্ছে।[১]

[১] বিষহরি-মনসার ঐতিহ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মৎসম্পাদিত বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ের (এসিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা ১৯৫৩) ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

আগেই বলেছি মনসা জলদেবী, গঙ্গার থেকে হয়ত প্রাচীন। যেহেতু বিষনাশক জল মোক্ষদাতা জলের তুলনায় হীন তাই গঙ্গার মাহাত্ম্য মনসার মাহাত্ম্যকে ঝেঁপে ফেলেছে। গঙ্গার সঙ্গে মনসার মিল গভীর। তবে অর্বাচীন পৌরাণিক কাহিনীতে গঙ্গা মকরবাহিনী, শিবজটাবাসিনী আর মনসা কূর্মবাহিনী, শিবদুহিতা। গঙ্গা দুর্গার সপত্নীর মতো, মনসা দুর্গার সপত্নীকন্যার মতো। দুর্গার সঙ্গে মনসার বিরোধ যেন স্থল-জলের বিরোধের রূপক। দুর্গার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মনসা—পদ্মা নাম ধ'রে—দুর্গার প্রধান সহচরী হয়েছেন। মনসার 'পদ্মা' নাম অহেতুক বা আকস্মিক নয়। পদ্মা লক্ষ্মীরই প্রসিদ্ধ নাম এবং লক্ষ্মীও জলদেবী তবে সাগরসম্ভূতা। মনসার উৎপত্তি হয়েছিল পদ্মের মৃণালগর্ভে, এই হেতু অর্বাচীন পৌরাণিক কাহিনীতে তাঁর নাম পদ্মাকুমারী বা পদ্মা।

মনসার পূজা দশম-একাদশ শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গেই বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল কেননা পুরানো মূর্তিগুলি প্রায় সবই ওই অঞ্চলের। সেন-রাজারা রাঢ়ের লোক, তাঁদের দেশের মুখ্য দেবী ছিলেন মঙ্গলচণ্ডী। সেন-রাজাদের আমলেই মঙ্গলচণ্ডীর পূজা বঙ্গভূমির অন্যত্র প্রচলিত হ'তে থাকে॥

১০

বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত

বৌদ্ধ মহাযান ধর্মে তান্ত্রিকতা সঞ্চারিত হয় পাল-রাজবংশের অধিকারের সূত্রপাত থেকে। তখন এদেশে তিব্বতের সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু হয়েছে। অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বতের থেকে তান্ত্রিকতার বড় ঢেউ এসেছিল নিশ্চয়ই, এবং ধর্মপাল তান্ত্রিক মতের যথেষ্ট পোষকতা করেছিলেন তাও স্বীকার্য। তবে এদেশে ধর্মসাধনার নামে অথবা কাজে দ্বীন্দ্রিয়-সমাপত্তি ব্যাপার যে অজ্ঞাত ছিল তা বলা যায় না। ব্রাহ্মণ্য মতে শক্তিদেবীর উপাসনা বহুকাল থেকে প্রচলিত ছিল, তবে তাতে তান্ত্রিকতার ছাপ ছিল বড় জোর মৎস্য-মাংস পর্যন্ত। বাকি তিন মকারের—মদ্যের, মুদ্রার (অর্থাৎ নাচগানের) ও মৈথুনের—প্রথম দেখা পাওয়া গেল বৌদ্ধ তান্ত্রিক বজ্রযানের অনুষ্ঠানে।

দ্বীন্দ্রিয়-সমাপত্তি সুখের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান রসের তুলনা আছে উপনিষদে। সেখানে মৈথুনক্রিয়াকে যজ্ঞের প্রতীকরূপেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সৃষ্টি-কাজের প্রতীক প্রজনন ক্রিয়া। সেই ক্রিয়ার দুই সাধক —পুরুষ ও প্রকৃতি (নারী)। এই মূল দ্বৈতবাদ সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত। পুরুষ প্রধান, তিনি ঈশ্বর। তাঁর বাহ্য প্রতীকরূপে লিঙ্গপূজা অনেক আগেই চলিত হয়েছিল। কিন্তু সে পূজা, তান্ত্রিক উপাসনা নয়। প্রকৃতি অপ্রধান, তিনি মায়াবিনী। তাঁর বাহ্য প্রতীক অনেককাল পরে 'যন্ত্র'-রূপে প্রচলিত হয় এবং সে উপাসনায় এসেছিল এই তান্ত্রিকতা। তান্ত্রিক সাধনা পূর্ব-ভারতে বৌদ্ধ বজ্রযানীদের দ্বারাই পরিপুষ্টি লাভ করেছিল।

তান্ত্রিক সাধনায় তিব্বতীদের বিশিষ্ট দান, অনুমান হয়, শক্তির সহচরী এবং সাধকের সঙ্গিনী ডাকিনী-যোগিনী ইত্যাদির আড়ম্বর। বিকৃত ও বীভৎস মূর্তিগুলির কল্পনা তিব্বত থেকে ও তিব্বতের মধ্য দিয়ে চীন থেকে বহুলাংশে আগত ব'লে মনে করা হয়। আমাদের দেশে

যে ভূতপ্রেতিনীর কল্পনা ছিল তা অনেকটা সোজাসুজি ও ছেলেমানুষি। নাদাপেটা কুবের, গোশীর্ষ নন্দী, কপালাভরণা কালী ইত্যাদি তার নমুনা। বারাহী ও নারসিংহী সম্ভবত এদেশের কল্পনা—বরাহ ও নৃসিংহ অবতারের শক্তিরূপে। কিন্তু বজ্রযানের অনেক দেবদেবী-কল্পনা এবং পরবর্ত্তী কালের ব্রাহ্মণ্য মতের চৌষট্টি যোগিনীর কল্পনা অনেকটা বহিরাগত ব'লে বোধ হয়। পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

তারার মতো দু'একটি বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী পরে ব্রাহ্মণ্য মতে গৃহীত হয়েছে। জাঙ্গুলীর মতো "বৌদ্ধ" দেবী নাম ফিরিয়ে মনসা হয়েছে, অথবা ব্রাহ্মণ্য মতের মনসা নাম ফিরিয়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতে জাঙ্গুলী হয়েছে। আবার চুন্দার মতো কোন কোন বিশিষ্ট "বৌদ্ধ" দেবী ব্রাহ্মণ্য মতে গৃহীত হয় নি।

এদেশে পুজিত বৌদ্ধ দেবতাকে দু শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, প্রাচীন ও নবীন। তান্ত্রিক দেবতা নবীন। তাঁরা হয় প্রাচীন দেবতার তান্ত্রিক রূপ, নয় দেবপীঠে উন্নীত নরদেবতা। প্রাচীন দেব হলেন প্রধানত তিন জন—বুদ্ধ (বা সুগত), অবলোকিতেশ্বর (বা লোকনাথ) এবং মঞ্জুশ্রী (বা মঞ্জুঘোষ)। বুদ্ধের কোন তান্ত্রিক রূপ বা প্রতিরূপ হয় নি, তবে তাঁর সাধনার তান্ত্রিক অনুকরণ হয়েছিল—বজ্রাসন-সাধন। "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং" ইত্যাদি দৃঢ়সঙ্কল্প ক'রে সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর সেই অমোঘ ধ্যানাসনই বজ্রাসন। তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যে বজ্রাসনসাধন তা সাধককে সহজে বুদ্ধত্ব এনে দেয়। বাংলা দেশে তথা মহাযান মতে প্রধান দেবতা হলেন অবলোকিতেশ্বর যিনি লোকনাথ বা লোকেশ্বর নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। ভারতবর্ষে দেবভাবনার মধ্যে বুদ্ধের করুণাঘন মূর্তি অবলোকিতেশ্বর সবচেয়ে দয়ার্দ্রচিত্ত। তিনিও তান্ত্রিকতার ছোপ এড়াতে পারেন নি। তাঁর তান্ত্রিক রূপের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'হালাহল'[১] (বা হালাহল-লোকনাথ)। ইনি ত্রিনেত্র

[১] বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধ যখন নির্বাণে প্রায় পৌছে গেছেন তখন পিছনে করুণ হলহলা শব্দ শুনে তিনি পিছনে ফিরে দেখেছিলেন যে বিশ্বের সকল প্রাণী কাঁদতে

ত্রিমুখ অর্ধচন্দ্রধর ষড়্ভুজ ব্যাঘ্রচর্ম-পরিধান। তাঁর আর এক রূপ রক্ত-লোকেশ্বর। ইনি রক্তবর্ণ, বসনভূষণও তাই। চতুর্ভুজ, পাশ অঙ্কুশ ধনু ও বাণধারী, মঞ্জরিত অশোক তরুতলে অবস্থিত, দক্ষিণ পার্শ্বে তারা উত্তর পার্শ্বে ভৃকুটী দেবীদ্বয়। লবণ আহুতি দিয়ে অষ্টশতবার জপ করলে সাতদিনের মধ্যে "স্ত্রিয়ং বা পুরুষং বা বশমানয়তি", তিন সপ্তাহ জপ করলে মহাপুরুষকেও বশে আনবে। মঞ্জুশ্রী (বা মঞ্জুঘোষ), তান্ত্রিক রূপে মঞ্জুবজ্র, হলেন "বাদিরাট্" (অর্থাৎ তার্কিক পণ্ডিতদের রাজা)। ইনি সুন্দরকায়, ষোল বছর বয়স, শার্দূল (অথবা সিংহ) পৃষ্ঠে স্থিত, তাঁর "ব্যাখ্যাব্যাকুলপাণিপদ্মযুগল"। বিদ্যাকরের গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি বন্দনাশ্লোকে নবীন ও পুরাপুরি বৌদ্ধ তান্ত্রিক মঞ্জুঘোষকে বলা হয়েছে যেন কুমার নটভৈরব ("নটন্ ভৈরবাত্মা কুমারঃ")। দেবের মধ্যে সর্বোপরি হেরুক, ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের ভৈরবের প্রতিচ্ছায়া। নাম দুটির অর্থও মোটামুটি এক।

ভৈরব নামটি ভীরু থেকে আসে নি, এসেছে 'ভয়রব' (যার ডাক ভয়ঙ্কর) থেকে, প্রাকৃত 'ভইরঅ' শব্দের মধ্য দিয়ে। আর হেরুক এসেছে 'ভয়রূপ' (যার রূপ ভয়ঙ্কর) থেকে, সম্ভাব্য প্রাকৃত 'ভইরূঅ' শব্দের মধ্য দিয়ে। ভৈরবের মতো হেরুক শব্দও অন্ত্যাক্ষরে সংস্কৃতায়িত হয়েছে। তবে হেরুকের অবহট্ট রূপটি ("হেরুঅ") বজায় আছে অবহট্ট ছড়ায়। বৌদ্ধ তন্ত্রের হেরুক ও নৈরাত্মা-যোগিনী (বা মহামায়া) ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের ভৈরব ও কালরাত্রি-কালীর সমান। তফাৎ এই যে হেরুক ও নৈরাত্মা প্রায়ই যুগনদ্ধরূপে পূজিত, ভৈরব ও কালরাত্রি তা

কাঁদতে হাত তুলে তাঁকে বলছে, আমাদের প্রতি কৃপাবলোকন করুন। আপনি নির্বাণপ্রাপ্ত হ'লে আমাদের গতি কী হবে। বোধিসত্ত্বের হৃদয় গলে গেল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে বিশ্বের সব জীব নির্বাণপ্রাপ্ত হ'লে তবেই তিনি নির্বাণ নেবেন। পিছনে ফিরে দেখে তাঁর করুণা হয়েছিল, তাই তাঁর নাম অবলোকিতেশ্বর। বিশ্বপ্রাণীর হলাহল ধ্বনি শুনে তিনি পিছন ফিরেছিলেন, তাই তাঁর নাম হালাহল।

নয়। (ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রে শিবশক্তির যুগনদ্ধ রূপ নেই, তার স্থানে আছে অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তি।) হেরুক দ্বিভুজ একমুখ ত্রিনেত্র ভীষণদর্শন কেয়ূরনূপুর-ভূষিত উপবীতধারী, এবং খড়্গ-কপালধারিণী নৈরাত্মা তাঁর স্কন্ধলগ্ন।[১]

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে চণ্ডীর কোন পুরুষ রূপ নেই, 'চণ্ড' আছে—নিতান্ত অপদেবতা রূপে। বৌদ্ধ তন্ত্রে চণ্ডীর পুরুষরূপ পাই—চণ্ড-মহারোষণ (নামান্তর অচল)। ইনি অতসীপুষ্পকান্তি দ্বিভুজ একমুখ টেরা লাল চোখ, মহাঘোর, মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসা। মাথায় রত্নমুকুট, ডান হাতে খড়্গ, বাম হাতের তর্জনীতে পাশ। ইনি বিঘ্নহন্তা, যথেচ্ছা-পরিপূরক, সর্বপাপ দহন করেন, সর্বত্র রক্ষা করেন। মন্ত্রপূত মাষকলাই ইত্যাদি দিয়ে তাড়না করলে ভূত ইত্যাদির ভয় দূর করেন। সরায় খড়ি দিয়ে মূর্তি এঁকে দরজায় ঝুলিয়ে দিলে নবপ্রসূতাদের শিশু রক্ষা করেন। অন্য অনেক অভিচারের কাজেও লাগেন।[২]

মহাযান অতান্ত্রিক ও তান্ত্রিক দু-মতেই প্রধান দেবী হলেন তারা। ইনিই অবলোকিতেশ্বরের করুণা, অর্থাৎ তাঁর যেন শক্তি। 'তারা' মানে যিনি সর্বদুঃখ থেকে উদ্ধার করেন, বন্ধন মোচন করেন ("সর্বদুঃখেভ্য উত্তারয়তি বন্ধনাৎ মোচয়তি"), ব্রাহ্মণ্য মতের দুর্গার মতো। তাই তারার এক নাম দুর্গোত্তারিণী।[৩] সাধারণ মূর্তিতে তারা উত্তমশ্যামবর্ণা নবযৌবনা দ্বিভুজা প্রহসিতবদনা। দক্ষিণ করে বরদ-মুদ্রা বাম করে বিকচ ইন্দীবরধারিণী, দিব্যসর্বপট্টাম্বরাবৃতশরীরা, সর্বালঙ্কৃতা, মেখলা-ধারিণী, শিরে তথাগত অমোঘসিদ্ধি, অশেষগুণশালিনী, নির্দোষা, পদ্ম-চন্দ্রাসনে পর্যঙ্কনিষণ্ণা। পণ্ডিত স্থবির অনুপম-রক্ষিত বলেছেন[৪] যে সাধক বিজনে গুহাসীন হ'য়ে ভগবতীকে একাগ্র মনে ধ্যান করলে স্বয়ং ভগবতী তার কাছে প্রত্যক্ষ হবেন, তাঁর শ্বাস সাধকের গায়ে লাগবে ("স খলু

[১] সাধনমালা, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, গায়কবাড় প্রাচ্যবিদ্যা গ্রন্থমালা ২৪১।

[২] ঐ ৮৫। প্রভাকর-কীর্তি বিরচিত।

[৩] ঐ ১১১। [৪] ঐ ৭৮।

প্রত্যক্ষত এব তাং পশ্যতি। স্বয়মেব ভগবতী তস্যাঃ শ্বাসপ্রশ্বাসাদিকং বেশি দদাতি"), কথা কি পরমতুর্লভ বুদ্ধত্বও তার করতলগত হ'য়ে যায়।

অধিকাংশ বর্ণনায় তারা ঠাকুরাণীর ('মহত্তরী তারা', 'তারা মহত্তরায়ী') চার পাশে চার জন সহচরী থাকেন। দক্ষিণ পাশে থাকেন তুজন—পীত (অর্থাৎ গৌরবর্ণা) নানালঙ্কারভূষিতা রত্নমুকুটধারিণী অশোককান্তা, তার বাঁ হাতে অশোকপল্লব ও ডান হাতে বজ্র ধৃত, এবং পীতবর্ণা চামর ময়ূরপিচ্ছধারিণী মহামায়ূরী। বাম পাশে থাকেন কৃষ্ণবর্ণা খর্বকায়া ত্রিনেত্রা দংষ্ট্রাকরালা ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা জ্বলৎ-পিঙ্গলোর্দ্ধকেশা খড়্গ-নরকপালধারিণী একজটা, এবং শ্যামবর্ণা কৃষ্ণসর্প ও চামর-ধারিণী আর্য-জাঙ্গুলী।

মহাশ্রীতারিণী (অর্থাৎ মহালক্ষ্মী তারা) রূপে তারা পুষ্পবনের মধ্যে সিংহাসনে চন্দ্রাসনস্থ, শ্যামবর্ণা একবক্ত্রা দ্বিভুজা। তু হাতে ব্যাখ্যান-মুদ্রা। তাঁর তু-পাশে একজটা অশোককান্তা আর্যজাঙ্গুলী মহামায়ূরী। "রাজলীলাস্থিতা দেবী মহাশ্রী-করুণান্বিতা"।

আর্য-তারার তান্ত্রিক রূপ অনেকগুলি—বজ্রতারা, মহাচীনক্রম-তারা, মৃত্যুবঞ্চন-সিততারা, ষড়ভুজ-শুক্লতারা, ধনদ তারা, প্রসন্নতারা ইত্যাদি। বজ্রতারা কুমারীলক্ষণযুক্ত, কনকবর্ণ, পঞ্চচূড় মুকুট যুক্ত, অষ্টবাহু, চতুর্মুখ, অলঙ্কৃত। ইনি মাতৃমণ্ডল অর্থাৎ অষ্টপরিজন পরিবৃত। চার সখী—পূর্বে শুক্লবর্ণা পুষ্পমাল্যহস্তা পুষ্পতারা, দক্ষিণে কৃষ্ণবর্ণা ধূপশাখাহস্তা ধূপতারা, পশ্চিমে পীতবর্ণা দীপযষ্টিহস্তা দীপতারা, উত্তরে রক্তবর্ণা গন্ধশঙ্খহস্তা গন্ধতারা। চার দ্বারপালী—পূর্বে কৃষ্ণবর্ণা বজ্রাঙ্কুশী, দক্ষিণে পীতবর্ণা বজ্রপাশী, পশ্চিমে রক্তবর্ণা বজ্রস্ফোটী, উত্তরে শ্বেতবর্ণা বজ্রঘণ্টা। এদের হাতে আয়ুধ হ'ল যথাক্রমে অমোঘ অঙ্কুশ (অর্থাৎ ডাঙস), অমোঘ পাশ, অমোঘ স্ফোট (অর্থাৎ তুড়ি), আর অমোঘ ঘণ্টা। ধ্যান করবার সময়ে "ঊর্দ্ধে উষ্ণীষবিজয়ামধঃ সুম্ভাং

বিভাবয়েৎ"।[১] বজ্রতারা-সাধনার বিশেষ মাহাত্ম্য ছিল ভয়াদি উচাটনে এবং আরও বিশেষভাবে বশীকরণে। অনেক উদাহরণ দেওয়া আছে। যেমন,

ওঁ তারে তুত্তারে তুরে অমুকাভিধানাং কুমারীং মহ্যং বিবাহেন তস্য পিতা প্রযচ্ছতু স্বাহা।

তারা-ধারণী মন্ত্র সাতবার জপ করে নিজের চোখ দুটি কচলালে রাজদ্বারে অপ্রতিহত প্রতিপত্তি হয়।

রাজকুলস্যান্তিকে প্রবিশেৎ। অথ স রাজা শিষ্যবদ্ গৌরবং করোতি বিরুদ্ধং ন বক্তি প্রসাদং চ প্রযচ্ছতি প্রিয়ালাপং কুরুতে দাসতামুপৈতি ক্রুদ্ধোঽপি বশো ভবেদিতি দৃষ্টপ্রত্যয়ঃ সম্ভূতঃ।

'রাজবাড়িতে ঢুকবে। তখন রাজা শিষ্যের মতো (সাধককে) সম্মান করবে, বিরূপ কিছু বলবে না, দান দেবে, মিষ্ট আলাপ করবে, দাসের মতো হ'য়ে যাবে এবং ক্রুদ্ধ অবস্থায় থাকলেও (সাধকের) বশ হবে। এ ব্যাপার চাক্ষুষ প্রমাণিত, ঘটেছে।'

মহাচীনক্রম-তারা কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভুজ একবক্ত্র, ত্রিনেত্র দংষ্ট্রাকরাল খর্ব লম্বোদর মুণ্ডমাল ব্যাঘ্রচর্মপরিধান শবারূঢ় রক্তপদ্মে অধিষ্ঠিত। ডান হাতে খাঁড়া ও কাটারি, বাঁ হাতে উৎপল ও নরকপাল। অতি ঘোর ভীমরূপ, অট্টহাস। শাশ্বতবজ্র বলেন যে,[২] এঁর সাধনা করলে যোগী (অর্থাৎ সাধক) মূর্খ জড়বুদ্ধি হ'লেও মহাকবি হ'তে পারবে।

মৃত্যুবঞ্চন সিত (অর্থাৎ শুক্ল) তারা শ্বেতপদ্মে অধিষ্ঠিত। কান্তি শরৎচন্দ্রের মতো, বয়স ষোল বছর। দক্ষিণে মারীচী পীতবর্ণ, রক্তাশোকপল্লব ও সাদা চামর হাতে। বামে মহামায়ূরী প্রিয়ঙ্গুশ্যামবর্ণ, ময়ূরপিচ্ছ ও চামর হাতে। শুক্লতারা কামরূপধারিণী, ইনি সকল সম্বুদ্ধের মাতা।

---

[১] উষ্ণীষবিজয়া সিতবর্ণা ত্রিনেত্রা অষ্টভুজা, মতান্তরে পীতবর্ণা চক্রধরা। সুম্ভা ভাস্বর-রূপা, পাশধরা। শব্দটি 'শুম্ভ' নামের। ধাতুগত অর্থ হত্যাকারী) স্ত্রীরূপ হওয়া সম্ভব। [২] সাধনমালা ১০১।

ষড়্ভুজ-শুক্লতারার তিন বদন। ধনদ-তারা হরিতশ্যাম বর্ণ, একমুখ ত্রিলোচন চতুর্ভুজ বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারশোভিত। তাঁর আট সখী এবং চার দ্বারপালী। পূর্বে বজ্রতারা কৃষ্ণবর্ণ, হাতে বজ্র। দক্ষিণে রত্নতারা পীতবর্ণ, হাতে রত্ন। পশ্চিমে পদ্মতারা রক্তবর্ণ, হাতে পদ্ম। পশ্চিমে বুদ্ধতারা শুক্লবর্ণ, হাতে চক্র[১]। অগ্নিকোণে পুষ্পতারা শুক্ল-বর্ণ, হাতে ফুলের মালা। নৈঋর্ত কোণে ধূপতারা কৃষ্ণবর্ণ, হাতে ধূপদানি। বায়ুকোণে দীপতারা পীতবর্ণ, হাতে দীপযষ্টি। ঈশান কোণে গন্ধতারা রক্তবর্ণ, হাতে গন্ধশঙ্খ[২]। পূর্বদ্বারে কৃষ্ণবর্ণ বজ্রাঙ্কুশী, দক্ষিণদ্বারে পীতবর্ণ বজ্রপাশী, পশ্চিমদ্বারে রক্তবর্ণ বজ্রস্ফোটা, উত্তরে শুক্লবর্ণ বজ্রঘণ্টা।

প্রসন্নতারা নামটির 'প্রসন্ন' অংশের অর্থ কিন্তু ঠিক বিপরীত। ইনি মহাঘোররূপা কিন্তু নবযৌবনা এবং হাস্যমুখী। বর্ণ হেম, নেত্র তিনটি ক'রে অষ্ট বদনে, হাত ষোলটি, গলায় পঞ্চাশটি রক্তঝরা নরমুণ্ডের মালা, ঊর্দ্ধ পিঙ্গল কেশ। ইনি বাঁ পায়ে ইন্দ্রকে চেপে আছেন, ডান পায়ে বিষ্ণুকে, দু-পায়ের মাঝখানে আছে শিব ও ব্রহ্মা।

তারার সহচরীদের মধ্যে পরিগণিত হ'লেও জাঙ্গুলীর স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল, তাই তিনি কখনো কখনো জাঙ্গুলী-তারা নামেও উল্লিখিত। জাঙ্গুলী যে প্রাচীন এবং শ্রদ্ধেয় দেবতা তা তাঁর "আর্য" বিশেষণ থেকেও জানা যায়। আর্য-জাঙ্গুলী তারা সর্বশুক্লা, তাঁর পূজাও শ্বেতপুষ্পে। ইনি চতুর্ভুজ জটামুকুটিনী শুক্লসর্পবিভূষিত। মূল দু-হাতে বীণা বাজাচ্ছেন, আর দু-হাতে শুক্ল সর্প ও অভয়মুদ্রা। ইনি ব্রাহ্মণ্য মতের সরস্বতী ও বিষহরি (মনসা) একাধারে। এঁর অনুগ্রহে সাধক গারুড়বিদ্যাদক্ষ এবং সর্বশাস্ত্রবিশারদ কবি হ'তে পারেন।

আর্য-প্রজ্ঞাপারমিতা তারার চেয়েও প্রাচীন দেবী। প্রজ্ঞাপারমিতা শব্দটির মূল অর্থ ছিল প্রজ্ঞাপারম্য ভাব অর্থাৎ পরমপ্রজ্ঞার তত্ত্ব বা

[১] অর্থাৎ ধর্মচক্র। [২] অর্থাৎ সুগন্ধি দ্রব্য অথবা বারিপূর্ণ শঙ্খ।

নির্বাণতত্ত্ব। প্রথমে নামটি দেওয়া হয় মহাযান মতের একটি শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব-গ্রন্থকে। তার পরে সেই তত্ত্বের ও গ্রন্থের প্রতিভূরূপে প্রজ্ঞাপারমিতা দেবীর কল্পনা জাগে। আর্য-প্রজ্ঞাপারমিতার দুটি রূপ—সিত ও কনকবর্ণ। সিত প্রজ্ঞাপারমিতা দ্বিভুজ, একমুখ, মনোরম, আধচাঁচর কেশ, শ্বেতপথে অধিষ্ঠান, ডান হাতে রক্তকমল, বাঁ হাতে প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক। কনকবর্ণ প্রজ্ঞাপারমিতা চতুর্ভুজ।

তারার সহচরী একজটা স্বতন্ত্রভাবেও পূজা পেতেন। একজটার তিনচারটি রূপ—দ্বিভুজ, দ্বিভুজ শুক্ল, চতুর্ভুজ ও চতুর্বিংশতিভুজ। দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ একজটা একবদন, চতুর্বিংশতিভুজ একজটা দ্বাদশবদন এবং ঘোরকৃষ্ণবর্ণ।

পর্ণশবরী ব্রাহ্মণ্য মতের কান্তার-দুর্গার নামান্তর। বৌদ্ধ তন্ত্রে ইনি পীতবর্ণ ত্রিমুখ ত্রিনেত্র ষড়ভুজ গাছের পাতা ও ময়ূরপুচ্ছ পরিহিত নবযৌবনপ্রাপ্ত, পীন খর্ব লম্বোদরী লোলজিহ্বা। দক্ষিণ হাতে বজ্র পরশু ও শর আর বাম হাতে পাশ পর্ণপিচ্ছিকা ও ধনু। ইনিও প্রাচীন, তবে আসলে বনদেবতা এবং উপদেবতা। তারার সঙ্গে একীভূত ক'রে এঁকে "আর্য" বলা হয়েছে। আর্য-পর্ণশবরীতারার বন্দনা শ্লোক,

বামনে ত্বাং নমস্যামি বামনে ত্বাং ভগবতি।
পিশাচি পর্ণশবরি পাশপরশুধারিণি ॥

'হে খর্বকায়া, হে ভগবতী খর্বকায়া, হে পিশাচী
পাশ-পরশু-ধারিণী পর্ণশবরী, তোমাকে নমস্কার করি ॥'

বৌদ্ধ-তন্ত্রের বিশিষ্ট দেবীদের মধ্যে মারীচী অন্যতম। এঁর অনেক রূপ। এক রূপে শ্বেতবর্ণ, পঞ্চমুখ দশভুজ চতুশ্চরণ নবযৌবনারূঢ় কুমারী। এক, অর্থাৎ মূল মুখ বরাহ-আকৃতি। সপ্ত শূকরবাহিত রথে আরূঢ়। আর এক রূপে গৌরবর্ণ একমুখ ত্রিনয়ন অষ্টভুজ। সহচরী—পূর্বে কৃষ্ণবর্ণ বর্তালী, দক্ষিণে পীতবর্ণ বদালী, পশ্চিমে শুক্লবর্ণ বরালী, উত্তরে রক্তবর্ণ বরাহমুখী। পীত-মারীচী অষ্টভুজ। তাঁর সব সহচরীই বরাহমুখী। ওড়িয়ান-মারীচী ষড়্‌বদন, দ্বাদশভুজ।

চুন্দা ব্রাহ্মণ্য মতের ইন্দ্রাণীর মতো। সাধনমালা অনুসারে দেবী শরচ্চন্দ্রপ্রভ, চতুর্ভুজ। ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তকে চুন্দার দুটি ছবি আছে। একটি সমতটের হরিকেল অঞ্চলের পট্টিকেরস্থিত "চুন্দা-বরভবনে" চুন্দার, অপরটি লাটদেশে বুষ্করানগরে চুন্দা। প্রথম ছবিতে (নিদর্শনে দ্রষ্টব্য) দেবী ষোড়শভুজ, দ্বিতীয় ছবিতে চতুর্ভুজ।

কুরুকুল্লা (বা কুরুকুলা) পর্বতগুহাবাসিনী দেবী। মহাযান তান্ত্রিক মতের অন্যতম প্রধান দেবতা। ইনি "তারোদ্ভব", অর্থাৎ তারার রূপান্তর। দেবী সাধারণত সর্বরক্তা ও চতুর্ভুজ—ডান হাতে অভয় ও শর, বাঁ হাতে ধনু ও রক্ত উৎপল। রাহুর উপর কাম-রতি, তার উপর দেবীর আসন। অভিচার প্রধানত বশীকরণের জন্য। রূপান্তরে দেবী শুক্লবর্ণ অথবা ষড়্‌ভুজ কিংবা অষ্টভুজ। ওড্ডিয়ান-কুরুকুল্লা শবারূঢ়া। সহজ-বিলাসের স্বাধিষ্ঠানকুরুকুল্লা-সাধন ও সিদ্ধশবরপাদের সিতকুরুকুল্লা-সাধন থেকে জানা যায় সে সহজসিদ্ধিপথিক তান্ত্রিক যোগীরা কুরুকুল্লার উপাসনা করতেন। সে উপাসনায় অবহট্ট মন্ত্র ও ছড়া ব্যবহৃত হ'ত। যেমন,

অক্‌খর মন্ত বিবজ্জিঅও
ণউ সো বিন্দ ণ বিত্ত।
এ সো পরম মহাসুহও
ণউ ফেড়িঅ ণউ খিত্ত॥

'অক্ষর মন্ত্র বিবর্জিত সে বিন্দুও নয় বিত্তও নয়। এ সে পরম মহাসুখ, নষ্টও নয় ত্যক্তও নয়॥'

বৌদ্ধ তন্ত্রে সরস্বতীর তিনটি রূপ—বজ্রসরস্বতী মহাসরস্বতী আর বজ্রবীণা-সরস্বতী। বজ্রসরস্বতী ত্রিবদনা ষড়্‌ভুজ। মহাসরস্বতী দ্বাদশ-বর্ষীয়া, শ্বেত-উৎপলধারিণী। তাঁর অনুচরী হ'ল প্রজ্ঞা মেধা মতি ও স্মৃতি। এ দেবীর উপাসনায় বৌদ্ধ ছোপ নেই বললেই হয়। সে কথা বজ্র-শারদার বেলায়ও খাটে। ইনি ত্রিনেত্র। বজ্রসরস্বতী ও বজ্র-শারদার উপাসনায় বৌদ্ধ যোগীরা ব্রাহ্মণ্য মতের কাছে ঋণী।

বসুধারা ব্রাহ্মণ্য মতে আছে তবে দেবী রূপে নয়। অন্নপ্রাশন বিবাহ ইত্যাদি বংশের কল্যাণ-অনুষ্ঠানে বাস্তুপূজার বা চৈত্য (আধুনিক কালে "চেদি" বা "চেদীরাজা") পূজার আনুষঙ্গিকে গৃহভিত্তিতে ঢালা ঘৃতধারা "বসুধারা" নামে প্রসিদ্ধ। বৈশাখ মাসে তুলসী গাছের উপরে টাঙানো বিন্দু বিন্দু চুয়ানো জলধারাকেও বসুধারা বলে। বৌদ্ধতন্ত্রে বসুধারা দেবীরূপ পেয়েছেন কিন্তু কোন রকম বৌদ্ধ ছাপ তাতে পড়ে নি। আর্য-বসুধারা কনকবর্ণ ষোড়শবর্ষীয়, দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা বাম হস্তে ধান্যমঞ্জরী (অথবা ধান্যমঞ্জরী ও নানারত্নবর্ষ ঘট)। চার সহচরী ঘিরে আছে, পূর্বে বসুন্ধরা দক্ষিণে বসুশ্রী পশ্চিমে বসুমুখী উত্তরে বসুমতীশ্রী। বসুধারার পট অথবা প্রতিমার সামনে চন্দনপঙ্কে চারকোণা মণ্ডল এঁকে তার মধ্যে বসুধারার ধারণী-পুথি রেখে আনুষ্ঠানিক পূজা করা হ'ত। প্রাত্যহিক আরাধনায় গোবরগোলায় দুহাত প্রমাণ চারকোণা[১] মণ্ডল এঁকে তিন সন্ধ্যা সুগন্ধ ফুলে অর্চনা ক'রে চার হাজার[১] বার জপ করলে দেবী ছ মাসের মধ্যে মনস্কাম পূর্ণ করেন। যথালব্ধ ফুলে চার লক্ষবার হোম করলে মহৎ শ্রীবৃদ্ধি হয়॥

[১] তখনকার ধারণায় পৃথিবী ছিল চতুষ্কোণ। তাই চতুষ্কোণ মণ্ডল ও চতুঃসহস্রবার মন্ত্রজপ এবং চতুর্লক্ষবার আহুতি।

১১

বৈষ্ণব মত

বৈষ্ণব মত বিষ্ণু-পূজা আশ্রিত। এ মত ব্রাহ্মণ্য মতগুলির মধ্যে সব চেয়ে প্রবল ছিল, এবং তারপরে ছিল শৈব মত। বৌদ্ধ মতের রাজা কেউ কেউ শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, একথা আগে বলেছি। শৈব মতের সঙ্গে যোগসিদ্ধি মতের যোগাযোগ ছিল। যোগসিদ্ধি মতে শিব সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর নন (কেননা এঁরা নিরীশ্বর), তিনি সব যোগীর গুরু, আদিতম সিদ্ধ, মহাজ্ঞানের আধার। এই দিক দিয়ে বৌদ্ধধর্মের মহাযান মতের সঙ্গে কিছু মিল হয়। হয়ত সেই জন্যই জৈন মতের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে এবং তান্ত্রিকতায় বৌদ্ধ মতের শৈথিল্যের ফলে সাধারণ সমাজে শৈব মতের প্রসার ঘটতে থাকে। তবে উচ্চতর সমাজে বৈষ্ণবতার প্রসার বাড়তে থাকে। সেন-রাজারা শৈব ছিলেন, কিন্তু শেষ বয়সে বল্লালসেন এবং সব বয়সে লক্ষ্মণসেন ছিলেন বৈষ্ণব। বর্ম-রাজারা গোড়াগুড়িই বৈষ্ণব ছিলেন। এই দুটি রাজবংশের শাসনকালে বাংলা দেশে বৈষ্ণব মত প্রধান ধর্মমত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরে জানা যাবে এই বৈষ্ণব মতেও কিভাবে বৌদ্ধ মহাযান মতের প্রভাব কাজ করেছিল।

কৃষ্ণের অত্যদ্ভুত বলবীর্যের গল্প পুরাণকাহিনীতে গাঁথা ও শিল্পে খোদাই হ'লেও এবং কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার ব'লে গৃহীত হ'লেও জনসমাজে কৃষ্ণের পূজা দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে প্রচলিত হয় নি ব'লে মনে করি। দশাবতার-নামমালা মুখ্যত জনসমাজের জন্যে, এবং সম্ভবত পূর্ব-ভারতে, গাঁথা হয়েছিল। এদেশে যে দশ অবতারের নাম পাওয়া যায় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে, তাতে কৃষ্ণের নাম নেই, বলরামের নাম আছে। তাহলে কি বুঝব বলরাম প্রাচীনতর দেবতা, কৃষ্ণের প্রতিস্পর্দ্ধী? লক্ষ্য করতে হবে যে দশ-অবতারের মধ্যে কোন অবতারেরই পূজা দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে প্রচলিত হয় নি, বোধ করি একমাত্র নৃসিংহ ছাড়া।

দশ-অবতারের মধ্যে বুদ্ধ ঢুকেছেন। সাহিত্যে তাঁর মূর্তি যথাসম্ভব স্পষ্টই আছে। জয়দেবের বর্ণনায় তিনি যেন করুণহৃদয় অবলোকিতেশ্বর। পরবর্তী কালে লোক-ভাবনায় তিনি যেন নাথপন্থের যোগী সিদ্ধ। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মন্দির-অলঙ্করণচিত্রে সেই রকমই দেখায়।

দশ-অবতারের শেষ অবতার কল্কী। ইনি অর্বাচীন আবির্ভাব, প্রাচীন পুরাণে অনুল্লিখিত। অর্বাচীন পুরাণে কল্কীর উল্লেখ আছে তবে গল্প বলতে কিছু নেই। ম্লেচ্ছ ধ্বংস করতে অবতার হবেন এইমাত্র। অর্বাচীন পুরাণের লেখকেরা সমসাময়িক অথবা ঈষৎ পূর্ববর্তী ঘটনা বা ভাবনাকে ভবিষ্যৎ ঘটনা বা ভাবনা ব'লে বর্ণনা করেছেন। কল্কী নামটির মানে হ'ল শ্বেতাশ্ব-আরোহী বীর।[১] ইরান থেকে কয়েক শতাব্দী পূর্বে আগত অশ্বারোহী সূর্য-দেবতার সঙ্গে সদ্য এবং পুনঃপুন আক্রমণকারী অশ্বারোহী মুসলমান যোদ্ধাদের মিলিয়ে এই কল্কীর কল্পনা গ'ড়ে উঠেছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে এই 'কল্কিন্' ধর্মঠাকুরের এক বিশেষ প্রকাশ ব'লে গণ্য হয়েছে। তিনি নাকি কোন কোন কবিকে দেখা দিয়েছিলেন "শ্বেত অশ্ব চাপি" "রাউতের বেশে"। ধর্মঠাকুরের গাজন-অনুষ্ঠানের ছড়ায় আছে, ধর্মঠাকুর

> হাঁসা ঘোড়া খাসা জোড়া পায়ে দিয়া মোজা
> অবশেষে বোলাইলে গৌড়ের রাজা ॥

এই ছবি কি তুর্কীদের গৌড়-অধিকারের স্মৃতিবহ নয়?

রামলীলা ও কৃষ্ণলীলা ভাস্কর্যে দেখা দিতে থাকে অষ্টম-নবম শতাব্দী থেকে। তবে প্রথমদিকের চিত্রগুলি সংশয়াতীত নয়। দশাবতারে নামমালায় স্থান পেলেও রামের মূর্তি, একক অথবা লক্ষ্মণ-সহায় কিংবা সীতা-সমেত, দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে স্বীকৃত হয় নি। তবে রাক্ষস-পিশাচ-দমনকারী হিসাবে রাম-মন্ত্র বোধ হয় এই সময়ের মধ্যে জনসমাজে সমাদৃত ছিল। কৃষ্ণ-বিষ্ণুর নামান্তর রূপে অনেক কাল আগে থেকে চলিত থাকলেও কৃষ্ণমূর্তি—বংশীন্যস্তাধর বনমালাধারী বর্হাপীড় গোপবালকের মূর্তি—দ্বাদশ শতাব্দীতে সাহিত্যে ভালো ভাবে প্রতিফলিত হ'লেও[২] ভাস্কর্যে রূপ পায় নি, সুতরাং কৃষ্ণমূর্তিতে বিষ্ণুপূজা তখনও চলিত হয় নি ॥

---

[১] 'কল্কিন্' এসেছে 'কর্কিন্' থেকে, মানে 'কর্ক' (সাদা ঘোড়া) চড়েন যিনি।

[২] দ্রষ্টব্য বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের টীকাসর্বস্বের প্রথম শ্লোক। পরে দ্রষ্টব্য।

৯২

দেবকুল-ব্যবস্থা

রাজ-রাজড়া প্রতিষ্ঠিত অথবা রাজ-পুষ্ট ব্রাহ্মণ্য মতের বড় দেবকুলগুলিতে পূজার ব্যবস্থা রাজকীয় ছিল। রাজার মতো দেবতারও সেবাদাসী থাকত—চামরধারিণী, ধূপদীপ-প্রজ্বালিনী, আলিম্পনকারিণী, নৃত্য-গীতে আনন্দবর্ধিনী। হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেব ভুবনেশ্বরে যে অনন্ত-বাসুদেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে) তাতে সেবার জন্য এক শ জন দেবদাসীর ব্যবস্থাও ক'রেছিলেন। এ কথা তাঁর শিলা-প্রশস্তি থেকে জানা যায়। বিজয়সেন যে প্রদ্যুম্নেশ্বর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাতেও এক শ সুন্দরী অলঙ্কৃতা দেবদাসী দেবসেবায় নিযুক্ত ছিল ("অর্ধাঙ্গনাস্বামিনো রত্নালঙ্কৃতিভির্বিশেষিতবপুঃ শোভাঃ শতং সুভ্রুবঃ")।[১] দেবালয়ে দেবদাসীর ব্যবস্থা নূতন নয়। কালিদাসের মেঘদূতে উল্লিখিত আছে উজ্জয়িনীর মহাকালের সন্ধ্যাবন্দনার প্রসঙ্গে॥

[১] দেওপাড়া প্রশস্তি শ্লোক ৩০

বিদ্যায় সাহিত্যে শিল্পে

১

শাস্ত্র ও প্রয়োগ

খাস বাংলা দেশে পাওয়া গেছে এমন প্রাচীনতম লেখ বা উৎকীর্ণ-লিপি মিলেছে মধ্য বঙ্গে মহাস্থান গড়ে (প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধন)। এ প্রত্নলেখের ভাষা প্রাকৃত। এ কথা আগে বলা হয়েছে। এই প্রত্নলিপিটি ছাড়া আর কোন প্রাকৃত রচনা প্রায় হাজার বছর যাবৎ এ দেশে পাওয়া যায় নি। তার পরে যে সব প্রত্নলেখ আবিষ্কৃত হয়েছে তা সবই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। আর্যাবর্তের অন্যত্র যেমন পূর্বভারতে (এবং বাংলা দেশেও) তেমনি খ্রীষ্টীয় প্রথম দু-তিন শতাব্দী পর্যন্ত মোটামুটি প্রাকৃত ভাষাই সাধারণ কাজকর্মে ও রাজকার্যে চলত। এদেশে গুপ্ত-অধিকারের ফলে সাধারণ কাজকর্মে ও রাজকার্যে সংস্কৃত ব্যবহৃত হ'তে থাকে এবং প্রাকৃত এই সব ক্ষেত্র থেকে একেবারে দূরীভূত হ'য়ে গিয়ে শুধু কথ্য ব্যবহারেই পর্যবসিত থাকে। তখনকার দিনে সাহিত্য ব'লতে ছিল ভব্য রচনা, পণ্ডিতের লেখা। এমন লেখার কোন নিদর্শন অষ্টম-নবম শতাব্দীর আগে প্রায় কিছু মেলে না।

গুপ্ত-শাসনের কালে প্রদত্ত ভূমিদান অথবা ভূমিবিক্রয় পত্রে এদেশে সংস্কৃত-রচনায় আদি নিদর্শনগুলি রয়েছে। মৌলিক কবিতা প্রথম পাই বিজয়সেনের মল্লসারুল অনুশাসনের প্রারম্ভে। সে কথা আগে বলেছি। পরবর্তী কালের অনুশাসনগুলি ক্রমশ কাব্যময় হ'য়ে উঠেছে। সে কথা পরে বলছি।

সংস্কৃত ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে স্বাভাবিক ভাবেই সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুশীলন হ'তে থাকে। সংস্কৃত মাতৃভাষাও নয় কথ্যভাষাও নয়, লেখ্যভাষা। সুতরাং তা কষ্ট ক'রে শিখতে হবে। ব্যাকরণ ও অভিধান ছাড়া সংস্কৃত ভাষা শেখবার সরণি নেই। তাই বাংলা দেশে ব্যাকরণের অনুশীলন ভালোভাবেই চলেছিল এবং বিদ্যার সবক্ষেত্রে

যেমন 'শব্দবিদ্যা' বা ব্যাকরণের বেলায়ও তেমনি বৌদ্ধ বিহারগুলি এ বিদ্যার পীঠস্থান ছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ (?) শতাব্দীতে সমতট অথবা হরিকেল (?)-বাসী বৌদ্ধ চন্দ্রগোমী একটি ব্যাকরণ লিখেছিলেন, মোটামুটি পাণিনির অনুযায়ী।[১] বৌদ্ধদের মধ্যে এ ব্যাকরণের বিশেষ সমাদর হয়েছিল। (সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন ব্যাকরণের মধ্যে চন্দ্রগোমীর বইখানি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর পরেই মূল্যবান্ ব'লে স্বীকৃত।) চার পাঁচ শতাব্দীর পরে এদেশে আরও কয়েকখানি ব্যাকরণ লেখা হয়েছিল পাঠ্যপুস্তক হিসাবে। এর মধ্যে 'সংক্ষিপ্তসার' ও 'সুপদ্ম' ব্যাকরণ দুটি পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যবহৃত হ'য়ে এসেছে। সমতটে চলত 'সুপদ্ম' এবং 'কলাপ'। কলাপ ব্যাকরণ চন্দ্রগোমীর ধারায় রচিত।

অভিধান-গ্রন্থ অথবা অভিধান-গ্রন্থের টীকা রচনায় এদেশের পণ্ডিতের বিশেষ আগ্রহ ও উদ্যম ছিল। এঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় অমরকোষের টীকাকার সর্বানন্দের নাম। ইনি "বন্দ্যঘটীয়" আর্তিহরের পুত্র। টীকাসর্বস্বের রচনাকাল দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ (১০৮১ শকাব্দ, = ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দ)। টীকাটিতে অনেক শাস্ত্র ও কাব্য থেকে উদ্ধৃতি আছে, সর্বানন্দের নিজের রচনা থেকেও আছে। সেকালের বাঙালীর সাহিত্যরুচির ও সাহিত্যজ্ঞানের পরিধির কিছু আন্দাজ পাওয়া যায় সর্বানন্দের উল্লেখ ও উদ্ধৃতিগুলি থেকে।

সর্বানন্দ বৈষ্ণব ছিলেন, তা বোঝা যায় প্রারম্ভ শ্লোক থেকে।

বর্হিণবর্হাপীড়ঃ সুষিরপরো বালবল্লবো গোষ্ঠে।
মেদুরমুদিরশ্যামলরুচিরব্যাদ্ এষ গোবিন্দঃ॥

---

[১] বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমীকে ই-সিঙ "চন্দ্রদাস"ও বলেছেন। ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না। ই-সিঙ লিখেছেন তিনি যখন পূর্ব-ভারতে আসেন তখনও চন্দ্রদাস জীবিত ছিলেন (অধ্যায়ঃ ৩৯)।

'ময়ূরপুচ্ছ শিখণ্ডধারী গোষ্ঠে বেণুবাদনপরায়ণ স্নিগ্ধমনোরম শ্যামকান্তি সেই গোপবালক গোবিন্দ রক্ষা করুন॥'

শেষ শ্লোকে নিজের কথা কিছু আছে।

ত্রীণি ব্যাকরণান্যধীত্য সকলং সাহিত্যমালোচ্য চ
প্রাজ্ঞাধ্যাপকভাষিতানি হৃদয়ে ন্যস্যাকৃতেদং স হি।
প্রাজ্ঞেনাম্নু সনাতনেন বহুশঃ প্রত্যক্ষরং শোধিতং
জিজ্ঞাসা যদি শব্দবর্ত্মনি তদা চৈতৎ সমালোক্যতাম্॥

'তিন ব্যাকরণ অধ্যয়ন ক'রে, সকল সাহিত্য আলোচনার পর, প্রাজ্ঞ অধ্যাপকদের উপদেশ হৃদয়ে রেখে এই (গ্রন্থ) সে (অর্থাৎ রচয়িতা) লিখেছে। তারপর প্রাজ্ঞ সনাতন কর্তৃক অনেক স্থানে তন্নতন্ন ক'রে শোধন করা হয়েছে। শব্দবিদ্যার পথে যদি জানবার কিছু থাকে তবে এই (বইটি) দেখা যেতে পারে॥'

মনে হয় সর্বানন্দ বয়সে নবীন ছিলেন। কাজটি কিন্তু অত্যন্ত প্রবীণ। এই টীকায় সর্বানন্দ প্রায় পাঁচ শ বাংলা শব্দ ভ'রে দিয়েছেন॥

গুপ্ত-অধিকার কাল থেকে এদেশে উত্তর-পশ্চিম হ'তে ব্রাহ্মণের আগমন ও উপনিবেশ, প্রথমে ধীরভাবে পরে দ্রুতগতিতে, ঘটতে থাকে। তার আগেও এ ব্যাপার ঘ'টে থাকবে কিন্তু তার প্রমাণ নেই। গুপ্ত-অধিকার-ফলে বাংলা দেশের, অর্থাৎ প্রাচ্য ভূমির নিম্ন গাঙ্গেয় অংশের সঙ্গে উচ্চ গাঙ্গেয় অংশের অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্ত বা গঙ্গা-যমুনা বেষ্টিত ও বিধৌত ভূমির স্বচ্ছন্দ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বাংলা দেশের যশ শুনে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাও এই বেদহীন ভূমিতে গঙ্গাতীরে ও অন্য নদীতীরে বাস ক'রে ভূমি-চাষে আগ্রহ বোধ করতে থাকেন। এদেশের সাধারণ লোকও অতঃপর কাশী প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থে যাত্রা করতে সমুৎসুক হয়। গুপ্তদের অধিকৃত নিম্নপ্রাচ্য অংশে প্রধান শক্তি ছিল নৌবল। তাঁদের এই নৌবল গঙ্গার গুরুত্ব—যা আগে শুধু বাণিজ্যের জন্যেই স্বীকৃত ছিল—তা অন্য দিকে অর্থাৎ রাজ্যশাসনের

পক্ষে, বাড়িয়ে দিলে। এর পরে গঙ্গাসাগর এদেশের এক বড় তীর্থ হ'ল এবং পুরাণকাহিনীর মারফৎ গঙ্গার মহিমা এবং গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এই ব্যাপারে যথেষ্ট হাত ছিল।

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যাঁরা কিছু হয়ত আগে থেকে এদেশে ছিলেন তবে বেশির ভাগই এসেছিলেন, তাঁরা বেদের বিভিন্ন-শাখাধ্যায়ী ব'লে চিহ্নিত হ'লেও বেদবিদ্যায় নিরত ছিলেন না। তখনও বেদ পুথিতে আবদ্ধ হয়েছিল বলে মনে হয় না। তা হোক বা না হোক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বেদ মুখস্থ করতে হ'ত। বেদ মুখস্থ করায় এবং তা উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত ক্রমে অথবা সামবেদীয় সুরধারায় উচ্চারণ ক'রতে পারাতেই তাঁদের চরম কৃতিত্ব ছিল। এদেশে এমন কোন বড় রাজা জন্মান নি যিনি বেদজ্ঞদের দিয়ে অশ্বমেধ করেছিলেন অথবা রাজসূয় যজ্ঞ করিয়েছিলেন। সুতরাং এদেশে বেদজ্ঞদের বেদের ফলিত অনুশীলন ছিল নিজ নিজ গৃহে প্রত্যহ অগ্নিহোত্র করা। তা তাঁরা করতেন, কিন্তু তাকে তো বেদচর্চা বলে না। কেউ কেউ শান্তিস্বস্ত্যয়ন করতেন, কিন্তু সে হ'ল অথর্ব-বেদের অনুসরণ এবং তাতে পাণ্ডিত্যের অবকাশ নেই। সুতরাং তখনকার দিনে এদেশে কেন, আর্যাবর্তের অনেক স্থানেই, এখনকার অর্থে, বেদের অনুশীলন ছিল না। যা ছিল তা হ'ল অভ্যাস। বেশি বেদাভ্যাস করলে বুদ্ধি যে স্থূল হ'য়ে যায় সে কটাক্ষপাত আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে দুর্লভ নয়। আধুনিক পণ্ডিতেরা বৃথাই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে প্রাচীনকালে বাংলা দেশে বেদচর্চা ছিল না। কিন্তু ছিল না বলে মন্দ কিছু তো হয় নি। বৌদ্ধ দর্শনের চর্চা হয়েছিল, তারপরে ন্যায়-বৈশেষিকের চর্চা হয়েছিল। সে সব আমাদের গৌরবের।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সঙ্ঘবদ্ধ না হ'লেও স্বতন্ত্রভাবে এখানে ওখানে বিদ্যার অনুশীলনে যথাসাধ্য ব্যাপৃত ছিলেন নিশ্চয়ই, তবে পাল-রাজত্বের মাঝামাঝির আগে তাঁদের দেখা পাওয়া যায় নি। প্রথমেই যিনি দেখা দেন তিনি সেকালের একজন অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন। এঁর নাম

শ্রীধর, পিতার নাম বলদেব, মাতার নাম অব্বোকা (বা অচ্ছোকা), নিবাস দক্ষিণরাঢ়ে বিখ্যাত ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রামে। "গুণরত্নাভরণ" "কায়স্থ-কুলতিলক" পাণ্ডুদাস এঁকে পোষণ করেছিলেন। ৯১৩ শকাব্দে (অর্থাৎ ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীধর লিখেছিলেন 'ন্যায়কন্দলী' গ্রন্থ। এটি হ'ল বৈশেষিকসূত্রের প্রশস্তপাদ-কৃত ভাষ্যের টীকা। বইটি বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনের পথনির্দেশক গ্রন্থ। ইনি আরও বই লিখেছিলেন, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন নিয়ে। এগুলি পাওয়া যায় নি, তবে ন্যায়কন্দলীর মধ্যে এগুলির নাম উল্লিখিত আছে,—'অদ্বয়সিদ্ধি', 'তত্ত্বসংবাদিনী', 'তত্ত্বপ্রবোধ' ইত্যাদি।

পাল-রাজাদের আমল থেকে আমরা ব্রাহ্মণ রাজমন্ত্রীর পরম্পরা পাচ্ছি। আগেই বলেছি এদেশের শাসনকার্য কেমন ক'রে সাধারণ ব্যক্তিদের হাত থেকে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের হাতে চ'লে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরা বিচক্ষণ ছিলেন এবং পণ্ডিতও ছিলেন। পাল-রাজাদের মন্ত্রীদের কারো কারো পাণ্ডিত্যের খুব প্রশংসা পেয়েছি কিন্তু কারো পাণ্ডিত্যের কিছু নমুনা পাই নি—অবশ্য প্রশস্তি রচনা ছাড়া। পরবর্তী কালেরও কোন কোন রাজবংশের ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর পাণ্ডিত্যের উল্লেখ পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য যিনি, ভট্ট ভবদেব, তিনি শ্রীধরের প্রায় এক শ বছর পরের লোক। এঁর পরিচয় দিয়েছেন সুহৃৎ কবি বাচস্পতি একটি ক্ষুদ্র প্রশস্তি কাব্য রচনা ক'রে। সেই প্রশস্তি-শিলালেখ আছে ভট্ট ভবদেবের প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দিরে উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরে। বাচস্পতির বিবরণ সংক্ষেপে দিই।

রাঢ়ে সিদ্ধল গ্রামে এক সাবর্ণ গোত্র ব্রাহ্মণবংশের দীর্ঘকালের বাস। এই বংশে এক ভবদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন যিনি গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে "অভীষ্টভূমি" শ্রীহস্তিনীভিট্ট গ্রাম পেয়েছিলেন। এই ভবদেবের প্রপৌত্র আদিদেব বঙ্গ-রাজের সান্ধিবিগ্রহিক মহামন্ত্রী ছিলেন। আদি-দেবের পুত্র গোবর্ধনের দ্বিতীয় পত্নী বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণের কন্যা সাঙ্গোকার গর্ভে দ্বিতীয় ভবদেব অর্থাৎ ভট্ট ভবদেবের জন্ম হয়। ভবদেব মূর্তিমান্

বিষ্ণু, তাঁর মন্ত্রণায় সামর্থ্যে ও সহায়তায় ("যন্মন্ত্রশক্তিসচিবঃ") "ধর্ম-বিজয়ী" হরিবর্ম দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন। ভবদেব ব্রহ্মাদ্বৈতবিদ্যায় মুখ্য ছিলেন, কুমারিল ভট্টের গভীর উক্তির মর্ম বুঝতেন, বৌদ্ধবিদ্যাকে তিনি অগস্ত্যের মতো উদরস্থ করেছিলেন, পাষণ্ড তার্কিকদের বিদ্যা খণ্ড-খণ্ড করেছিলেন—এমনি পণ্ডিত তিনি, সর্বজ্ঞের লীলাকারী। সিদ্ধান্ততন্ত্র গণিতের (অর্থাৎ গাণিতিক জ্যোতিষের) তিনি পারগামী ছিলেন, ফলিত জ্যোতিষে ("ফলসংহিতাসু") তিনি অদ্ভুত প্রতিভা দেখিয়েছিলেন, হোরাশাস্ত্রে (অর্থাৎ সামুদ্রিক বিদ্যায়) তিনি গ্রন্থরচনা ক'রে দ্বিতীয় বরাহমিহির রূপে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন, ধর্মশাস্ত্রের ক্ষেত্রে তিনি জীর্ণ পুরাতন নিবন্ধগুলিকে অকেজো ক'রে দিয়েছিলেন ("অন্ধীচকার") কালোপযুক্ত ভালো প্রবন্ধ রচনা ক'রে, এবং মুনিদের ধর্মশাস্ত্রের সুব্যাখ্যা ক'রে স্মার্ত ক্রিয়াকর্মে যে সংশয়-বিষ সঞ্চারিত হয়েছিল তা পরিষ্কার ক'রে দিয়েছিলেন। কবিত্বের সকল বিভাগে আগমে অর্থশাস্ত্রে আয়ুর্বেদে এবং অস্ত্রবেদ (অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যা) ইত্যাদিতে তিনি দ্বিতীয়-রহিত। তাঁর "বালবলভীভুজঙ্গ" এই নাম (অর্থাৎ বিরুদ) কে না সমাদর করে? তিনি জলহীন রাঢ়ে জঙ্গল-পথের ধারে শ্রান্ত পথিকদের প্রয়োজনে ও তৃপ্তির জন্য জলাশয় ক'রে দিয়েছিলেন। তিনিই এই তুঙ্গ ও বিরাট মন্দিরে ভগবান্ নারায়ণের অনন্ত-নৃসিংহ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই মন্দিরে তিনি এক শ সুন্দরী দেবদাসী নিযুক্ত করেছেন এবং সেই মন্দিরের সম্মুখে পুষ্করিণী ও উদ্যান ক'রে দিয়েছেন।

ভবদেবের লেখা গ্রন্থ অধিকাংশই পাওয়া যায় নি। তবে তাঁর স্মৃতি-গ্রন্থদ্বয় সুপ্রচলিত ছিল—'কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি' (বা 'দশকর্মপদ্ধতি') ও 'প্রায়শ্চিত্তপদ্ধতি'। পরবর্তী স্মার্ত গ্রন্থকারেরা ভবদেবের ঋণ স্বীকার করেছেন।

সেন-রাজাদের আমলে স্মার্ত পণ্ডিতেরা বেশ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুজন প্রধান, বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধ আর লক্ষ্মণসেনের সভাসদ হলায়ুধ। অনিরুদ্ধের দুটি বই পাওয়া গেছে—

'পিতৃদয়িত' (অশৌচের বিধিব্যবস্থা) আর 'হারলতা' (শ্রাদ্ধসপিণ্ড-করণের বিধিব্যবস্থা)। ইনি আরও দুটি বই লিখেছিলেন—'আচারসাগর' ও 'প্রতিষ্ঠাসাগর'। এগুলির শুধু নামই জানা আছে। বল্লালসেনের রচিত ব'লে প্রসিদ্ধ 'অদ্ভুতসাগর' ও 'দানসাগর' বই দুটির রচনায় অনিরুদ্ধের হাত থাকা সম্ভব। হলায়ুধ তাঁর 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' বইটির গোড়ায় নিজের পরিচয় দিয়েছেন। পিতা ধনঞ্জয়, মাতা উজ্জ্বলা, দু বড় ভাই ঈশান ও পশুপতি[১]। হলায়ুধ প্রথম জীবনে "রাজপণ্ডিত", পরে হন "মহামাত্য", শেষে "ধর্মাধ্যক্ষ" (অর্থাৎ ধর্মাধিকরণিক)। হলায়ুধ চারখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন—'ব্রাহ্মণসর্বস্ব', 'মীমাংসাসর্বস্ব', 'বৈষ্ণবসর্বস্ব' এবং 'পণ্ডিতসর্বস্ব'। প্রথমটি ছাড়া কোন বই পাওয়া যায় নি। 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' তখনকার সদাচারী ব্রাহ্মণদের পুরোহিত-দর্পণের মতো। ঈশান এবং পশুপতিও স্মৃতি-সদাচার বিষয়ে নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। সেগুলি এখন লুপ্ত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা সেকশুভোদয়া বইটি (যাতে শেখ্ জলালুদ্দীনের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে) হলায়ুধ মিশ্রের রচনা। মনে হয় বইটি এক প্রাচীনতর রচনার ভগ্নাংশ নিয়ে রচিত। সে ভগ্নাংশের মূল ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। সেকশুভোদয়ার লেখক হলায়ুধ মিশ্র শেখ জলালুদ্দীনের খুব অনুগত হয়েছিলেন। রাজা লক্ষ্মণসেনও শেখকে মান্য করতেন। যেভাবে লক্ষ্মণসেনের রাজ্য তুর্কীর কবলিত হ'ল তাতে মনে হয় মুসলমান শাসন মেনে নেবার মতো ভাব লক্ষ্মণসেনের কোন কোন প্রভাবশালী সভাসদের মনে গ'ড়ে উঠেছিল। তার পিছনে কোন মুসলমান জিন্দাপীরের প্রভাব থাকা অসঙ্গত কল্পনা নয়।

ভবদেব ও হলায়ুধের মাঝামাঝি সময়ে জন্মেছিলেন জীমূতবাহন। এঁর সম্বন্ধে শুধু এইটুকু জানা যায় যে ইনি পারিভদ্র (পরবর্তীকালের

[১] পশুপতি বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী উপন্যাসের প্রতিনায়ক

পালধি) কুলের ব্রাহ্মণ এবং সম্ভবত রাঢ়ের অধিবাসী। এঁর তিনখানি বই প্রসিদ্ধ—‘দায়ভাগ’, ‘ব্যবহারমাতৃকা’ ও ‘কালবিবেক’। আমাদের দেশের সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে দায়ভাগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও বণ্টন এবং স্ত্রীধনের সত্ত্ব উত্তরাধিকার ও বণ্টন বিষয়ে আমাদের দেশে যে নিয়ম চলিত আছে—অন্য প্রদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে নয়—তা দায়ভাগ অনুসারেই হ’য়ে এসেছে। দায়ভাগে পিতার সম্পত্তিতে তাঁর জীবৎকালে পুত্রদের কোন অধিকার নেই, পিতার মৃত্যুর পরে তারা সম্পত্তির সমান অংশে উত্তরাধিকারী। আর্যাবর্তের অন্যত্র নিয়ম ঠিক এরকম নয়, সেখানে পিতার জীবৎকালেই পুত্রের কিছু অংশ পিতৃ-সম্পত্তিতে বর্তায়। (এই নিয়ম ‘মিতাক্ষরা’ অনুসারে।) জীমূতবাহনের অপর বই ‘ব্যবহারমাতৃকা’ ও ‘কালবিবেক’। প্রথম বইখানিতে নালিশ মোকদ্দমা ইত্যাদি বিচারঘটিত বিষয় এবং দ্বিতীয় বইটিতে শাস্ত্রীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মের উপযুক্ত কাল—অর্থাৎ মাস, তিথি, ক্ষণ—ইত্যাদি নির্ধারিত হয়েছে।

আয়ুর্বেদে অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্রে এদেশের মনীষা প্রায় সর্বদাই জাগ্রত ছিল। বৌদ্ধ মহাবিহারগুলিতে আয়ুর্বিদ্যার চর্চা হ’ত প্রয়োজনের খাতিরে। সেই চর্চা চ’লে এসে প্রবল হয়েছিল পাল-রাজত্বে। আয়ুর্বেদের মুখ্য দু-জন লেখক এই সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। একজন হলেন মাধব-কর, গ্রন্থ সুবিখ্যাত ‘রুগ্‌বিনিশ্চয় (‘নিদান’ নামে সমধিক পরিচিত)। পিতার নাম—ইন্দু-কর—ছাড়া এঁর সম্বন্ধে কিছু জানা নেই। আর একজন হলেন চরক ও সুশ্রুত সংহিতার টীকাকার এবং ‘চিকিৎসাসংগ্রহ’, ‘শব্দচন্দ্রিকা’ ও ‘দ্রব্যগুণসংগ্রহ’ বইগুলির রচয়িতা চক্রপাণি-দত্ত। চক্রপাণির পিতা নারায়ণ নয়পালের রসবতীর (অর্থাৎ রন্ধনশালার) আধিকারিক ছিলেন। ভাই ভানু-দত্ত কোন (পাল ?) রাজার “অন্তরঙ্গ” অর্থাৎ খাস চিকিৎসক ছিলেন।

সেকালে পূর্ব ভারতের ব্যাপক আরণ্য অঞ্চলে খুব হাতি ছিল এবং তখনকার দিনে যুদ্ধে ও রাজকার্যে (এবং সমাজের সাধারণ প্রয়োজনেও)

হাতির মূল্য অসাধারণ ছিল, এখনকার দিনের ট্যাঙ্ক, আরমার্ড ক'রে আর জিপের মতো। সেই কারণে হস্তি-পরিচর্যা ও হস্তি-চিকিৎসা অনেককাল আগে থেকেই এদেশে এক বিশিষ্ট বিদ্যা ব'লে অনুশীলিত হয়েছিল। হস্তিবিদ্যার যেসব বই পাওয়া গেছে তার মধ্যে সব চেয়ে পুরানো বইটি এদেশে লেখা। রচয়িতার নাম "পালকাপ্য"। গুপ্ত-অধিকারের আগে বইটি রচিত হওয়া অসম্ভব নয়।

পরবর্তী কালে এদেশে রাজকার্যে ঘোড়ার ব্যবহারও অল্পস্বল্প চলিত হয়েছিল। অশ্ববিদ্যার বা অশ্বচিকিৎসার কোন বই পাওয়া যায় নি বটে, তবে পাল-রাজাদের সময়ে বিশেষজ্ঞ অশ্বচিকিৎসক সম্মানিত ছিলেন। নয়পালের রাজ্যকালের যে শিলালিপিটি গয়ার এক মন্দিরে উৎকীর্ণ আছে সেটি একটি একবিংশ-শ্লোকাত্মক কাব্যের মতো, বিষ্ণুর স্তুতি ও গয়ার প্রশংসা ক'রে শুরু। এটির রচনা "বাজিবৈদ্য" সহদেবের। মন্দিরটিও এঁর কীর্তি ব'লে মনে হয়।

ফলিত গণিত ও সামুদ্রিক বিদ্যার চর্চা এদেশে একাদশ শতাব্দীর আগেই শুরু হয়েছিল। ভট্ট ভবদেব এ বিদ্যায় পারগ ছিলেন এবং বইও লিখেছিলেন, একথা আগে বলেছি। শকুনবিদ্যা—অর্থাৎ নানারকম পাখীর ডাক ও প্রচেষ্টা নিয়ে ভবিষ্যৎ-গণনা সামুদ্রিক বিদ্যার এক শাখা রূপে গণ্য হয়েছিল। এ বিষয়ে বাংলা দেশের সমতট অঞ্চলের এক লেখকের বইয়ের উল্লেখ আছে আল্‌বেরুনির ভারত-বিষয়ক গ্রন্থে (একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ)। আলবেরুনি লেখকের নাম করেন নি, "বঙ্গাল" বলেছেন॥

২

শিক্ষা

সেকালে সংস্কৃত-শিক্ষার প্রথম পাঠ্য পুস্তক কী এবং কেমন ছিল সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান দিয়ে গিয়েছেন চীনীয় পরিব্রাজক বৌদ্ধ ই-সিঙ (মধ্য সপ্তম শতাব্দী)। ইনি তাম্রলিপ্তে বাস ক'রে সংস্কৃত শিখেছিলেন। ই-সিঙ বলেছেন—সংস্কৃত শিক্ষার্থীর প্রথম পাঠ্য বই "সি-ত'ন্-চঙ" (=সিদ্ধপ্রবন্ধ?), নামান্তর 'সিদ্ধিরস্তু'। ("সিদ্ধির্ অস্তু" ব'লে গ্রন্থারম্ভ হ'ত তাই এই নাম প্রচলিত হয়েছিল, অনেকটা যেমন বর্ণপরিচয়ের নাম হয়েছে 'প্রথম ভাগ'।) বইটির এই নাম পরবর্তী কালেও প্রচলিত ছিল। সিদ্ধাচার্য সরহ তাঁর দোঁহাকোষের এক শ্লোকে বলেছেন,

সিদ্ধিরত্থু মই পঢমে পঢিঅউ
মণ্ড পিঅন্তেঁ বিসরিঅ এমউ।

'আমি প্রথম বয়সে সিদ্ধিরস্তু[১] পড়েছিলুম, (কিন্তু) মাড় খেতে খেতে (তা) এমনিই ভুলে গেছি।'

ই-সিঙ বলেছেন, সিদ্ধিরত্থুতে উনপঞ্চাশৎ বর্ণের উপদেশ ছিল। ছ বছর বয়সে ছেলেরা এই বই ধরত আর ছ মাসে তা শেষ করত।[২] একথা আগে কিছু বলেছি।

সেকালের অনেক বিহার ও মঠ এখনকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ছিল। নালন্দা ও বিক্রমশীল মহাবিহারের কার্যক্রম সম্বন্ধে আমরা চীনীয় ও তিব্বতী গ্রন্থ থেকে অনেক তথ্য পেয়েছি। কিছুকাল পূর্বে আবিষ্কৃত একটি তাম্রশাসন-পট্টে সমতটে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যথাসম্ভব বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গেছে। ইতিহাসের পক্ষে এই বিবরণ অমূল্য। সংক্ষেপে সেকথা বলছি।

---

[১] সপ্তম শতাব্দীর লোকের মুখের কথায় স্বাভাবিকভাবেই "সিদ্ধিরস্তু" হয়েছিল "সিদ্ধিরত্থ"। [২] অধ্যায় ৩৪।

রাজা শ্রীচন্দ্র (দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ?) চন্দ্রপুরী বিষয়ে যে মঠগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার বিবরণ শ্রীহট্টের পশ্চিমভাগ গ্রামে প্রাপ্ত তাঁর তাম্রশাসন-পট্টে পাওয়া গেছে।[১] শ্রীচন্দ্র একটি গ্রামের মতো বৃহৎ স্থান জুড়ে আটটি মঠ স্থাপন করেছিলেন। চারটি "বঙ্গাল মঠ", অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য মতের মঠ ("ব্রহ্মাণে")। এই চার মঠের দেবতা ছিলেন যথাক্রমে বৈশ্বানর যোগেশ্বর জৈমিনি ও মহাকাল। আর চারটি হ'ল "দেশান্তরীয় মঠ"—অর্থাৎ বৌদ্ধ ও অন্য বহিরাগত মতের মঠ। চারটি বঙ্গাল মঠের জন্য যেমন চারটি দেশান্তরীয় মঠের জন্যও তেমনি এক শ কুড়ি পাটক ক'রে ভূমি প্রদত্ত হয়েছিল। প্রত্যেক মঠে অধ্যাপক ছাড়া নির্দিষ্টসংখ্যক ছাত্র থাকত, আর থাকত একজন গণক, একজন কায়স্থ (অর্থাৎ হিসাবরক্ষক), চারজন মালাকার, তুজন তৈলিক, তুজন কুম্ভকার, পাঁচজন কাহলিক (কাহল-বাদক)[২], তুজন শঙ্খবাদক, তুজন ঢক্কাবাদক, চারজন দ্রাগড়িক (দ্রগড়-বাদক)[৩], কর্মকর ও চর্মকার মিলে বাইশ জন, একজন নট, তুজন সূত্রধার, তুজন স্থপতি, তুজন কর্মকার, আটজন "বেট্রিক" (মজুর বা বেগার)। ব্রহ্ম-মঠে চান্দ্র ব্যাকরণের অধ্যাপক ("চন্দ্রব্যাখ্যানোপাধ্যায়") বৃত্তি পেতেন দশ দ্রোণ দশ পাটক জমির আয়। দশজন ছাত্র পেতেন প্রত্যেকে এক পাটক ক'রে ভূমির আয়, উদরভরণের জন্য—"পালিফুট্টকার্থং"[৪]। পাঁচজন নূতন নূতন (অর্থাৎ অতিথি) ব্রাহ্মণের জন্যে পাঁচ পাটক ভূমির আয়। ভাণ্ডারা ব্রাহ্মণের জন্য এক পাটক ভূমির আয়। গণকের জন্য এক পাটক এবং কায়স্থের জন্য আড়াই পাটক ভূমির আয়। মালাকার তৈলিক কুম্ভকার কাহলিক শঙ্খবাদক ঢক্কাবাদক দ্রাগড়িক কর্মকর চর্মকার প্রত্যেকে

[১] কমলাকান্ত গুপ্ত প্রণীত *Copperplates of Sylhet* দ্রষ্টব্য।

[২] কাহল (অর্থাৎ ঢোল) বাদক।

[৩] দ্রগড় (অর্থাৎ নাকাড়া-বাদক)। সময় জ্ঞাপনের জন্য।

[৪] 'পালি'=গুরুগৃহে বাসকালে ছাত্রের ভাতা। 'ফুট্ট'=ফোটানো অর্থাৎ রন্ধন।

অর্ধ পাটক ভূমির, নট দু পাটক ভূমির, সূত্রধার স্থপতি কর্মকার প্রত্যেকে দু পাটক ক'রে ভূমির এবং প্রত্যেক বেট্টিক পৌনে এক পাটক ভূমির আয় পাবে। ভাঙাফুটো সারাবার জন্যে দশ পাটক এবং নূতন নির্মাণ কাজের জন্য সাতচল্লিশ পাটক ভূমির আয় বরাদ্দ ছিল।

একটি মঠে দুজন বেদ-অধ্যাপক প্রত্যেকে দশ পাটক এবং পাঁচজন ছাত্রের প্রত্যেকে এক পাটক ক'রে ভূমির আয় ভোগ করতেন। এ মঠে মালাকার নাপিত তৈলিক রজক এবং আটজন কর্মকর-চর্মকারদের প্রত্যেকে অর্ধ পাটক আর দুজন বেট্টিক পৌনে এক পাটক ভূমির আয় পেত। আর সব মঠের "নবকর্ম" অর্থাৎ নূতন নির্মাণ কাজের জন্য দশ পাটক ক'রে ভূমির আয় নির্দিষ্ট ছিল।

প্রত্যেক চারটি মঠে ("প্রতিমঠচতুষ্টয়ে") একটি মহত্তর ব্রাহ্মণ (আয় দু পাটক), "বারিক"[১] (আয় দেড় পাটক), কায়স্থ (আয় আড়াই পাটক), গণক (আয় এক পাটক) ও বৈদ্য (আয় তিন পাটক) নির্দিষ্ট ছিল। এই ভাবে সব শুদ্ধ দু শ আশি পাটক ভূমি দান করেছিলেন রাজা শ্রীচন্দ্র।

উপরের বিবরণ থেকে সেকালের সমাজে বিভিন্ন বৃত্তিভোগীর আয় এবং সেই অনুসারে সামাজিক মর্যাদারও কতকটা আন্দাজ পাওয়া যায়॥

১ বারিক=জলের জোগানদার?

৩

সংস্কৃত কবিতা

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে লেখা বলে অনুমিত সামান্য দুই এক ছত্র খণ্ডিত প্রাকৃত রচনা (মহাস্থানগড় শিলাচক্রলিপি) এবং প্রায় সেই পরিমাণ তিন চার ছত্র সংস্কৃত রচনা (শুশুনিয়া গুহালিপি) ছাড়া কোন কিছু লেখা এদেশে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আগে মেলে নি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালের সব প্রত্নলিপি (মসজিদে খোদাই ছাড়া অন্যত্র) সংস্কৃতে রচিত। প্রত্নলিপিগুলি সবই হয় শাসন অর্থাৎ ভূমিবিক্রয় অথবা ভূমিদান পত্র নতুবা প্রস্তর বা ধাতু মূর্তির অথবা ধাতু পাত্রের গায়ে অঙ্কিত পরিচয়-লেখ। পুথির কথা এখানে ধরছি না।

গুপ্ত-অধিকার কালে প্রদত্ত শাসনগুলি কেজো দলিল, তাতে সাহিত্যের স্ফুরণ নেই এবং ধর্মশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি ছাড়া কোন শ্লোক নেই। মৌলিক শ্লোক দিয়ে শাসনপত্রের শুরু দেখা গেল বিজয়সেনের (মল্লসারুল) শাসনে। একথা আগে বলেছি।

গুপ্ত-সম্রাটরা ছিলেন বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণ্য মতের পরিপোষক। তাঁদের অধিকার-কালেই এদেশে এবং তাঁদের অধিকারে অন্যত্র সংস্কৃত বিদ্যার মান খুব উচ্চ হয় এবং সেই বিদ্যাধারী ব্রাহ্মণদের মাহাত্ম্যও বেশ বেড়ে যায়। এদেশে গুপ্ত-অধিকারের আগে ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তাঁরা দেশের অন্যান্য অধিবাসীদের থেকে খুব তফাতে থাকতেন না। অন্য সকলের মতো তাঁরাও চাষবাসে অথবা বাণিজ্যে-শিল্পে নিরত ছিলেন। পৌরোহিত্য কাজ তাঁরা অবশ্যই করতেন, তবে তাতে বেদ-মন্ত্রের বাহুল্য তেমন ছিল ব'লে মনে হয় না। গুপ্তদের আমল থেকে এদেশে বেদ-বিদ্যাপরায়ণ ব'লে পশ্চিমের ব্রাহ্মণদের আগমন ও অধিবসন শুরু হয়। তারপর সে কাজ দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে এবং তার অবসান হয়—অর্থাৎ লক্ষণীয় ভাবে ক'মে যায়—মুসলমান

অধিকারের পর থেকে। নবাগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের বংশ ক্রমশ জাঁকিয়ে উঠতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তাঁরা রাজসভায় প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। রাজসভার আওতায়ই তাঁরা এবং অপরে এদেশে সংস্কৃতের অনুশীলনে উদ্দীপিত হয়েছিলেন। বাংলা দেশে তাই সংস্কৃত সাহিত্য রাজসভা-মণ্ডপের আনুকূল্যে পুষ্ট ও বিকশিত হয়েছিল।

সপ্তম শতাব্দীর আগেই পূর্ব-ভারতে (এবং বাংলা দেশে) সংস্কৃত রচনায় কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা পূর্ব-ভারতের সংস্কৃত-রচনাকে 'গৌড়ী রীতি' নাম দিয়ে স্বীকার করেছিলেন। পূর্ব-ভারতের লেখকেরা যে ছাঁদে সংস্কৃত লিখতেন তাতে ঘোর-প্যাঁচ—অর্থাৎ শ্লেষ এবং নিগূঢ় ব্যঞ্জনা—তেমন থাকত না। সে ভাষাছাঁদ ছিল সোজাসুজি এবং স্পষ্ট। সেইজন্যে অন্যদেশের কবি ও আলঙ্কারিকেরা গৌড়ী রীতিকে শব্দনিষ্ঠ ("অক্ষরডম্বর") বলে ঈষৎ নিন্দা করেছেন।

এদেশের কবিরা বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ছুটকো ("প্রকীর্ণ") কবিতায় ও ছোট কাব্যে, বড় কাব্যে তেমন নয়। ধর্মপালের খালিমপুর অনুশাসনে তার প্রথম উদাহরণ এবং শ্রীধর দাসের সদুক্তিকর্ণামৃতে তার শ্রেষ্ঠ এবং পর্যাপ্ত উদাহরণ মিলবে। ছোট কাব্যের ভালো নমুনা হ'ল দুটি প্রশস্তি কাব্য—বাচস্পতির লেখা ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তি (ভুবনেশ্বর শিলালিপি) ও উমাপতিধরের লেখা বিজয়সেনের প্রশস্তি (দেওপাড়া শিলালিপি)।

কোন কোন রাজা কাব্যরচনায় সভাসদ্‌দের বিশেষ উৎসাহ দিতেন। (কোন কোন রাজা নিজেও কবিতা লিখতেন।) এ দেশে প্রথম যে রামায়ণ-কাব্য লেখা হয়েছিল ব'লে কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন সেই 'রামচরিত'-রচয়িতা কবি অভিনন্দ হয়ত ধর্মপালের এক পুত্রের আশ্রিত ছিলেন। এই কাব্যে পরবর্তী কালে বাংলা দেশে প্রচলিত রাম-কাহিনীর একটি বিশেষত্বের পূর্বাভাস আছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাম দেবীপূজা ক'রে তবে রাবণ-বধে সমর্থ হয়েছিলেন। অভিনন্দের কাব্যে সে কাজ করেছিলেন হনুমান। আর একটি

'রামচরিত' কাব্য লেখা হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। কাব্যটি 'রাঘবপাণ্ডবীয়' কাব্যের মতো দ্ব্যর্থ। এক অর্থে রামের কাহিনী, অপর অর্থে রামপালের বৃত্তান্ত। রচয়িতা সন্ধ্যাকর-নন্দী ছিলেন রামপালের এক মন্ত্রী প্রজাপতি-নন্দীর পুত্র। রামপালের প্রসঙ্গে বইটির কথা আগে বলেছি।

বঙ্গ-সমতটের চন্দ্র-রাজারা অত্যন্ত-বিদ্বৎপ্রিয় ছিলেন। সদুক্তি-কর্ণামৃতে উদ্ধৃত উমাপতিধরের একটি শ্লোক থেকে জানা যায় যে, সমতটের রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র 'চন্দ্রচূড়চরিত' কাব্য রচনার জন্য তাঁর "অন্তরঙ্গ" (অর্থাৎ সভাসদ) কবিকে অনেকগুলি গ্রাম দান করেছিলেন। একথা সত্য হ'লে সেকালের রাজকবির মর্যাদার উচ্চমানের একটা নজির পাই। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র বিশেষ সংস্কৃতিমান্ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পৌত্র লডহচন্দ্র নিজে কবিতা লিখতেন। একথা তাঁর পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের শাসনপট্টে উল্লিখিত আছে ("কবিত্বাৎ পাণ্ডিত্যাদ্ দিশি দিশি চ যঃ কীর্তিমনঘাং বিতেনে")।

সেন-রাজারা, বিশেষ ক'রে লক্ষ্মণসেন, সাহিত্যের ও সঙ্গীতের সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁর পুত্রদের অনুশাসনগুলিকে সাক্ষ্য মেনে বলা যায় যে সন্ধ্যাকালে লক্ষ্মণসেনের সভায় নিয়মিতভাবে নটীদের নাচ-গান হ'ত ("সায়ং বেশবিলাসিনীজনরণন্মঞ্জীরমঞ্জুস্বনৈর্যেনাকারি বিভিন্নশব্দঘটনাবন্ধ্যং ত্রিসন্ধ্যং নভঃ")। লক্ষ্মণসেনের সভায় আমরা সেকালের তিন-চারজন বিশিষ্ট কবিকে সমবেত দেখতে পাই। তার মধ্যে দু'জন ছিলেন তাঁর মহামন্ত্রী—গোবর্ধন-আচার্য এবং উমাপতিধর। প্রাকৃত শ্লোকসংগ্রহ গাথাসপ্তশতীর অনুসরণে গোবর্ধন আর্যাছন্দে সংস্কৃত ভাষায় প্রকীর্ণ শ্লোক রচনা ক'রে 'আর্যাসপ্তশতী' নাম দিয়ে গ্রন্থন করেছিলেন। গোবর্ধনের কবিতার পরিচয় পরে দিচ্ছি।

উমাপতিধর, সেনবংশের তিনপুরুষের মহামন্ত্রী, দ্বাদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বললে অত্যুক্তি হবে না। কবি হিসাবে

তাঁর নাম জয়দেবের পরেই ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিচিত হয়েছিল। ইনি বিজয়সেনের প্রশস্তি রচনা করেছিলেন। বল্লালসেনের ও লক্ষ্মণ-সেনের অনেক প্রশস্তিও এঁর রচনা হওয়া সম্ভব। সদুক্তিকর্ণামৃতে উমাপতির অনেক কবিতা উদ্ধৃত আছে।

লক্ষ্মণসেনের সভায় পণ্ডিত-কবিদের মধ্যে একদা সবচেয়ে বেশি খাতির ছিল ধোয়ীর। ইনি কবিদের রাজা ("কবিক্ষ্মাপতিঃ") ব'লে গণ্য ছিলেন। এঁর সম্বন্ধে সেকশুভোদয়ায় একটি গল্প আছে। তার মর্ম হল, ইনি জাতিতে হীন এবং ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন, সরস্বতীর কৃপায় ইনি পণ্ডিত ও কবি হন। ধোয়ীর রচিত প্রকীর্ণ কবিতা সদুক্তি-কর্ণামৃতে সঙ্কলিত আছে। তা ছাড়া এঁর লেখা 'পবনদূত' কাব্যও পাওয়া গেছে।[১] কাব্যটি মন্দাক্রান্তা ছন্দে মেঘদূতের অনুকরণে লেখা। নায়ক এক সেন-রাজা, সম্ভবত লক্ষ্মণসেন, নায়িকা মলয়বাসিনী এক গন্ধর্ব-কন্যা (=নটী?)। লক্ষ্মণসেন দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে গিয়েছিলেন। পবনদূতের কাহিনী সেই স্মৃতিরই ইঙ্গিত করে। কাব্যটি ধোয়ীর পরিণত বয়সের রচনা তাই শেষে কবি নিজের মনের কথাটি খুলে বলেছেন।

> কীর্তির্লব্ধা সদসি বিদুষাং শীলিতাঃ ক্ষৌণিপালা
> বাক্‌সন্দর্ভাঃ কতিচিদ্ অমৃতস্যন্দিনো নির্মিতাশ্চ।
> তীরে সম্প্রত্যমরসরিতঃ ক্বাপি শৈলোপকণ্ঠে
> ব্রহ্মাভ্যাসপ্রণিহিতমনা নেতুম্ ঈহে দিনানি॥

'বিদ্বৎসভায় কীর্তিলাভ করেছি। রাজাদের সঙ্গ লাভ করেছি। কয়েকখানি মধুস্রাবী কথার মালাও গেঁথেছি। এখন চাই সুরধুনীর তীরে কোন শৈলতটে মনকে ব্রহ্মচিন্তায় নিবিষ্ট ক'রে (বাকি) দিনগুলি কাটিয়ে দিতে॥'

জয়দেব সংস্কৃত-সাহিত্যের শেষ বড় কবি। তাঁর 'গীতগোবিন্দ' সংস্কৃত ভাষায় একমাত্র গীতি-কবিতার বই। গীতগোবিন্দের গান

[১] মেঘদূতের অনুকরণগুলির মধ্যে ধোয়ীর 'পবনদূত' সবচেয়ে পুরানো।

পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের সর্বত্র বড় বড় রাজসভায় সমাদর লাভ করেছিল। একাধিক রাজা গীতগোবিন্দের টীকা রচনা করেছিলেন। গীতগোবিন্দের গান বাংলা সমেত প্রায় সব নব্য আর্য-ভাষায় নূতন সাহিত্যের পথ দেখিয়েছে। জয়দেব লক্ষ্মণসেনের এক সভাকবি ছিলেন কি না বলা যায় না, তবে লক্ষ্মণসেনের সভায় তিনি অন্তত একবার সমবেত হয়েছিলেন।

জয়দেবের বোধ হয় গানের দল ছিল। জয়দেব মূল গায়ক ছিলেন, পত্নী পদ্মাবতী নাচতেন এবং পরাশর প্রভৃতি "বন্ধু" (অর্থাৎ বিবাহসূত্রে আত্মীয়—মাতুল, শ্যালক অথবা তাঁদের ছেলে) গাইতেন এবং বাজাতেন। গীতগোবিন্দের গানের রীতি পরবর্তীকালের পাঞ্চালিকা-গানের পথ প্রদর্শন করেছিল।[১]

জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভাসদ ছিলেন কিনা জানি না, তবে লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। সে কথা পরে বলছি। লক্ষ্মণ-সেনের সভায় জয়দেবের আগমন নিয়ে একটি গল্প আছে সেকশুভোদয়ায়। একদা লক্ষ্মণসেনের সভায় এক দিগ্‌বিজয়ী সঙ্গীতনিপুণ কলাবিদ্ এসেছিলেন। তাঁর জয়পত্রের ঘটা দেখে রাজা তাঁর দাবি স্বীকার ক'রে নিয়ে জয়পত্র লিখে দিতে উদ্যত হ'লে পর খবর পেয়ে জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী রাজসভায় এসে অনুরোধ করলেন যে, তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিচার ক'রে জয়ী না হলে কাউকে যেন সঙ্গীতবিদ্যায় জয়পত্র দেওয়া না হয়। রাজা জয়দেবকে সভায় আনালেন। দিগ্‌বিজয়ী প্রথমে গান ধরলেন। সভার নিকটে একটা গাছ ছিল, গাছের সব পাতা ঝ'রে প'ড়ে গেল। সকলে দিগ্‌বিজয়ীকে ধন্য ধন্য ক'রতে লাগল। জয়দেব দিগ্‌বিজয়ীকে বললেন, গাছের পাতা তো এমনিই ঝরে যায়, সবগুলি একসঙ্গে ঝরানো এমন আর বাহাদুরি কী? গান গেয়ে আবার পাতা গজিয়ে দিতে পার তো দেখাও। দিগ্‌বিজয়ী

[১] বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথমখণ্ড পূর্বার্ধ (পঞ্চম সংস্করণ) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

মাথা নাড়লেন। তখন জয়দেব বসন্ত রাগ গাইলেন, গাছের ডালে পাতা গজিয়ে উঠল। সকলে জয়দেবের মাহাত্ম্য স্বীকার করলে।

গীতগোবিন্দের উপক্রম-অংশে এক প্রাচীন প্রক্ষিপ্ত শ্লোক আছে। শ্লোকটিতে লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্ বলে খ্যাত পাঁচজন কবির কৃতিত্বের তুলনা করা হয়েছে। সে চারজন কবি হলেন উমাপতিধর জয়দেব শরণ গোবর্ধন-আচার্য এবং ধোয়ী। শ্লোকটি এই,

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈর্ আচার্যগোবর্ধন-
স্পর্ধী কো ঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ॥

'উমাপতিধর বাক্-বিস্তার করেন। জয়দেবই বাক্‌রচনার বিশুদ্ধতা জানেন। দুরূহ বস্তুর সরলতায় শরণ প্রশংসনীয়। বিশুদ্ধ শৃঙ্গার-রসাশ্রিত সংক্ষিপ্ত রচনায় আচার্য গোবর্ধনের সমকক্ষ আছে ব'লে শোনা নেই। কবিনৃপতি ধোয়ী শ্রুতিধর॥'

কবিতাটি যিনি লিখেছিলেন তিনি উমাপতিধরের প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন না। জয়দেবের কথা বাদ দিলে উমাপতিধরকে তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি বলতে হয়। (এঁর কবিতার আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।) শরণ কবি হিসাবে খুব খ্যাত ছিলেন না। কবিতাটির রচয়িতা শরণের প্রশংসা করেছেন 'দুর্ঘট বৃত্তি'র গ্রন্থকার ব'লে। এ বই কাব্য নয়, কঠিন ব্যাকরণের গ্রন্থ। গোবর্ধন-আচার্য 'আর্যা-সপ্তশতী' কাব্যের রচয়িতা।

জয়দেব কোন না কোন সময়ে লক্ষ্মণসেনের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন এ কথা স্বীকার ক'রতে হয়। তবে তিনি যে গোড়া থেকেই রাজ-সভাসদ্ ছিলেন না সে কথার প্রমাণ আছে। সদুক্তিকর্ণামৃতে সঙ্কলিত জয়দেবের রচিত একটি রাজস্তুতি শ্লোক (৩, ১১, ৫) থেকে বোঝা যায় যে, একদা তিনি গৌড়নৃপতির দর্শন লাভ করবার জন্য রাজসভার দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এ রাজা যে লক্ষ্মণসেন তাতে সন্দেহ নেই।

লক্ষ্মীকেলিভুজঙ্গ জঙ্গমহরে সংকল্পকল্পদ্রুম
শ্রেয়ঃসাধক সঙ্গসঙ্গরকলা-গাঙ্গেয় বঙ্গপ্রিয় ।
গৌড়েন্দ্র প্রতিরাজরাজকসভালঙ্কার কারাৰ্পিত-
প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল পালক সতাং দৃষ্টোঽসি তুষ্টা বয়ম্ ॥

'হে রাজলক্ষ্মীর বিলাসী নায়ক, হে জঙ্গম হরি, হে বাঞ্ছাকল্পতরু, হে কল্যাণ-সাধক, হে সংগ্রামনৈপুণ্যে ভীষ্ম, হে বঙ্গজনের প্রিয়, হে গৌড়েন্দ্র, হে প্রতিরাজ ও রাজক-পূর্ণ সভার অলঙ্কার, হে প্রতিপক্ষ রাজবর্গের কারাদণ্ডদাতা, হে সৎলোকের পালক, দেখা গেলে তুমি। (তাতেই) আমরা খুশি ॥'

"বয়ম্" থেকে অনুমান করতে ইচ্ছা হয় যে রাজসভায় গীতগোবিন্দ নাটগীত হবার পর রাজা পারিতোষিক দিতে চাইলে অধিকারী জয়দেব হয়ত এই শ্লোকটি পড়েছিলেন।

সমসাময়িক কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে লক্ষ্মণসেনের চারিত্র্য ও ব্যক্তিত্ব যে কত গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল তার আরও একটি প্রমাণ পাই সদুক্তিকর্ণামৃত-সঙ্কলয়িতা শ্রীধরদাসের এই প্রারম্ভিক একটি শ্লোকে,

শৌর্যাণীব তপাংসি বিভ্রতি ভবং যস্মিন্ ন যস্যাবধির্
জ্ঞানে দান ইব দ্বিষাম্ ইব জয়ো যেনেন্দ্রিয়াণাং কৃতম্ ।
সম্রাজাম্ ইব যোগিনাম্ অপি গুরুর্ যশ্চ ক্ষমামণ্ডলে
স শ্রীলক্ষ্মণসেন একনৃপতির্ মুক্তশ্চ জীবন্ন্ অভূৎ ॥

'শূরকীর্তিসকলের মতো তপস্যা-সকলও যাতে বিধৃত আছে, জ্ঞানে যেমন দানেও তেমনি যাঁর অন্ত নেই, যেমন ইন্দ্রিয়সমূহ তেমনি শত্রুদেরও যিনি জয় করেছেন, যিনি পৃথিবীতে সম্রাটদের যেমন যোগীদেরও তেমনি গুরু, সেই অনন্য নৃপতি শ্রীলক্ষ্মণসেন জীবৎকালেই মুক্ত হয়েছেন ॥'

শ্রীধরদাস জয়দেব ও মিনহাজের উক্তি মিলিয়ে দেখলে লক্ষ্মণসেনকে, চৈতন্যের কথা বাদ দিলে, শ্রেষ্ঠ বাঙালী বলতে হয়।

লক্ষ্মণসেনের কবিতারচনার কথা পরে বলছি সদুক্তিকর্ণামৃতের প্রসঙ্গে।

উমাপতিধর দ্বাদশ শতাব্দীর সংস্কৃত কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর প্রকীর্ণ কবিতাগুলি সংখ্যায় অনল্প এবং বৈচিত্র্যে ও সহৃদয়তায় স্বাদু। ইনি প্রায় আগাগোড়া সেন-বংশের মহামন্ত্রী ছিলেন। বিজয়সেন প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের শিলালিপি প্রশস্তি ইঁহারই রচনা। বিজয়সেনের এই প্রশস্তিটি উমাপতিধরের রচিত কাব্য বলে নেওয়া যেতে পারে। বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের শাসনপট্টে উৎকীর্ণ শ্লোক অধিকাংশ ইঁহারই রচনা ব'লে মনে হয়। (সদুক্তিকর্ণামৃতের আলোচনায় উমাপতিধরের রচনা-বিচার দ্রষ্টব্য।)

কৃষ্ণের শৃঙ্গারলীলার কবিতা-গান একদা—খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত তো বটেই—পণ্যস্ত্রীদের গেয় ও বেশ-বিলাসীদের কর্ণরসায়ন বস্তু ছিল। প্রমাণ বাণভট্টের উক্তি,—"বিটানাং কর্ণামৃতানি অশ্লীল-রাসক-পদানি গায়ন্ত্যঃ....পণ্যবিলাসিন্যঃ"।[১] সেই অমেধ্য অশ্লীল আবর্ত হ'তে কৃষ্ণের প্রেমকাহিনীকে উদ্ধার ক'রে জয়দেব এক স্থায়ী বিশিষ্ট সাহিত্য-ধারার প্রস্রবণ বইয়ে দিয়েছিলেন। যে বস্তুতে জয়দেব সাহিত্যবিশুদ্ধি নিষ্পন্ন করলেন সেই বস্তুতে উমাপতিধর প্রেমবিশুদ্ধি এনে দিয়ে চৈতন্যের ধর্মের যেন পথ দেখিয়ে ছিলেন। পরে আলোচনা করছি।

গোবর্ধন-আচার্যের আর্যাসপ্তশতীর উল্লেখ আগে করেছি। অনুকরণে কল্পিত কবিতা। আর্যাছন্দে লেখা শ্লোকগুলিতে বিশুদ্ধ কবিত্বের প্রকাশ তেমন নেই। শৃঙ্গাররসের বাহুল্য গাথাসপ্তশতীর মতো নয়, তবে আছে। সেকালের সংসার-সমাজের টুকিটাকি খবর পাওয়া যায়। যেমন,

[১] হর্ষচরিত চতুর্থ অধ্যায়

উপনীয় কলমকুড়বং

কথয়তি সভয়শ্চিকিৎসকে হলিকঃ।[১]

'এক-ধামা কলমা ধান নিয়ে এসে চাষা ভয়ে ভয়ে চিকিৎসককে বলছে।'

উৎকম্পঘর্ম-পিচ্ছিল-

দোঃসাধিকহস্তবিচ্যুতশ্চৌরঃ।[২]

'পুলিসের উদ্বেগজনিত ঘামে-পিছল হাত থেকে চোর পালিয়ে গেল॥'

[১] ১৩০খ। [২] ১৩৩খ।

৪

কবিতা-সঙ্কলন

কালিদাসের পরে সংস্কৃত কবিতা কিছু সার্থকতা পেয়েছিল প্রকীর্ণ রচনায়। যদিও কিরাতার্জুনীয় ও শিশুপালবধের মতো কাব্যগ্রন্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাদর লাভ করেছিল তবুও এগুলির মধ্যে এমন শ্লোক খুব কমই আছে যা অনেক প্রকীর্ণ কবিতার তুলনায় রসে ও রঙে তুলনীয়। আগে বলেছি, বাংলা দেশে অনেক কবি ভালো খুচরা শ্লোক লিখেছিলেন। এই সঙ্গে আরও বলি যে বাংলা দেশেই সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতার প্রথম সঙ্কলন দুটি করা হয়েছিল। একটির নাম 'সুভাষিত-রত্নকোশ', অপরটির নাম 'সদুক্তিকর্ণামৃত'।

'সুভাষিতরত্নকোশ'[১] দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে কোন সময়ে রচিত ব'লে অনুমান করা হয়। সঙ্কলয়িতার নাম বিদ্যাকর। ইনি বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন, সম্ভবত বাংলা দেশের কোন মহাবিহারের পণ্ডিত ছিলেন। সংগৃহীত শ্লোকসংখ্যা সতের শ'র উপর, সঙ্কলিত কবির সংখ্যা দু শ'র উপর। পাল-রাজাদের সময়ে অনেক কবির রচনা এতে আছে। যেমন, অভিনন্দ, কুমুদাকর-মতি (পাণ্ডুভূমি বিহারের মহাপণ্ডিত), চক্রপাণি (দত্ত ?), জিতারি-নন্দী, জ্ঞানশ্রী-মিত্র (অতীশের সমসাময়িক), ধর্মদাস, বুদ্ধাকর-গুপ্ত (জগদ্দল বিহারের মহাপণ্ডিত ?), মনোবিনোদ, যোগেশ্বর, ধর্মপাল (রাজা ?), রাজ্যপাল (রাজা বা রাজপুত্র ?), লডহচন্দ্র (রাজা শ্রীচন্দ্রের পৌত্র), বসুকল্প (দত্ত), বীর্যমিত্র, বাক্‌কূট, শ্রীধর-নন্দী, সঙ্ঘশ্রী (রাজগুরু), সুবিনীত (শ্রীচন্দ্রের সভাকবি), ইত্যাদি।

সদুক্তিকর্ণামৃতের[২] সঙ্কলন-সমাপ্তিকাল ফাল্গুন ১১২৭ শকাব্দ (=১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ)। সঙ্কলয়িতা শ্রীধরদাসের পিতা বটুদাস ছিলেন

---

[১] কোশাম্বী ও গোখলে সম্পাদিত, হার্ভার্ড ওরিয়েণ্টাল সিরিজ ৪২, ১৯৫৭। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামে, টমাস সম্পাদিত, এসিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯১২।

[২] রামাবতার শর্মা সম্পাদিত, মোতীলাল বনারসী দাস, লাহোর, ১৯৩৩।

লক্ষ্মণসেনের "মহাসামন্তচূড়ামণি" এবং "অনুপমপ্রেমৈকপাত্রং সখা"। সঙ্কলিত শ্লোকসংখ্যা ২৩৮০, কবি-সংখ্যা প্রায় পাঁচ শ। সুভাষিত-রত্নকোশের অনেক কবির কবিতা সদুক্তিকর্ণামৃতে আছে। সবচেয়ে মূল্যবান্ হ'ল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের এদেশি কবিদের শ্লোকসংগ্রহ, বিশেষ ক'রে লক্ষ্মণসেনের, তাঁর পুত্র-বান্ধবদের এবং অপর সমসাময়িকদের নিজের অথবা অপরের দ্বারা লেখানো শ্লোকগুলি। বলা বাহুল্য সদুক্তিকর্ণামৃতের অনেক কবিতা-শ্লোকই এদেশের লোকের রচনা। এ অনুমান করা যায় বিশেষ ক'রে নামের আগে গাঁই অর্থাৎ গ্রামনামের অথবা আগে কিংবা পিছনে জাতিগত বৃত্তির উল্লেখ (অর্থাৎ পদবী) থেকে। যেমন, করঞ্জ ধনঞ্জয়, করঞ্জ মহাদেব, করঞ্জ যোগেশ্বর ; কেন্দ্রনীল নারায়ণ ; কেশরকোণীয় নাথোক ; গোতিথীয় দিবাকর ; তালহড়ীয় রঙ্ক (বা দঙ্ক) ; তৈলপাটীয় গাঙ্গোক ; রত্নমালীয় পুণ্ড্রোক ; ভট্টশালীয় পীতাম্বর ; ভবগ্রামীণ বাথোক ; কালিদাস নন্দী, জয় নন্দী, তরণি নন্দী, রুদ্র নন্দী, শ্রীধর নন্দী, সাঞ্জা নন্দী[১] ; গোবিন্দ স্বামী, চন্দ্র স্বামী ; গদাধর নাথ ; চন্দ্র যোগী ; নারায়ণ দত্ত, প্রভাকর দত্ত, ভগীরথ দত্ত, লঙ্গ দত্ত, বসুকল্প দত্ত, সুব্রত দত্ত, হরি দত্ত ; চন্দ্র চন্দ্র, লডহ চন্দ্র ; পশুপতি ধর, সাগর ধর, সাঙ্কা[২] ধর, সূর্য ধর ; চন্দ্র জ্যোতিস্, বাসুদেব জ্যোতিস্ ; কেবট্ট[৩] পপীপ ; বৈদ্য গদাধর, বৈদ্য ধন্য ; চণ্ডাল[৪] চন্দ্র ; নট গাঙ্গোক ; ঝোড় (?) গোবিন্দ, ইত্যাদি। সেন-রাজার ও রাজ-পুত্রদের এবং সেন-রাজসভার কবিদের অনেক কবিতা আছে। যেমন, বল্লালসেন (একটি), লক্ষ্মণসেন (এগারোটি), কেশবসেন (আটটি), ব(া)সুদেব সেন (তিনটি), যুবরাজ দিবাকর (একটি), উমাপতি ধর (বিরানব্বইটি), নট গাঙ্গোক (দুটি), জয়দেব (একত্রিশটি, তার মধ্যে দুটি গীতগোবিন্দ থেকে), ধোয়ীক (কুড়িটি, তার মধ্যে দুটি পবনদূত থেকে), ধর্মাধিকরণ মধু (আটটি), হলায়ুধ (তিনটি), ইত্যাদি॥

---

[১] তুলনীয় 'সন্ধ্যাকর নন্দী'।
[২] অর্থাৎ "খাঁটি" ?
[৩] অর্থাৎ 'কেওট' (=জেলে)।
[৪] চণ্ডাল জাতীয় ? না পদবী 'চন্দ্র' ?

৫

বসুকল্প

সুভাষিতরত্নকোশ ও সদুক্তিকর্ণামৃত থেকে কিছু বিশিষ্ট কবি ও কবিতার আলোচনা করছি। বাংলা দেশে সংস্কৃত কবিতা চর্চায় যে বিশেষ প্রবণতা ও দক্ষতা দেখা গিয়েছিল সে কথা আগে বলেছি। সঙ্কলন গ্রন্থ দুটিতে যে সব কবির রচনা সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্যে একটি কবির পরিচয় তাঁর রচনা থেকেই সংগ্রহ করা যায়, অন্যত্র এঁর কোন হদিশ পাওয়া যায় নি। ইনি বসুকল্প, পুরো নাম বসুকল্প দত্ত, ভালো কবিদের একজন।[১] মনে হয় এঁর মাতৃভূমি ছিল কাম্বোজ (অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ-প্রাগ্‌জ্যোতিষ ?)। একটি কবিতা মাতৃভূমির বন্দনা, আর একটি কবিতায় দূরপ্রবাসী কবির মাতৃভূমির জন্য মনোবেদনার প্রকাশ।

তৎকল্পদ্রুমকীর্ণসংস্তরিরজস্ তৎকামধেনোঃ পয়স্
তৎ চ ত্র্যম্বকনেত্রদগ্ধবপুষঃ পুষ্পায়ুধস্যানলম্।
পদ্মায়াঃ শ্বসিতানি [তানি[২]] চ শরৎকালস্য তচ্চ স্ফুটং
ব্যোমাদায় বিনির্মিতোঽসি বিধিনা কাম্বোজ তুভ্যং নমঃ ॥[৩]

'সেই কল্পদ্রুমের আস্তীর্ণ কেশর, সেই কামধেনুর দুগ্ধ, শিবের নেত্রদ্বারা দগ্ধদেহ কামদেবের সেই অনল (=রৌদ্রতাপ), পদ্মা (নদীর ?) সেই সমীর, শরৎকালের সেই আকাশ! বিধি [এই সব] নিয়ে তোমাকে নির্মাণ করেছেন। কাম্বোজ (দেশ), তোমাকে নমস্কার ॥'

ক্রীড়ৎকিন্নরকামিনীবিহসিতজোৎস্নাবলক্ষীকৃতাঃ
কস্তূরীমদদুর্দিনার্দ্রসুরভীঃ প্রাগ্‌জোতিষীয়া ভুবঃ।

১ মদীয় বিচিত্র-সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পৃ ২৬১-৬৪ দ্রষ্টব্য
২ কৌশাম্বী-গোখলে অনুমিত পাঠ '[লানি]'।
৩ সুভাষিতরত্নকোশ ১৪৪৪।

নীহারস্থলসংচরিষ্ণুচমরীলাঙ্গুলসংমার্জনী-
হেলোন্মৃষ্টনমেরুপুষ্পরজসো দ্রষ্টুং সমীহামহে ॥[১]

'ক্রীড়াকারিণী কিন্নরীদের হাস্যজ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল, কস্তূরীর গন্ধে ও হস্তীর মদস্রাবে সুরভিত, তুষারময় ভূমিতে বিচরণশীল চমরীর পুচ্ছ। সম্মার্জনীরূপে যেখানে নমেরু ফুলের রেণু হেলায় বিকীর্ণ করে, সেই প্রাগ্‌জ্যোতিষীয় দেশ দেখতে আমরা ব্যাকুল ॥'

বসুকল্প সমতটের কাম্বোজ-বংশীয় কোন রাজার (অথবা কোন বিদ্রোহী সেনাপতির?) অনুচর ছিলেন এবং এই রাজা গৌড়েশ্বরের প্রতিপক্ষ ছিলেন ব'লে মনে হয়।

ভৃঙ্গৈর্নাবিকসন্নিভৈঃ পরিগতং শুদ্ধান্তবামভ্রুবাং
কর্ণভ্রষ্টমবেক্ষ্য কেতকদলং বাপীজলে সংতরৎ।
শ্রীমৎসাহসমল্ল বীর ভবতো নৌসার্থমন্তঃ স্মরন্‌
উত্ত্রস্তোঽদ্য পুনঃ করোতি সলিলক্রীড়াং ন গৌড়াধিপঃ ॥[২]

'মহিষী-মহলের মেয়েদের কর্ণচ্যুত কেয়াফুলের পাপড়ি ভ্রমরবেষ্টিত হ'য়ে পুষ্করিণীর জলে নাবিকদলের মতো ভাসতে দেখে, হে সাহসমল্ল বীর,[৩] তোমার নৌবাহিনী মনে পড়ায় উৎকণ্ঠিত হ'য়ে গৌড়াধিপ এখন আর জলক্রীড়া করে না ॥'

একটি শ্লোকে কবি তাঁর পোষ্টা রাজার এবং সেই রাজার মৃত পিতা ও পিতামহের উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

ত্বং কাম্বোজ বিরাজসে ভুবি ভবত্তাতো দিবি ভ্রাজতে
তত্তাতস্তু বিভূষণঃ স কিমপি ব্রহ্মৌকসি দ্যোততে।
যুষ্মাভিস্ত্রিভির্‌ এভিরর্পিততনু স্তবৎ কীর্ত্তিরুজ্জৃম্ভিণী
মাণিক্যস্তবকত্রয়প্রণয়িনী হারস্য ধত্তে শ্রিয়ম্‌ ॥[৪]

১ সদুক্তিকর্ণামৃত ৫.১৭.৫।
২ ঐ ৩.২৬.১। ৩ অর্থাৎ 'সাহসী-যোদ্ধা বীর'
৪ সুভাষিতরত্নকোশ ১০১৬।

'কাম্বোজ, তুমি পৃথিবীতে বিরাজ করছ। তোমার পিতা স্বর্গে দীপ্তি পাচ্ছেন। তাঁর পিতা এক অনির্বচনীয় বিভূষণ হয়ে ব্রহ্মলোকে দ্যোতমান। তোমাদের এই তিনজনের দ্বারা তোমার প্রস্ফুট কীর্তি আত্ম-সমর্পণ ক'রে তিন স্তবক মণিহারের শোভা ধারণ করেছে (তোমার) দেহে॥'

একটি শ্লোক থেকে জানা যায় যে কবির পোষ্টা শিবমন্দিরের সন্নিকটে মনোহর সরোবর নির্মাণ করিয়েছিলেন।[১] মনে হয় শ্লোকটি কোন প্রশস্তি-কাব্যের অন্তর্গত ছিল। তাহলে সম্ভবত শিবায়তন স্থাপনও সেই রাজার কীর্ত্তি।

একটি শ্লোকে বসুকল্প পূর্ববর্তী কয়েকজন কবির সঙ্গে নিজের তুলনা করেছেন।

বাণঃ প্রাণিতি কেশটঃ স্ফুটমসৌ জাগর্তি যোগেশ্বরঃ
প্রত্যুজ্জীবতি রাজশেখরগিরাং সৌরভ্যমুন্মীলতি।
যেনায়ং কলিকালপুষ্পধন্বুযো দেবস্য শিক্ষাবশাদ্
আকল্পং বসুকল্প এব বয়সি প্রাগল্‌ভ্যমভ্যস্যতি॥[২]

'বাণ বেঁচে আছে, কেশট ভালো রকমে জেগে আছে, যোগেশ্বর পুনর্জীবন পাচ্ছে, রাজশেখরের বাণী-সৌরভ প্রকাশিত হচ্ছে। (তবে) কলিকালের কামদেব দেবের (=রাজার?) শিক্ষাবশে বসুকল্পই অল্প বয়স থেকে বাক্যরচনায় পটুত্ব অভ্যাস করেছে॥'

তখনকার দিনের অনেকের মতো বসুকল্প যুগপৎ বৌদ্ধ এবং শৈব-ভাবাপন্ন ছিলেন। অর্থাৎ তিনি বুদ্ধ-বন্দনা, শিব-বন্দনা এবং গণেশ-বন্দনা লিখেছেন। মনে হয় তিনি নিজে ছিলেন আসলে বৌদ্ধ এবং তাঁর পোষ্টা রাজা ছিলেন শৈব।

বসুকল্প কোন চন্দ্র-রাজার সভাসদ ছিলেন হয়ত। রাজা

[১] সদুক্তিকর্ণামৃত ৫.১৩.৫। [২] সদুক্তিকর্ণামৃত ৫.২৬.৩

শ্রীচন্দ্রের এক সভাসদ্ কবি সুবিনীতের রচিত এই প্রশস্তি-শ্লোকটি সুভাষিতরত্নকোশে আছে।[১]

পর্যঙ্কং শিথিলীকৃতং ন ভবতা সিংহাসনান্নোত্থিতং
ন ক্রোধানলধূমরাজিরিব চ ভ্রূবল্লিরুল্লাসিতা।
রাজ্ঞাং ত্বচ্চরণারবিন্দমথ চ শ্রীচন্দ্র পুষ্যন্ত্যমূশ্
চঞ্চচ্চারুমরীচিসঞ্চরমুচাং চূড়ামণীনাং রুচঃ॥

'আপনি পর্যঙ্ক (=পা মুড়ে বসা) আলগা করেন নি (অর্থাৎ ওঠবার ইঙ্গিত করেন নি), সিংহাসন থেকেও ওঠেন নি, (আপনার) ভ্রূলতাও ক্রোধবহ্নির ধূমরেখার মতো উৎক্ষিপ্ত হয় নি। হে শ্রীচন্দ্র, রাজাদের চূড়ামণিসমূহের প্রতিফলিত সুন্দর দীপ্তিতে আপনার চরণ শোভা ধারণ করছে (অর্থাৎ তারা ভয়ে পায়ে লুটিয়ে পড়ছে)॥'

[১] ১৪০২।

৬

"বঙ্গাল"

সদুক্তিকর্ণামৃতে বঙ্গাল কবির দুটি শ্লোক আছে। "বঙ্গাল" শব্দটি নাম না হ'য়ে "বঙ্গাল দেশের কবি" বোঝাতে পারে। প্রথম কবিতাটি নারীনয়ন-শোভার বর্ণনা।[১]

অক্ষিভ্যাং কৃষ্ণশারাভ্যাম্ অস্যাঃ কর্ণৌ ন বাধিতৌ।
শঙ্কে কনকতাড়ঙ্কপাশগ্রাসভয়াদিব॥

'কালো-সাদা (অন্য অর্থে মৃগবিশেষ) আঁখি দুটি তার কান আক্রমণ করে নি, বোধ হয় সোনার কানবালাকে আক্ষিপ্ত পাশ আশঙ্কা ক'রে॥'

দ্বিতীয় কবিতাটিতে আত্মরচনা-প্রশংসা, তবে এখন আমরা যেন শ্লোকটির মধ্যে সমকালীন কথ্যভাষার অর্থাৎ অচিরোদ্ভূত বাংলা ভাষার জয়ধ্বনি শুনতে পাই। বিশেষ ক'রে গঙ্গাপ্রবাহের সঙ্গে তুলনা অত্যন্ত চমৎকার।

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিমসুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ॥

'গঙ্গা ও বঙ্গাল-বাণী, (দুটিই) প্রগাঢ় রসময়, গভীর, সুন্দরগতিভঙ্গময় এবং কবিদের উপজীব্য। (দুটিতেই) অবগাহন করলে পুণ্য হয়॥'

১ ২,৭০,৪।

৭

সেন-রাজসভা

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে, চৈতন্যদেবের সময়ে রাধাকৃষ্ণ প্রেম-লীলার যেসব কাহিনী প্রচলিত ছিল তা সবই দেখি লক্ষ্মণসেনের সভাকবিদের ও তাঁদের সমসাময়িক ও ঈষৎ পূর্ববর্তীদের কবিতায় ব্যক্ত অথবা আভাসিত হয়েছে। এমন কি কৃষ্ণের মাথুর-বিরহ এবং দ্বারকাবাসী কৃষ্ণের চিত্তে রাধার প্রেমস্মৃতির প্রকাশও আছে। যেমন,

রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়াং
রুক্মিণ্যাপি প্রততপুলকোদ্ভেদমালিঙ্গিতস্য।
বিশ্বং পায়ান্ মসৃণযমুনাতীরবানীরকুঞ্জে-
ষ্বাভীরস্ত্রীনিভৃতচরিতধ্যানমূর্চ্ছা মুরারেঃ॥

'রত্নদ্যুতিবিকীর্ণ সমুদ্রতীরে দ্বারকায় মন্দিরে রুক্মিণীর আলিঙ্গনে প্রবল পুলকান্বিত হ'য়েও, যমুনার শ্যামল তীরে বেতস কুঞ্জে গোপনারীর সঙ্গে গোপন বিহারের স্মৃতি জাগরূক হওয়ায়, কৃষ্ণের যে মূর্চ্ছাময় তন্ময়তা তা বিশ্বকে রক্ষা করুক॥'

কালিন্দীমনুকূলকোমলরয়ামিন্দীবরশ্যামলাঃ
শৈলোপান্তভুবঃ কদম্বকুসুমৈরামোদিনঃ কন্দরান্।
রাধাং চ প্রথমাভিসারমধুরাং জাতানুরাগঃ স্মরন্
অস্তু দ্বারবতীপতিস্ত্রিভুবনামোদায় দামোদরঃ॥

'ধীরস্রোত কালিন্দীর কূলে ইন্দীবরশ্যামল শৈলতট-ভূমি, কদম্ব-কুসুমে আমোদিত গুহাগুলি এবং প্রথম অভিসারে আগতা মধুরমূর্ত্তি রাধা মনে পড়ায় উদ্দীপিত-অনুরাগ দ্বারকাপতি দামোদর ত্রিভুবনের আনন্দের কারণ হোন॥'

প্রথম কবিতাটি উমাপতিধরের, দ্বিতীয়টি শরণের। দুজনেই লক্ষ্মণ-সেনের সভাসদ এবং জয়দেবের সমসাময়িক ছিলেন।

আর একটি উদাহরণ দিই। রচনা অজ্ঞাতনামার। রাত্রিতে কৃষ্ণ দয়িতার (রাধার ?) বাড়িতে গিয়ে কবাটে ঘা মারছেন খিল খুলে দেবার জন্যে। দ্বারে এসে গোপী রহস্যচ্ছলে কৃষ্ণকে গোপন অভিসারে আগত ব'লে উপহাস করছে।

কস্ত্বং ভো নিশি কেশবঃ শিরসিজৈঃ কিং নাম গর্বায়সে
ভদ্রে শৌরিরহং গুণৈঃ পিতৃগতৈঃ পুত্রস্য কিং স্যাদিহ।
চক্রী চন্দ্রমুখি প্রযচ্ছসি ন মে কুণ্ডীং ঘটীং দোহিনীং
ইত্থং গোপবধূহিতোত্তরতয়া দুঃস্থো হরিঃ পাতু বঃ॥

' "কে গো তুমি এত রাত্রিতে ?" "(আমি) কেশব[১]।" "চুল নিয়ে গর্ব করছ ?" "ওগো আমি শৌরি[২]।" "বাপের গুণে ছেলের কি হবে এখানে ?" "(আমি) চক্রী[৩]।" "আমাকে তো কুঁড়ি ঘটি কেঁড়ে দাও নি।" এইভাবে গোপবধূর প্রদত্ত উত্তরে প্রতিহত কৃষ্ণ তোমাদের রক্ষা করুন॥'

সদুক্তিকর্ণামৃতে লক্ষ্মণসেন ও তৎপুত্র কেশবসেনের লেখা এমন দুটি কবিতা আছে যা পড়লেই জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের কথা মনে প'ড়ে যায়। শ্লোক দুটি এই, প্রথমটি লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয়টি কেশবসেনের,

কৃষ্ণ ত্বদ্‌বনমালয়া সহকৃতং কেনাপি কুঞ্জান্তরে
গোপীকুন্তলবর্হদাম তদিদং প্রাপ্তং ময়া গৃহ্যতাম্।
ইত্থং দুগ্ধমুখেন গোপশিশুনাখ্যাতে ত্রপানম্রয়ো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি বলিতস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ॥

' "কৃষ্ণ, এক কুঞ্জের ভিতরে তোমার বনমালার সঙ্গে (কোন) গোপীর খোঁপার মালা এই আমি পেয়েছি, নাও।" সরল গোপশিশু (এই কথা) বলায় রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত স্মিত হাস্য ও অলস দৃষ্টির জয় হোক॥'

[১] অর্থাৎ সুকেশ। [২] অর্থাৎ শূরের পুত্র। [৩] অর্থাৎ চক্রধারী (এক অর্থে সুদর্শনধারী, অপর অর্থে কুম্ভকার)।

আহূতাদ্য ময়োৎসবে নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা
ক্ষীবঃ প্রৈষ্যজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি।
বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালয়মিতি শ্রুত্বা যশোদাগিরো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুরস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥

'"আজ আমার আহ্বানে (এখানে) এসেছে ঘর শূন্য রেখে। কুলবধূ, সে একলা কী ক'রে যাবে? পরিচারকেরা সব পানোন্মত্ত। বাছা, তুমিই তাহলে একে বাড়ী পৌঁছে দাও।" যশোদার এই কথা শুনে রাধা ও কৃষ্ণের স্মিতমধুর দৃষ্টিবিনিময়ের জয় হোক ॥'

৮

জীবনের প্রতিচ্ছবি

সদুক্তিকর্ণামৃতের অনেক এবং সুভাষিতরত্নকোশের কয়েকটি শ্লোকে এ দেশের প্রকৃতির পরিচয় ও জীবনের সুখ-দুঃখের ছবি উঠেছে। এমন শ্লোক রচনায় মুখ্যস্থান অধিকার করেছেন যোগেশ্বর। ইনি পাল-রাজাদের সময়ে ছিলেন এবং অভিনন্দের পূর্ববর্তী। এঁর রচনা কিছু উদ্ধৃত করছি।

গর্বায়ন্তে পলালং প্রতি পথিকশতৈঃ পামরাঃ স্তূয়মানা
গোপান্ গোগর্ভিণীনাং সুখয়তি বহলো রাত্রিরোমন্থবাষ্পঃ।
প্রাতঃ পৃষ্ঠাবগাঢ়প্রথমরবিরুচি গ্রামসীমোপশল্যে
শেতে সিদ্ধার্থপুষ্পচ্ছদনিচিতহিমক্লিন্নপক্ষ্মা মহোক্ষঃ॥

'গাঁয়ের লোক শত শত পথিকের প্রশংসা পেয়ে পোয়ালকুড় নিয়ে গর্ব করে। রাত্রিবেলায় গাবিন গোরুর জাবরকাটার ভুড়ভুড়ি শব্দ গয়লাদের ভালো লাগে। সকালে গ্রামসীমান্তের মাঠে শুয়ে আছে বড় ষাঁড়। তার পিঠের রঙ গাঢ় করেছে সকালের রোদ, তার চোখের পাতায় লেগে আছে সাদা সরষের ফুলের পাপড়ি শিশিরে ভিজে হয়ে॥'

উদ্বেগং জনয়ন্তি সংচিতবৃষব্যাপ্তাজিরোপান্তকাঃ
প্রাতঃ শীর্ণকুটীরপুঞ্জিতলতাশিম্বীতুষারানিলাঃ।
গ্রামা গোময়ধূমসংততিপরিক্লিষ্টারুণশ্মশ্রুভির্
বৃদ্ধৈঃ কুড্যনিবাতলীননিভৃতৈরভ্যর্থ্যমানাতপাঃ॥

'উঠানের প্রান্তে ষাঁড় জড়ো হয়ে উদ্বেগ সঞ্চার করছে (অতএব সেখানে তিষ্ঠানো যায় না)। গ্রামের শীর্ণ কুটীরের উপর পুঞ্জীভূত শিমলতা থাকায় সকালের হাওয়া ঠাণ্ডা। বৃদ্ধেরা, যাদের দাড়ি অনবরত ঘুঁটের ধোঁয়া লেগে কটা হ'য়ে গেছে, তারা হাওয়ার আড়ালে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে॥'

অজ্ঞাতনামা কবির একটি শ্লোকে ফসলতোলার দিনে পল্লীসমৃদ্ধির মনোহর বর্ণনা পাই।

শালিচ্ছেদসমৃদ্ধহালিকগৃহাঃ সংস্পৃষ্টনীলোৎপল-
স্নিগ্ধশ্যামযবপ্ররোহনিবিড়ব্যাদীর্ঘসীমোদরাঃ।
মোদন্তে পরিবৃত্তধেম্বনডুহশ্ছাগাঃ পলালৈর্নবৈঃ
সংসক্তধ্বনদিক্ষুযন্ত্রমুখরা গ্রামা গুড়ামোদিনঃ॥[১]

'চাষীদের ঘর কেটে আনা ধানের স্তূপে সমৃদ্ধ। সংলগ্ন (জলাশয়ে) নীলোৎপলের সংযোগে নবপ্ররূঢ় শ্যামল যবাঙ্কুর ক্ষেত্রসীমাকে যেন দীর্ঘায়ত করেছে। গাই-ষাঁড়-ছাগল (ঘরে) ফিরে এসে নতুন পোয়াল পেয়ে তৃপ্তি পাচ্ছে। গ্রামগুলি নিকটস্থ আখমাড়াই-কলের শব্দে মুখর আর গুড়ের গন্ধে আমোদিত॥'

পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের আচরণ নিয়ে কয়েকটি ভাল শ্লোক আছে। একটিতে সন্ধ্যার পরে চাঁদের আলোয় মেয়েদের গান গেয়ে চাল কাঁড়ার বর্ণনা।[২] আর একটিতে গাঁয়ের যুবতী মেয়ের কূয়া থেকে জল তোলার দৃশ্য।[৩] আর একটিতে গৃহস্থ মেয়েদের হাট করতে যাওয়ার ছবি। সেটি এই,

এতাস্তা দিবসান্তভাস্করদৃশো ধাবন্তি পৌরাঙ্গনাঃ
স্কন্ধপ্রস্খলদংশুকাঞ্চলধৃতিব্যাসঙ্গবদ্ধাদবাঃ।
প্রাতর্যাতকৃষীবলাগমভিয়া প্রোৎপ্লুত্য বর্ত্মচ্ছিদো
হট্টক্রয্যপদার্থমূল্যকলনব্যগ্রাঙ্গুলিগ্রন্থয়ঃ॥[৪]

'এই চলেছে ধেয়ে গৃহস্থ মেয়েরা। চোখ তাদের সন্ধ্যাসূর্যের মতো অরুণ। কাঁধ থেকে (বারবার) খসে পড়া আঁচল ধ'রে লাগিয়ে দিতে যাদের আগ্রহ। চাষী-কর্তা সকালে বেরিয়েছে, কখন সে ফিরে আসে সেই শঙ্কায় তারা লাফিয়ে লাফিয়ে চ'লে পথ সংক্ষেপ করছে। হাটে কেনাবার জিনিসের দর তারা আঙ্গুলে গুণতে ব্যস্ত॥'

[১] সদুক্তিকর্ণামৃত ২.১৭৬.৩। [২] ঐ ৫.১.৩।
[৩] ঐ ৫.১.৪। [৪] ঐ ৫.১.৫।

সাজোকের একটি শ্লোক থেকে জানা যায় যে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা হিন্দুদের ধর্মের-ষাঁড়কে ধ'রে মদের ভাঁড় বইবার কাজে লাগাত। সে সময়ে সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের (যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র) সম্পর্কের এই একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

পূতঃ শ্রৌতপরিস্ক্রিয়াভিরবহীভাবায় যো দীক্ষিতঃ
শ্লাঘ্যা যস্য গয়াশিরঃসহচরী তুল্যোঽশ্বমেধেন যঃ।
নাসাবেধনতশ্চিরেণ কলিতশ্চক্রত্রিশূলাঙ্কিতো
ধিক্ কর্মাণি তুরুষ্কবেশ্মনি সুরাকাণ্ডালবাহী বৃষঃ ॥[১]

'ভারবহন থেকে মুক্ত হবার জন্যে যাকে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা পবিত্র করা হয়েছে, যার খ্যাতি গয়াতীর্থের মতো, যা অশ্বমেধের তুল্য। অনেক কাল আগে, নাসাবেধের পর চক্র ও ত্রিশূল ছাপ দেওয়া হয়েছিল (তাকে)। সে বৃষ আজ তুরস্কের আবাসে মদের পিপে বইছে! ধিক্ কর্মফল ॥'

ভাগীরথী নদীর অবস্থা স্থানে স্থানে দ্বাদশ শতাব্দীতেও যে অনেকটা এখনকার দিনের মতো হ'য়ে আসছিল তা উমাপতিধরের এই কবিতাটি থেকে অনুমান করা যায়,

নেত্রায়াতপথব্যতীতপয়সঃ সন্ত্যেব নদ্যঃ শতে
প্রায়শ্চিত্তমুপাচরন্তি কৃতিনঃ স্পৃষ্ট্বৈব যাসাং পয়ঃ।
যা দৃষ্ট্বৈব পুনাতি বিশ্বমখিলং সৈব পুনর্জাহ্নবী
বিচ্ছিন্না ক্বচিদাবিলা ক্বচিদতিস্বচ্ছাম্বুশোষ্যা ক্বচিৎ ॥[২]

'শত শত নদী আছে যাদের ধারা দৃষ্টি পথের বাইরে এবং যাদের জল স্পর্শ দ্বারা সুকৃতী ব্যক্তিরা প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করেন। কিন্তু যে (নদী) চোখে পড়লেই বিশ্বভুবন পবিত্র হয় সে হ'ল জাহ্নবী, (যদিও সে) কোথাও বিচ্ছিন্ন, কোথাও ঘোলাটে, কোথাও স্বচ্ছ এবং কোথাও বালিচাপা ॥'

---

[১] ঐ ৪.৪৮.৪। [২] ৪.২০.৪।

হিউয়েন-সাঙ এদেশের অঞ্চল বিশেষের কাঁটালের খুব প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর প্রায় পাঁচ শ বছর পরে উমাপতিধর ন্যায্যোক্তি করেছেন।

> পৃথুত্বাৎ সৌরভ্যান্ মধুরতরভাবাচ্চ পতিতৈঃ
> ক্ষুধাতপ্তৈঃ কুক্ষিম্ভরিভিরিহ সেবা তব কৃতা।
> তদাত্বব্যামুগ্ধৈরনুদিবসমস্বাস্থ্যজননী
> ন দৃষ্টা তে ঽস্মাভিঃ পনস পরিণামে বিরসতা ॥

'বড় আকার ব'লে সুগন্ধ ব'লে অত্যন্ত সুমিষ্ট ব'লে ক্ষুধাপীড়িত লোকেরা ছুটে এসে পেট ভরাবার জন্যে এদেশে তোমার সেবা করেছিল। তারপর থেকে, হে কাঁটাল, অত্যন্ত বোকা আমরা দিনের পর দিনেও তোমার অস্বাস্থ্যকর পরিপাক-দুঃখ লক্ষ্য করি নি॥'

আমের উপযুক্ত প্রশংসা উমাপতিধরের আগে কেউ করেন নি।

> সুগন্ধিঃ কোঽপি স্যাৎ কুসুমসময়ে কোঽপি বিটপী
> শলাটৌ সামোদঃ ফলপরিণতৌ কোঽপি সুরভিঃ।
> প্রসূনপ্রারম্ভাৎ প্রভৃতি ফলপাকাবধি পুনর্
> জগত্যেকত্রৈব স্ফুরতি সহকারে পরিমলঃ॥

'কোন কোন বৃক্ষ ফুল ফোটাবার কালে সুগন্ধি হয়। কোন কোন (বৃক্ষের) কাঁচা ফল হয় সুরভি (সুস্বাদ), কোন কোন (বৃক্ষ) আবার ফল পাকলে হয় মনোরম। কিন্তু ফুল ফোটাবার আরম্ভ থেকে ফল পেকে যাওয়া পর্যন্ত (আগাগোড়া) পরিমল (অর্থাৎ মাধুর্য) জগতে একমাত্র আম্রবৃক্ষেই প্রকটিত॥'

দ্বাদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে সংস্কৃত রচনায় সবচেয়ে বিশিষ্ট এবং প্রতিভূস্থানীয় কবি ছিলেন সেনরাজাদের তিন পুরুষের মহামন্ত্রী উমাপতিধর। তাঁর যে সব শ্লোক উদ্ধৃত করেছি তার থেকে একথা

প্রতিপন্ন হবে। এখন আর একটি ভালো শ্লোক উদ্ধৃত করছি। বিষয় বৃদ্ধের নিরুপায় অবস্থা।

দন্তৈরুৎপতিতং স্ফুরন্তি বলয়ো নিষ্কালিমানঃ কচাঃ
শীর্ণং দেহমপেতমেব করণগ্রামেণ লুপ্তা মতিঃ।
অস্মিন্নপ্রতিকারদারুণজরাব্যাধৌ দয়ার্দ্রাত্মনো
ভ্রাতর্বৈদ্য বিধীয়তে তব কিয়দ্ যাবন্ ময়া ভেষজম্॥

'দাঁত পড়ে গেছে, (হাতের) বালা খ'সে পড়ছে[১], চুল সাদা হ'য়ে গেছে, দেহ শীর্ণ, ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রায় চ'লে গেছে, বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। যার কোন প্রতিকার নেই এমন এই দারুণ জরাব্যাধিতে, হে ভাই বৈদ্য, দয়া ক'রে তোমার কোন ঔষধ আমার জন্য বিধান করতে পার॥'

এখন বিদ্যাকরের সুভাষিতরত্নকোশ থেকে দুটি শ্লোকরত্ন উদ্ধার করছি।

প্রথম শ্লোকটির ব্যঙ্গার্থ এখনকার দিনেও সমান উপভোগ্য। কবির নাম জানা নেই।

সুবর্ণকার শ্রবণোচিতানি
বস্তূনি বিক্রেতুমিহাগতস্ত্বম্।
কুতোঽপি নাশ্রাবি যদত্র পল্ল্যাং
পল্লীপতি র্যাবদবিদ্ধকর্ণঃ॥

'হে সেকরা, এখানে এসেছ তুমি কানের গয়না বিক্রয় করতে! কোথাও থেকে কি তোমার কানে যায়নি যে এ গাঁয়ের মোড়লেরও কান[১] এখনো বেঁধানো নয়॥'

দ্বিতীয় শ্লোকটিতে গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নের যে প্রখর ছবি উঠেছে তা সেকালের তো বটেই একালেরও। কবি পুরুষোত্তম-দেব, বিষয় মধ্যাহ্নে রাজসম্ভাষণ।

[১] তখনো পুরুষেরাও অলঙ্কার পরত।

রথ্যাগর্ভেষু খেলারসিকশিশুগণং ত্যজয়েৎ পূর্বকেলীর্
উদ্দণ্ডাব্জচ্ছদালীতলমুপগময়েদ্ রাজহংসীকুলানি।
অধ্যেতৄণাং দধানং ভৃশমলসদৃশাং কিঞ্চিদঙ্গাবসাদং
দেবস্যৈতৎ সমস্তাদ্ ভবতু সমুচিতশ্রেয়সে মধ্যমহ্নঃ॥

'রাস্তার মাঝখানে খেলারসিক ছেলেদের দীর্ঘখেলা ভঙ্গ করে, ঊর্ধ্বনাল পদ্মদলের নীচে রাজহংসীদের একত্র করে, ঘন ঘন অলসনেত্র অধ্যয়নরতদের দেহে কিছু অবসন্নতা দেয় এই যে সবদিকে ব্যাপ্ত মধ্যদিন, হে দেব, তা আপনার সমুচিত কল্যাণের হেতু হোক॥'

৯

সঙ্কলন দুটির কবি

সুভাষিতরত্নকোশে এবং সদুক্তিকর্ণামৃতে সঙ্কলিত শ্লোকের রচয়িতার সংখ্যা যথাক্রমে ২২৩ এবং ৪৮৫। তবে দুটি গ্রন্থের অনেক কবি একাধিক নামে তালিকাভুক্ত হয়েছে, তা ছাড়া অনেক শ্লোকের কবির নাম নেই। সুতরাং বলতে পারি বিদ্যাকর প্রায় দু শ কবিকে জড় করেছেন, শ্রীধরদাস প্রায় সাড়ে চার শ'কে। আগেই বলেছি বিদ্যাকরের সঙ্কলনের মোটা অংশ শ্রীধরদাস গ্রহণ করেছেন। দুটি গ্রন্থে সঙ্কলিত কবিদের মধ্যে কতকগুলিকে নিশ্চিতভাবে এদেশি বলা যায়, আর কতকগুলিকে নামধামের জন্যই এদেশি বলে অনুমান করা যায়। শেষোক্তদের উদাহরণ যেমন, নারায়ণ দত্ত (স),[১] চক্রপাণি (দত্ত ?) (সু, স), অমৃত দত্ত (স), প্রভাকর দত্ত (স), দিবাকর দত্ত (স), ভগীরথ দত্ত (স), লঙ্গ দত্ত (স), সঙ্ঘশ্রী মিত্র (সু, স), জ্ঞানশ্রী মিত্র (সু), বীর্য মিত্র (সু, স), মঞ্জুশ্রী মিত্র (সু), কালিদাস নন্দী (স), জয় নন্দী (স), জিতারি নন্দী (সু), তরণি নন্দী (সু, স), রুদ্র নন্দী (স), শ্রীধর নন্দী (সু, স), সাঞ্চা নন্দী (সু), চণ্ডাল চন্দ্র (স), চন্দ্র চন্দ্র (স), জল চন্দ্র (স), জীব চন্দ্র (সু), তিল চন্দ্র (স), লডহ চন্দ্র (সু, স), সংগ্রাম চন্দ্র (স), ত্রিপুরারি পাল (স), বিত্ত পাল (স), ধর্মপাল (সু, স), রতি পাল (সু), বিজয় পাল (সু), রাজ্যপাল (সু), সাঞ্চা ধর (স), সাগর ধর (স), পশুপতি ধর (স), সূর্য ধর (স); করঞ্জ গ্রামের ধনঞ্জয় মহাদেব ও যোগেশ্বর।(স); কেশরকোণি (বা কেশরকোলি) গ্রামের নাথোক (স), গোতিথি গ্রামের দিবাকর (স), শকটি গ্রামের শবর (স), তালহড়ি গ্রামের দক্ষ (স), তৈলপাটি

[১] স = সদুক্তিকর্ণামৃত। সু = সুভাষিতরত্নকোশ।

গ্রামের গাঙ্গোক, কেন্দ্রনীল গ্রামের নারায়ণ (স), রত্নমালা গ্রামের পুণ্ড্রোক (স), ভট্টশালি গ্রামের পীতাম্বর (স), ভবগ্রামের বাথোক (স), কেবট্ট কুলের পপীপ (স), ইত্যাদি।

দুটি সঙ্কলনেই সমসাময়িকদের রচনা আছে। সদুক্তিকর্ণামৃতে সমসাময়িক কবিদের কতককে চিনতে পারা যায়, সুভাষিতরত্নকোশে অতটা যায় না। শ্রীধরদাস লক্ষ্মণসেনের সভাসদের পুত্র ছিলেন, তিনি সেন-রাজা ও রাজপুত্রদের রচিত শ্লোক অনেক সংগ্রহ করেছেন,—যেমন বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন, বাসুদেবসেন, যুবরাজ দিবাকর, পুরুষোত্তমসেন, বন্ধুসেন, যুবসেন। সেন-রাজসভাসদ্দের রচনাও আছে—ধর্মাধিকরণিক মধু, ধর্মাধিকরণিক রুদ্র, "কবিরাজ" ব্যাস, হলায়ুধ, ইত্যাদি। উমাপতিধর, জয়দেব, গোবর্ধন-আচার্য, শরণ, ধোয়ী—এঁদের রচনা তো আছেই।

সেকালে ছদ্মনামে শ্লোক রচনা করবার রীতি ছিল। কোন কোন কবি ছদ্মনামেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। এক কবি নাম নিয়েছিলেন (অথবা পেয়েছিলেন) "বাক্‌কূট" (অর্থাৎ যার বাক্য হাতুড়ি মতো কঠিন)[১]। একটি শ্লোকে পূর্বতন কবি অভিনন্দের ভাগ্য এবং পূর্বতন রাজা শ্রীচন্দ্রের দানশীলতার প্রশংসা ক'রে রচয়িতা নিজের কালের এবং ভাগ্যের নিন্দা করেছেন।[২] সদুক্তিকর্ণামৃতে ছদ্মনামা কবির সংখ্যা নিতান্ত কম নয়,—কঙ্কণ[৩], ভবভীত, ভেরীভ্রমক, বঙ্গাল, বাগ্‌বীণ, যুবতীসম্ভোগকার[৪], রজক-সরস্বতী[৫], ইত্যাদি।

"বঙ্গাল" কবির কথা আগেই বলেছি॥

[১] তেমনি আর একটি কবির নাম ছিল "মধুকূট" (অর্থাৎ মধুরাশি)। দুজনের শ্লোকই সুভাষিতরত্নকোশে উদ্ধৃত আছে।

[২] নির্বেদব্রজ্যা ৪০। [৩] তুলনীয় ষোড়শ শতাব্দীর কবি-কঙ্কণ। [৪] তুলনীয় বৈষ্ণব পদকর্তা তরুণীরমণ। [৫] তুলনীয় চণ্ডীদাসের রজকিনী-রামী।

৯০

কৌতুক-রস

সেকালে সংস্কৃতে কৌতুক-রসের কবিতা এত কম যে নেই বললেই হয়। এদেশে লেখা (দ্বাদশ শতাব্দীর এক গ্রন্থকার উদ্ধৃত) একটি মাত্র এমন শ্লোক পাওয়া গেছে।

জরদ্‌গবো কম্বলপাদুকাভ্যাং দ্বারি স্থিতো গায়তি মঙ্গলানি।
তং ব্রাহ্মণী পৃচ্ছতি পুত্রকামা রাজন্ রুমায়াং লশুনস্য কোঽর্ঘঃ॥

'বুড়ো বলদ একজোড়া কম্বলের জুতো প'রে দরজায় দাঁড়িয়ে মঙ্গল-গান করছে। তাকে পুত্রার্থিনী ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করছে, "রাজা-মহাশয়, রোমে রসুনের কী দাম?"'

একরকম কৌতুকরসের প্রকাশ ছিল সমস্যাপুরণে। এক বাঙালী কবি ধর্মদাস (দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে) 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন' নামে এইরকম হেঁয়ালি কবিতার বই লিখেছিলেন। ধর্মদাসের বইয়ে সংস্কৃতে রচিত শ্লোক আছে, সংস্কৃত-প্রাকৃতে মিশ্রিত শ্লোক আছে, বিশুদ্ধ প্রাকৃতে রচিত শ্লোক আছে, এবং তখনকার কথ্য সাধুভাষা লৌকিকে (অরহট্‌ঠে) লেখা শ্লোকও আছে। ধর্মদাসের এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি বাঙালীর লেখা প্রাকৃতের অত্যন্ত দুর্লভ নিদর্শন। সংস্কৃত-মিশ্র, বিশুদ্ধ প্রাকৃত, সংস্কৃত-মিশ্র লৌকিক এবং বিশুদ্ধ লৌকিক হেঁয়ালি শ্লোকের উদাহরণ দিই।

প্রশ্ন: মৎস্যহিতম্ অম্বু কীদৃক্ পৃচ্ছতি[১] রোগী নিশাসু কিং ভাতি।
কোঽনঙ্গো বদতি মৃগঃ কিং খে গম্মই রইণা॥

উত্তর: অবিসামভম্মিরেণ॥

'মাছের পক্ষে ভালো জলাশয় কী?'
(উত্তর, 'অবি' অর্থাৎ বকহীন)।

[১] ভাববাচ্যের।

'রোগীকে কী জিজ্ঞাসা করা হয় ?'
(উত্তর, 'সাম' অর্থাৎ শরীর অসুস্থ কি ?)
'রাত্রিতে কী দীপ্তি পায় ?' (উত্তর, 'ভম্‌' অর্থাৎ তারা)।
'অনঙ্গকে কী বলা হয় ?' (উত্তর, 'ইঃ')।
'মৃগকে কী বলা হয় ?' (উত্তর, 'এণ')।
'আকাশে রবি কেমন ভাবে যান ?' (উত্তর, 'অবিসামভমিরেণ'
—সংস্কৃত অবিশ্রামভ্রমিরেণ, অর্থাৎ অবিশ্রান্ত-ভ্রমণে)।'

প্রশ্ন: কা হরই মণং পইণো গুণ-গণ-জোব্বণ-সলাহণিজ্জস্স।
কঅ-চড়চড়িত্তি-সদ্দা হুআসনা কেরিসা হোন্তি ॥

উত্তর: সরিসবহুআ ॥
'গুণগণশ্লাঘনীয় পতির মন হরণ করে কে ?'
(উত্তর, 'সরিস-বহুআ', অর্থাৎ সরেশ বৌ)।
'কি হ'লে আগুন চড়-চড় শব্দ করে ?'
(উত্তর, 'সরিসব-হুআ', অর্থাৎ সর্ষপ হোম করলে)।

প্রশ্ন: শব্দঃ কঃ স্যাৎ পুরুষবচনং কুণ্ডলৌ কৌ স্মরারেঃ
কাম্‌ অম্ভোধের্হরিরুদহরদ্‌ বীবধঃ পৃচ্ছতীদম্‌।
হাণ্ডী কুণ্ডী আণেসি ন বড়া কীস অম্মার অত্থং
জে পুচ্ছিল্লা সে পুণু পরিহারুত্তরং কীস দেই ॥

উত্তর: নাহী কুম্ভার।[১]
'কোন্‌ শব্দ পুরুষবাচী হতে পারে ?'
(উত্তর, 'না', নৃ শব্দের প্রথমা একবচন)।
'শিবের কুণ্ডল দুটি কী ?'
(উত্তর, 'অহী', অহি শব্দের প্রথমা দ্বিবচন)।
'কাকে হরি সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেছিলেন ?'
(উত্তর, 'কুম্‌', অর্থাৎ পৃথিবীকে)।

[১] উত্তরটি সমসাময়িক (প্রাচীন) বাংলায়।

'হাঁড়ি-কুঁড়ি আনিসনি কেন রে বোকা আমাদের জন্যে ?—যাকে একথা জিজ্ঞাসা করা হ'ল সে কেমন কাটান উত্তর দিলে ?'

(উত্তর, 'নাহী কুম্ভার', অর্থাৎ হাটে কুমোর ছিল না)।

প্রশ্ন ঃ জা নীআণই নিন্দে বিভোলি
সা কিঁ বুচ্চই বোল্ল রে সম্ভালি।
জো তিল-সরিসব পীড়ই ঘাণী
কীস ভণিজ্জই সে বিন্নাণী ॥

উত্তর ঃ সুতেল্লী।

'যে (মেয়ে) নিদ্রায় বিভোর—সাড়া নেই, তাকে কি বলা যায়, বল ওরে ভেবে।' (উত্তর, 'সুতেল্লী', অর্থাৎ প্রসুপ্তা)। 'ঘানীতে যে তিল-সর্ষে মাড়াই করে সে দক্ষ ব্যক্তিকে কী বলা হয় ?' (উত্তর, 'সু-তেল্লী', অর্থাৎ ভালো তেলি)।

এদেশে বিরচিত—কবে তা জানা নেই—একটি ব্যাকরণ দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে ব্যাখ্যাত ও পরিমার্জিত হয়েছিল। ব্যাকরণটির নাম 'সংক্ষিপ্ত-সার'। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলে এই গ্রন্থটি প্রায় হাজার বছর ধ'রে একচ্ছত্র পাঠ্য হয়ে এসেছে। মূল গ্রন্থকর্তার নাম ক্রমদীশ্বর। এঁর সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই, এমন কি ইনি মানুষ না দেবতা তাও নির্ণয় করা যায় নি। ব্যাকরণটিকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছিলেন জুমর-নন্দী। ইনি কোন রাজসভায় উচ্চপদস্থ সচিব ছিলেন। পরবর্তী কালে এই বৃত্তিকার জুমর-নন্দীই গ্রন্থকর্তা ব'লে উল্লিখিত হয়েছেন। পাণিনির ব্যাকরণের মতো জুমরের ব্যাকরণও অষ্টাধ্যায়ী। প্রথম সাত অধ্যায়ে সংস্কৃত ভাষার বিবরণ এবং শেষ অধ্যায়ে প্রাকৃতের সঙ্গে সমসাময়িক সাধুভাষা অবহট্‌ঠেরও সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। অবহট্‌ঠের উদাহরণ একটি ছড়া (শ্লোক) আছে, সেটি কৌতুকাবহ। গরীব মূর্খের দম্ভোক্তি।

জড়াসো তড়াসো চারি হথো
ঘরই অগ্গে খেড্‌ড বুত্তো।
গাই হোই ঘরণি বি দোহী
[কীস] বোল্ল অণহী নাহী ॥

'যেমন তেমন চার হাত। ঘরের আগে ঘাস বোনা হয়েছে। গাই আছে। গিন্নিই দোয়। (তবে) কেন অলক্ষ্মণ (কথা) বলছ (আমার) কিছু নেই ॥'

১১

কৃষ্ণকথা

লক্ষ্মণসেনের সভায় কৃষ্ণলীলা-কাহিনীর সমধিক আদর ছিল। তবে এদেশে কৃষ্ণলীলা কবিতার উৎকর্ষ তার বেশ কিছুকাল আগেই দেখা দিয়েছিল। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে বিদ্যাকরের সুভাষিতরত্নকোশ (বা কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়) শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃতের খুব কম সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে সঙ্কলিত হয়েছিল, এবং তাতে অর্থাৎ বিদ্যাকরের সংগ্রহে সেন-রাজসভার কোন কবির রচনা নেই। এই গ্রন্থে 'হরিব্রজ্যা' ('বিষ্ণুব্রজ্যা') শীর্ষকে যে চুয়াল্লিশটি শ্লোক আছে তার মধ্যে বারোটি হ'ল কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক (তার মধ্যে সাতটি শ্রীধরের সংকলনেও আছে)। এই শ্লোকগুলি থেকে জানা যায় যে তখনই কৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রধান বস্তুগুলি কাব্যে গাঁথা পড়েছে এবং রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা-কাহিনী, রাসলীলা বাদে, প্রায় সম্পূর্ণই আলিখিত হয়েছে।[১] যেমন, যশোদার বাৎসল্য,

> বৎস ক্ষ্মাধরগহ্বরেষু বিচরন্ চারপ্রচারে গবাং
> হিংস্রান্ বীক্ষ্য পুরঃ পুরাণপুরুষং নারায়ণং ধ্যাস্যসি।
> ইত্যুক্তস্য যশোদয়া মুররিপোরব্যাজ জগন্তি স্ফুরদ্
> বিম্বোষ্ঠদ্বয়গাঢ়পীড়নবশাদ্ অব্যক্তভাবং স্মিতম্॥[২]

' "বাছা, গোরু চরাতে চরাতে বেড়াবার সময়ে পাহাড়ের গুহায় হিংস্র জন্তু সামনে দেখলে নারায়ণ স্মরণ ক'রো।"—যশোদার এই কথায় মুরারি (কৃষ্ণ) রাঙা ঠোঁট টিপে যে অস্ফুট হাসি হাসলেন তার দীপ্তি সকল জগৎ রক্ষা করুক॥'

গোচারণ শেষ ক'রে গোরু নিয়ে কৃষ্ণ অপরাহ্নে ঘরে ফিরছেন।

[১] বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ পঞ্চম সংস্করণ পৃ ৩৭-৩৮ দ্রষ্টব্য। [২] সদুক্তিকর্ণামৃতে শ্লোকটি অভিনন্দের নামে উদ্ধৃত।

তাঁর শ্রান্ত ক্লান্ত মূর্ত্তির এই বর্ণনা ভাগবতের বিখ্যাত "বর্হাপীড়ং নটবর-বপুঃ" ইত্যাদি শ্লোকের তুলনায় ম্লান নয়,

মন্দক্বণিতবেণুরহ্নি শিথিলে ব্যাবর্ত্তয়ন্ গোকুলং
বর্হাপীড়কমুত্তমাঙ্গরচিতং গোধূলিধূম্রং দধৎ।
ম্লায়ন্ত্যা বনমালয়া পরিগতঃ শ্রান্তোঽপি রম্যাকৃতির্
গোপস্ত্রীনয়নোৎসবো বিতরতু শ্রেয়াংসি বঃ কেশবঃ॥

'বেলা প'ড়ে এলে গোরু ফিরতে ফিরতে, ময়ূরপুচ্ছমণ্ডিত শিরোবেষ্টন গোরুর খুর-উৎক্ষিপ্ত ধূলায় ধূসর ক'রতে ক'রতে, ম্লান বনমালা প'রে, শ্রান্ত হ'লেও সুন্দরকায়, গোপনারীদের নয়নানন্দকর যে কেশব তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন॥'

সুভাষিতরত্নকোশের প্রত্যূষ-ব্রজ্যার একটি শ্লোক অত্যন্ত মূল্যবান্। এর থেকে জানতে পারছি যে একাদশ শতাব্দীতে কিংবা তারও আগে কাঁথা-গায়ে গরীব (বৈষ্ণব?) ভিখারিরা সহর-বাজারে রাজপথে প্রভাতে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা-গান গেয়ে গেয়ে সহরবাসীর সুপ্তিভঙ্গ ক'রত। শ্লোকটি ডিম্বোকের রচনা।

রথ্যাকার্পটিকৈঃ পটচ্চরশতস্যূতোরুকন্থাবল-
প্রত্যাদিষ্টহিমাগমার্তিবিশদপ্রস্নিগ্ধকণ্ঠোদরৈঃ।
গীয়ন্তে নগরেষু নাগরজনপ্রত্যূষনিদ্রামুদো
রাধামাধবয়োঃ পরস্পররহঃপ্রস্তাবনাগীতয়ঃ॥

'ছেঁড়া কাপড় সেলাই করা মোটা কাঁথায় ঠাণ্ডা লাগার ভয় নিবারণ ক'রে যাদের উদর ও কণ্ঠ স্নিগ্ধ, রাজপথের এমন ভিখারিরা নগরবাসীর নিদ্রা প্রত্যূষে ভঙ্গ করিয়ে রাধা ও মাধবের পরস্পর নিভৃতলীলার গান গাইছে॥'

বিদ্যাকরের সঙ্কলনে মোট শ্লোকসংখ্যা ১৭৩৯, তার মধ্যে কৃষ্ণলীলা-ঘটিত শ্লোকসংখ্যা বারো। আর শ্রীধরদাসের সঙ্কলনে সবশুদ্ধ শ্লোক-সংখ্যা ২৩৬৪, তার মধ্যে কৃষ্ণলীলা-ঘটিত শ্লোকসংখ্যা ষাট। বিদ্যাকর বৌদ্ধ ছিলেন, কৃষ্ণলীলা বিষয়ে তাঁর কোন বিশেষ অনুরাগ থাকবার

কথা নয়, তিনি সাধারণ শিক্ষিতসমাজে প্রচলিত শ্লোকগুলি নিয়েছিলেন। শ্রীধরদাস ছিলেন বৈষ্ণব এবং তাঁর পিতা লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্ ছিলেন, সুতরাং কৃষ্ণলীলা-কথায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ থাকার কথা। কিন্তু এই কারণেই যে শ্রীধরদাসের সঙ্কলনে বেশি শ্লোক স্থান পেয়েছে তা নয়, লক্ষ্মণসেনের সভায় যেসব কবিতার জন্ম অথবা সমাদর হয়েছিল সে সব শ্লোক তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।

রাধা ও কৃষ্ণের প্রণয়লীলার প্রতিচ্ছবি লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর দাম্পত্য প্রেমের মধ্যেও কল্পনা করেছিলেন সেকালের কবিরা। দুটি উদাহরণ দিই, একটি প্রাচীন একটি নবীন। প্রাচীন শ্লোকটি বাক্‌পতির (বা বাক্‌পতিরাজের), এটি সুভাষিতরত্নকোশ ও সদুক্তিকর্ণামৃত উভয়ত্রই আছে। মানিনী লক্ষ্মীর সঙ্গে বিষ্ণুর কথাকাটাকাটি।

> দেবি ত্বং কুপিতা ত্বমেব কুপিতা কোঽন্যঃ পৃথিব্যা গুরুর্
> মাতা ত্বং জগতাং ত্বমেব জগতাং মাতা ন বিজ্ঞোঽপরঃ।
> দেবি ত্বং পরিহাসকেলিকলহেঽনন্তা ত্বমেবেত্যথ
> জ্ঞাতানন্ত্যপদো নমল্লধিজাং শৌরিশ্চিরং পাতু বঃ॥

' "দেবি, তুমি কোপ করেছ ("কুপিতা")।" "তুমিই পৃথিবীর পতি ("কু-পিতা")। পৃথিবীতে তোমার উপর আর কে?" "তুমি জগতের মাতা।" "তুমিই জগতের পরিমাপকারী, তোমার চেয়ে কেউ বিজ্ঞ নেই।" "দেবি, তুমি ঠাট্টা-তামাসায় অশেষ।" "তুমিই জানো সীমাহীন পদ।" লক্ষ্মীর কাছে মাথা-নতকারী শৌরী তোমাদের চিরকাল রক্ষা করুন॥'

নবীন শ্লোকটির কবি লক্ষ্মণসেনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী এবং সঙ্কলয়িতা শ্রীধরদাসের সমসাময়িক।

> পাণ্ডুলক্ষ্মীকুচাভোগে নর্তিতা হরিণা দৃশঃ।
> ঔৎসুক্যাদেব তেনাদৌ নিহিতা বরণস্রজঃ॥

'লক্ষ্মীর পাণ্ডুবর্ণ পয়োধরে হরির কটাক্ষ নেচে ফির্‌ল, যেন আগ্রহের ভরে তিনি প্রথমেই বরণমালা পরিয়ে দিলেন॥'

বিদ্যাকর বৌদ্ধ ছিলেন তাই তিনি প্রথমেই সুগতের (বুদ্ধের) লোকনাথের (লোকেশ্বরের) এবং মঞ্জুঘোষের (মঞ্জুশ্রীর) বন্দনা-শ্লোক দিয়ে সঙ্কলন আরম্ভ করেছেন। শ্লোকসংখ্যা যথাক্রমে পনেরো আট ও পাঁচ। তখনকার দিনে অর্থাৎ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে এদেশে বৌদ্ধসংস্কারযুক্ত সাধারণ লোকের মধ্যে এই তিন দেবতারই পূজা চলিত ছিল। 'সুগতব্রজ্যা'র অর্থাৎ বুদ্ধ-বন্দনাগুলির প্রথম শ্লোকটি অশ্বঘোষের। দ্বিতীয় শ্লোকটি বাঙালী কবি বসুকল্পের। সেটি উদ্ধৃত করছি।

নম্রাঃ পাদনখেষু যস্য দশসু ব্রহ্মেশকৃষ্ণাস্ত্রয়স্
তে দেবাঃ প্রতিবিম্বনাৎ ত্রিদশতাং সুব্যক্তমাপেদিরে।
স ত্রৈলোক্যগুরুঃ সুদুস্তরভবাকূপারপারং গতো
মারব্যূহজয়প্রগল্‌ভসুভটঃ শাস্তা তব স্যান্‌ মুদে ॥

'ব্রহ্মা ঈশ (শিব) ও কৃষ্ণ (বিষ্ণু, হরি) তিন দেবতা নত হ'য়ে যাঁর পায়ের দশ-নখে প্রতিবিম্বন লাভ ক'রে মুখ্যভাবে ত্রিদশত্ব[১] প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই ত্রিভুবনগুরু, সুদুস্তর ভবার্ণবের পারগামী, মারসেনাজয়ে নির্ভীক যোদ্ধা, শাস্তা (উপদেষ্টা অর্থাৎ বুদ্ধ) তোমার আনন্দবর্ধন করুন ॥'[২]

[১] ত্রিদশ পদটি এখানে শ্লিষ্ট। এক অর্থে দেবতা, অপর অর্থে তিন-গুণিত দশ।

[২] মনে হয় শ্লোকটি কোন ব্যক্তির প্রতি আশীর্বাদ।

৬২

শিবকথা

কৃষ্ণকথার মতো শিবকথাও সেকালে সাহিত্যে অনুশীলিত হয়েছিল। শিবকাহিনী নিয়ে বড় কাব্য বেশি লেখা হয় নি। যা লেখা হয়েছিল তাও আমাদের কাছে পৌঁছয় নি। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের সভাকবি চন্দ্রচূড়-চরিত লিখেছিলেন ব'লে উমাপতিধর উল্লেখ করেছেন। অনুমান করছি এই কবির নাম ছিল জলচন্দ্র। জলচন্দ্রের রচিত তিপ্পান্নটি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে সঙ্কলিত আছে, তার মধ্যে নয়টি শিব-ঘটিত। তাঁর নামে অপর কোন দেবতার বন্দনা-শ্লোক নেই। সুতরাং মনে হয় জলচন্দ্র প্রচণ্ড শৈব ছিলেন।

কৃষ্ণকাহিনী রোমান্টিক প্রেমের, শিবকাহিনী গার্হস্থ্য সুখ-দুঃখের। সেকালে সাধারণ লোকসমাজে তাই শিবের কথার সমাদর বেশি ছিল। রাজসভার নিভৃতে সমাদর ছিল কৃষ্ণপ্রেমকথার। সুভাষিতরত্নকোশ এবং সদুক্তিকর্ণামৃত দুয়েতেই শিবের গৃহকথা বিষয়ে শ্লোক অনেকগুলি সংগৃহীত হয়েছে।[১] কিছু উদাহরণ দিই।

মাতর্জীব কিমেদঞ্জলিপুটে তাতেন গোপায়িতং
বৎস স্বাদু ফলং প্রযচ্ছতি ন মে গত্বা গৃহাণ স্বয়ম্।
মাত্রৈবং প্রহিতে গুহে বিঘটয়ত্যাকৃষ্য সন্ধ্যাঞ্জলিং
শম্ভোর্মগ্নসমাধিরুদ্ধরভসো হাস্যোদ্‌গমং পাতু বঃ॥

' "মা!" "বেঁচে থাক!" "কী ও বাবা হাতের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে?" "বাছা, মিষ্ট ফল।" "আমাকে তো দিচ্ছে না।" "নিজে নাও গিয়ে।" মায়ের কথায় এইভাবে উৎসাহিত হ'য়ে গুহ (কার্তিক) সন্ধ্যাধ্যানে মগ্ন শিবের জোড়-হাত নিয়ে টানাটানি করাতে ধ্যান-ভাঙার ভয়ে জোর ক'রে টিপে রাখা শিবের হাসির বেগ তোমাদের রক্ষা করুক॥'[২]

[১] সুভাষিতরত্নকোশে এমন শ্লোকের সংখ্যা ৭৪, সদুক্তিকর্ণামৃতে ১৪৫, প্রায় দ্বিগুণ।

[২] যোগেশ্বরের রচনা। শ্লোকটি দুটি সঙ্কলনেই আছে।

প্রাতঃ কালাঞ্জনপরিচিতং বীক্ষ্য জামাতুরোষ্ঠং
কন্যায়াশ্চ স্তনমুকুলয়োরঙ্গুলীভস্মমুদ্রাঃ।
প্রেমোল্লাসাজ্জয়তি মধুরং সস্মিতাভির্বধূভির্
গৌরীমাতুঃ কিমপি কিমপি ব্যাহৃতং কর্ণমূলে ॥

'সকালে জামাইয়ের ঠোঁটে কালো কাজলের দাগ আর কন্যার দুই স্তনে ভস্মমাখা আঙ্গুলের ছাপ দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে বউয়েরা হাসিমুখে গৌরীর মায়ের কানে চুপি চুপি যা বললে তা জয়যুক্ত হোক ॥'[১]

এই শ্লোকটিতে শিব-কর্তৃক গৌরীর মানভঞ্জনের ছবি পাই,

তস্যা নাম ময়া কথং কথমপি ভ্রান্ত্যা সমুচ্চারিতং
জানাস্যেব মমাশয়ং তব কৃতে গৌরী প্রসন্না ভব।
ক্ষান্তিঃ স্বীক্রিয়তাং দয়াবতি ময়ি ক্রোধঃ পরিত্যজ্যতাম্
ইত্যেবং বহু জল্পতঃ স্মররিপোঃ প্রেমাঞ্জলিঃ পাতু বঃ ॥

'"সে নারীর নাম কেন জানি না ভুল ক'রে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। তোমার প্রতি আমার মনের ভাব তুমি জান। হে গৌরী, তুমি প্রসন্ন হও। ক্ষমা আন মনে, হে দয়াবতি, আমার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ কর।" প্রেমভরে হাত-জোড় ক'রে এই রকম অনেক কথা ব'লে গেলেন শিব। সে প্রেমাঞ্জলি তোমাদের রক্ষা করুক ॥'[২]

[১] শুভাঙ্কের রচনা। দুটি সঙ্কলনেই আছে।
[২] চক্রপাণির রচনা। সদুক্তিকর্ণামৃতে আছে।

১৩

গল্পকথা

পঞ্চতন্ত্রের অনেক গল্প এবং সেরকম আরও কিছু কিছু গল্প এদেশে চলিত ছিল। এখানকার সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্যে পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলিকে একটু সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে সাজানো হয়েছিল 'হিতোপদেশ' নাম দিয়ে। এ কাজ করেছিলেন যিনি তাঁর নাম নারায়ণ। সম্ভবত দ্বাদশ শতাব্দীতে তিনি বর্তমান ছিলেন। অষ্টম-নবম শতাব্দীতে এসব গল্প যে এদেশে নিজস্বভাবে লিখিত হয়েছিল তার কোন প্রমাণ নেই, তবে লোকমুখে যে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ রয়েছে। পাহাড়পুরের (সোমপুর বিহারের) বিধ্বস্ত মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে এসব গল্পের চিত্র আছে।—কীলোৎপাটী বানর, সর্প-নকুল ইত্যাদি। একটি ছবির গল্প অন্যত্র কোথাও নেই, আছে সেকশুভোদয়ায়। গল্পটি এই। লক্ষ্মণসেনের সভায় খুব ভালো গান হচ্ছিল। সভামণ্ডপের বাইরে কাছেই একটি কুয়া ছিল। এক মেয়ে তার শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে কলসী কাঁখে জল তুলতে এসেছিল। গান শুনে মেয়েটি এতই তন্ময় হয়ে যায় যে সে কলসী মনে ক'রে ছেলেটির গলায় দড়ি বেঁধে কুয়ায় নামিয়ে দিয়েছিল। ছবিতে আছে এই গল্পের উদ্যোগ-পর্ব পর্যন্ত। উপসংহার আছে সেকশুভোদয়ায়। ছেলেটি মরে যাওয়ায় মেয়েটি কাতর হ'য়ে সেখের শরণাপন্ন হয়। সেখ ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দেন।

বেতাল-পঞ্চবিংশতির কাহিনীর ধরণের দুএকটি কাহিনীও সেকশুভোদয়ায় আছে। সেকশুভোদয়া বইটি অনেক পরবর্তী কালে প্রচলিত হ'লেও এটি যে একটি প্রাচীনতর, সম্ভবত লক্ষ্মণসেনের সভাসদ হলায়ুধের, রচনা ঢেলে সাজা তা বোঝা যায়। সেই হিসাবে সেকশুভোদয়াকে সেকালের বাংলা দেশের গল্পের বইয়ের প্রতিভূস্থানীয় বলতে পারি॥

১৪

রামকথা

রামকথার কিছু কিছু বস্তু লোক-সমাজে নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল কেননা রামচন্দ্র দশাবতারের মধ্যে স্থান পেয়েছিলেন। তবে অষ্টম-নবম শতাব্দীর আগে রামায়ণ এদেশের পণ্ডিত-সমাজেও খুব সমাদৃত ছিল ব'লে মনে হয় না। পাহাড়পুরের ভগ্নমন্দির থেকে যে সব মূর্ত্তিচিত্র পাওয়া গেছে তাতে রামায়ণের কোন ছবি আছে ব'লে মনে হয় না। কিন্তু সেনরাজাদের (?) নির্মিত দেবকুলের যে অলঙ্করণ-প্রস্তরখণ্ড নিয়ে ত্রিবেণীতে জাফর খাঁর সমাধিগৃহ নির্মিত হয়েছিল তার অনেকগুলিতে রামকথার চিত্র ছিল। চিত্রগুলি চেঁছে ফেলা হয়েছে তবে পরিচয় লিপিগুলি র'য়ে গেছে,—"সীতাবিবাহঃ", "রামেণ রাবণবধঃ" ইত্যাদি। এদেশে রামকাহিনী-কাব্য প্রথম লেখা হয় পাল-রাজত্বের গোড়ার দিকে। অভিনন্দের 'রামচরিত'। তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে রাম-কথা নিয়ে এদেশে অনেক নাট্য রচিত হয়েছিল। সে কথা পরে

মহাভারতের শ্লোক কিছু কিছু তাম্রশাসনপট্টে উৎকীর্ণ থাকলেও কুরু-পাণ্ডব কাহিনী এদেশের লোকের কাছে পরিচিত ছিল না। পাহাড়পুরের ভগ্নমন্দির থেকে এবিষয়ে কোন ছবি পাওয়া যায় নি। এবিষয়ে নাট্যরচনাও দুচারখানির বেশি হয়েছিল ব'লে বোধ হয় না॥

১৫
নাট্য-রচনা

এদেশে রচিত বলে অবিসন্দিগ্ধভাবে ধরা যায় এমন কোন নাটক পাওয়া যায় নি। কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা সন্দিহান। বাংলা দেশের সামাজিক অবস্থার কিছু খাঁটি ছবি এই নাটকটিতে আছে। তা যথাস্থানে আলোচিত হবে। নিদর্শন না পাওয়া গেলেও এদেশে যে নানারকম নাট্যনিবন্ধ অনেক রচিত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। নিদর্শনও আছে একটি—গীতগোবিন্দ। (এই গীতিনাট্যটি "বীথী" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব'লে মনে করি।) আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বুদ্ধ-উপাসক সাগরনন্দী 'নাটকলক্ষণ-রত্নকোশ' নামে নাট্যশাস্ত্রের একটি বই লিখেছিলেন। এই বইটিতে এমন অনেক নাট্যরচনার উল্লেখ আছে যা এদেশে লেখা ব'লে বোধ হয়। অন্যত্র উল্লেখ না পাওয়া পর্যন্ত এসব গ্রন্থকে (অথবা অধিকাংশকে) এদেশের রচনা মনে করতে দোষ কি।

সবচেয়ে বেশি নাট্যনিবন্ধ লেখা হয়েছিল রামকথা অবলম্বনে। যেমন,—কৃত্যারাবণ, কেকয়ীভরত, দশরথ (অঙ্ক), পুংসবন (অঙ্ক), প্রাবৃট্ (অঙ্ক), মায়ালক্ষ্মণ (অঙ্ক), বালিবধ (প্রভাণক), বিভীষণনির্ভৎর্সন (অঙ্ক), কুম্ভক (অঙ্ক), রামবিক্রম, রামানন্দ (নাটক), কুলপতি (অঙ্ক), কোশল (অঙ্ক), মারীচবঞ্চিতক, শক্তি (অঙ্ক), সংপাতি (অঙ্ক), সুগ্রীব (অঙ্ক), ক্ষপণকাপালিক, অযোধ্যাভবত। তার পরে কৃষ্ণলীলা-কাহিনী। যেমন,—উৎকণ্ঠিতমাধব (কাব্য), কেলিরৈবতক (হল্লীসক), রেবতীপরিণয়, সত্যভামা (গোষ্ঠী), রাধা (বীথী), ক্রীড়ারসাতল। মহাভারত-কাহিনী নিয়ে চারখানি। যেমন,—ভীমবিজয়, কীচকভীম, কীচক (অঙ্ক), সুন্দর (অঙ্ক)। অপর পৌরাণিক বিষয় নিয়ে,—দেবীমহাদেব (উল্লাপ্যক), নরকবধ, নরকোদ্ধরণ, মায়াশকুন্ত, শর্মিষ্ঠাপরিণয়, লামকায়ন (অঙ্ক), নাগবর্ম (অঙ্ক), ললিত-

নাগর (ভাণ), শৃঙ্গারতিলক (প্রস্থান)। বিবিধ বিষয় নিয়ে,—গৃহবাটিকা (ভাণিকা), গৃহবৃক্ষবাটিকা, তালবীথী (অঙ্ক), পদ্মাবতী-পরিণয়, কলাবতী, মায়াকাপালিক, কনকবতীমাধব (শিল্পক), বীণাবতী (ভাণী), মদনিকাকামুক (রাসক), বিন্দুমতী (দুর্মল্লিকা), ইত্যাদি।

এই সব রচনার মধ্যে কতকগুলি সম্পূর্ণ না হোক অংশত লৌকিক (অর্থাৎ অবহট্ঠ ও প্রত্ন-বাংলা) ভাষায় লেখা হওয়া সম্ভব ॥

১৬

লৌকিক কবিতা

সেকালে সংস্কৃত ছিল সমগ্র দেশের একমাত্র পোষাকী ভাষা—ধর্মের শাস্ত্রের দর্শনের এবং পাণ্ডিত্যের, রাজসভায় ব্যবহৃত। তখনকার সাহিত্য ছিল রাজসভা-পুষ্ট, এবং রাজসভায় প্রবেশাধিকার ছিল পণ্ডিতের। তাই সাহিত্যেরও একমাত্র ভাষা ছিল সংস্কৃত। (সংস্কৃত রচনার মধ্যে যে দুচার ছত্র প্রাকৃত ব্যবহৃত হ'ত তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।)[১] সেকালের লোকের কাছে আমরা এখন যদি প্রাকৃত বলি, তা সংস্কৃতের তুলনায় বোধ করি তখন বেশি অপরিচিত ঠেকত। তারা যে ভাষা বলত তা মোটামুটি নবম শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার সমসাময়িক রূপ —যা আমরা এখন অর্বাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ নামে অভিহিত করি— তা ব্যবহাব করত। দশম শতাব্দীর থেকে এই ভাষা আরও সরল রূপ ধারণ ক'রতে থাকে এবং তার ফলে পূর্ব ভারতে প্রচলিত অর্বাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ থেকে পূর্ব ভারতীয় বিভিন্ন আঞ্চলিক নব্যভারতীয় আর্য-ভাষাগুলি (যেমন, বাংলা উড়িয়া মৈথিল ইত্যাদি) অঙ্কুরিত হ'তে থাকে। মোটামুটি বলা যায় যে দশম শতাব্দী পর্যন্ত এদেশের যে কথ্য ভাষা ছিল তারই সাধু বা সাহিত্যিক রূপ ছিল অবহট্‌ঠ (—সারা আর্যাবর্তেই এই অবহট্‌ঠের অল্পস্বল্প রূপান্তর সাধুভাষা রূপে চলিত ছিল—), এবং দশম শতাব্দীর পর থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত (—সম্ভবত তার কিছু কাল পরেও) এদেশের কথ্য ভাষা যে রূপ নিয়েছিল তাকে আমরা যদি প্রত্ন-বাংলা (ইংরেজীতে প্রোটো-বেঙ্গলি) বলি তবেই সঙ্গত হয়। পণ্ডিতেরা এই ভাষাকে "প্রাচীন" বাংলা বলেছেন। কিন্তু পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার সঙ্গে এই ভাষার তুলনা করলে অবহট্‌ঠের সঙ্গেই মিল বেশি পাওয়া যায় এবং উড়িয়া ও মৈথিল ভাষার সঙ্গে বৈষম্য কমই নজরে পড়ে।

[১] পূর্বে পৃষ্ঠা ২৩৮ দ্রষ্টব্য

সে যাই হোক, নবম-দশম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত একশ্রেণীর উচ্চ আধ্যাত্মিক সাধকেরা সংস্কৃতের সঙ্গে অবহট্‌ঠ এবং প্রত্ন-বাংলা ভাষাকেও নিজেদের কাজে সম্যক্‌রূপে ব্যবহার করেছিলেন। এঁরা সাধনার কর্মকাণ্ড নিয়ে যে সব নিবন্ধ লিখতেন তা সংস্কৃতে। তাঁরা সাধারণত ছিলেন বৌদ্ধ (তান্ত্রিক) যোগী মতাবলম্বী এবং সকলেই বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষা মার্জিত এবং উন্নত। তাঁদের নবাগত শিষ্যেরা তাঁদের পাণ্ডিত্যের নাগাল পেত না। তাই তাঁদের অধ্যাত্ম-শিক্ষার জন্যে তাঁরা কেউ কেউ অবহট্‌ঠ ভাষায় ছড়া লিখেছিলেন। তখনকার দিনে সাধারণ লোকে এবং মেয়েরা যে ধরণের ছড়া কাটিতে অভ্যস্ত ছিল এঁরা অনেক সময়ে নিজেদের রচনায় সেই ঢঙই ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ রূপে সরহের এই দোহাটি উদ্ধৃত করা যায়,

সিদ্ধিরত্থু মই পঢ়মে পঢ়িঅউ
মণ্ড পিবন্তেঁ বিসরঅএ মইউ।
অক্‌খরমেক্ক এত্থ মই জাণিউ
তাহর নাম ণ জাণমি এ সহিউ ॥

'আমি সিদ্ধিরস্তু নিয়ে পড়াশোনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু ফেনভাত খেতে খেতে আমি (সব) ভুলে গেছি। অবশেষে একটি অক্ষর আমার জানা আছে, (কিন্তু) হে সখী, তার নাম তো জানি না ॥'

সহজেই বোঝা যায় যে এ ছড়ার বাচনভঙ্গী মেয়েলি বিদ্যা থেকে নেওয়া।

অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষায় দু-ছত্রের সমিল কবিতার নাম ছিল 'দোহা'। সাধারণত দোহা ছড়া চার-ছত্রের হ'ত। তখন বলত 'চউপঈ' অর্থাৎ চতুষ্পদী। চউপঈর সঙ্গে মাঝে মাঝে অমিল বিষমমাত্রিক দু-ছত্রের 'গাহা' (অর্থাৎ 'গাথা', মৌলিক অর্থ গান) ব্যবহৃত দেখা যায়। বৌদ্ধ তান্ত্রিক যোগীদের রচিত অবহট্‌ঠ ছড়াগুলির সংগ্রহ 'দোহাকোষ (দোহাকোশ)' নামে প্রসিদ্ধ। বাঙালী (পূর্বভারতীয়) তিন জন যোগী

কবির লেখা দোহাকোষ পাওয়া গেছে। এঁরা হলেন তিলো, সরহ এবং কাহ্ন। এর মধ্যে প্রথম দুজনের রচনা প্রাচীনতর এবং সরল। কাহ্নের লেখায় তত্ত্বকথার খোঁচ একটু বেশি আছে।

দোহা-রচয়িতাদের বৌদ্ধ বলা হয় এই জন্য যে তাঁরা গোড়ায় বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন এবং মহাযান মতে যে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের সাধনা প্রবেশ করেছিল তাঁরা একদা সেই সাধনার সাধক ছিলেন। শেষে তাঁরা যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অধিকারী হয়েছিলেন সে দৃষ্টিতে কোন ধর্মের কোন মতই সত্য প্রতিপন্ন হয় নি। তাই তাঁদের দোহায় সব ধর্ম মতের ও সাধনারই নিন্দা আছে। সরহ বলেছেন, প্রথমে ব্রাহ্মণ্য পন্থার কথা।

বম্হণেহি ম জানন্ত হি (ভেউ)
এমই পঢ়িঅউ এ চউবেউ।....
কজ্জেঁ বিরহিঅ হুঅবহ হোমেঁ
অকৃখি ডহাবিঅ কড়ুএঁ ধূমেঁ।
একদণ্ডি ত্রিদণ্ডী ভঅবঁ বেসে
বিণুআ হোইঅই হংস উএসেঁ।
মিচ্ছেহিঁ জগ বাহিঅ ভুল্লেঁ
ধম্মাধম্ম ণ জাণিঅ তুল্লেঁ।

'ব্রাহ্মণেরা অধ্যাত্মরহস্য জানে না, শুধু শুধুই তারা চতুর্বেদ পড়ে।... কাজকর্ম নেই (তাদের, শুধু) অগ্নিতে হোম ক'রে ক'রে তীব্র ধোঁয়ায় (তারা) চোখের যন্ত্রণা পায়। একদণ্ডী, ত্রিদণ্ডী, ভগবদ্-বেশ ধারণ ক'রে (শেষে) জ্ঞানী হয়, পরমহংস-উপদেশ করে। মিথ্যায় জগৎ (এই ভাবে) ভুলের পথে চালিত হচ্ছে। (তারা) জানে না যে ধর্ম ও অধর্ম তুল্যমূল্য।'

তার পরে ঈশ্বর (অর্থাৎ শৈব) পন্থা।

অইরিএহিঁ উদ্দূলিঅ চ্ছারেঁ
সীসসু বাহিঅএ জড়ভারেঁ।

ঘরহী বইসী দীবা জালী
কোণহিঁ বইসী ঘণ্ডা চালী।
অক্‌খি ণিবেসী আসণ বন্ধী
কণ্ণেহিঁ খুসুখুসাই জণ ধন্ধী।
রণ্ডী মুণ্ডী অগ্ন বি বেসেঁ
দিক্‌খিজ্জই দক্‌খিণ উদেসেঁ।

'ঈশ্বর-পন্থীরা ছাই মাখে, মাথায় জটাভার বহন করে। ঘরে বসে, দীপ জ্বালে, কোণে ব'সে ঘণ্টা নাড়ে। চোখ বুজে, আসন ক'রে বসে, কাণে ফুস্‌ফুস ক'রে মন্ত্র দেয় লোক ধাঁধিয়ে। রাঁড়ী নেড়ী অথবা অন্য বেশধারিণীকে দীক্ষা দেওয়া হয় দক্ষিণার জন্যে।'

তার পরে ক্ষপণক (অর্থাৎ জৈন) পন্থা:

দীহণক্‌খ জই মলিণে বেসেঁ
ণগ্‌গল হোই উপাড়িঅ কেসেঁ।
খবণেহি জাণ-বিড়ম্বিঅ বেসেঁ
অপ্পণ বাহিঅ মোক্‌খ উবেসেঁ।
জই ণগ্‌গাবিঅ হোই মুত্তি তা সুণহ সিআলহ
লোমুপ্‌পাড়ণেঁ অত্থি সিদ্ধি তা জুবই-নিঅম্বহ।
পিচ্ছীগহণে দিট্‌ঠ মোক্‌খ তা ঝরিহ তুরঙ্গহ
উঞ্ছেঁ ভোঅণেঁ জই তা.................।
সরহ ভণই খবণাণ মোক্‌খ মহু কিম্পি ণ ভাই
তত্তরহিঅ কা আণ তাব পর কেবল সাহই॥

'দীর্ঘনখ মলিন বেশধারী যতী নগ্ন হ'য়ে কেশ উৎপাটন করে। ক্ষপণকেরা (এই ভাবে) জনতা[১]-বিড়ম্বিত বেশ ক'রে নিজেদের ব্যর্থ করে মোক্ষের উদ্দেশে। যদি নগ্ন হ'লে মুক্তি হয়, তবে কুকুর-শিয়ালের (তা হয়েছে)। লোম-উৎপাটনে যদি সিদ্ধি হয় তা যুবতি-নিতম্বের

[১] অথবা 'যান', বিশিষ্ট সাধনাপদ্ধতি।

(হয়েছে)। ময়ুর-পুচ্ছ ধারণ করলে যদি মোক্ষ গোচর হয় তবে হাতি ঘোড়ার[১] (হয়েছে)। উঞ্ছভোজনে যদি (হয় মুক্তি) তা……… । সরহ বলে, ক্ষপণকদের পথে মোক্ষলাভ ঘটে এ আমার মনে কিছুতেই লাগে না। তত্ত্বরহিত হ'লে আর কি হ'তে পারে, কেবল পরকে ঠকানো ছাড়া।'

তারপর বিভিন্ন বৌদ্ধ পন্থা—স্থবিরবাদ সৌত্রান্তিক ও মহাযান। এখানে ছড়ার শেষটুকু পাওয়া যায় নি।

চেল্লু ভিক্‌খু জে খবির উদেসেঁ
বন্দেহিঁ অপব্বজিউ বেসেঁ।
কোই সুত্তন্ত বক্‌খাণ বইট্‌ঠো
কোপি চিন্তে কর সোসই দিট্‌ঠো।
অন্ন তহি মহজাণহি ধা[ই]………

'চেলা, ভিক্ষু, স্থবির (প্রভৃতি) উপদিষ্ট যারা এবং অপ্রব্রজিতের বেশ ধ'রে যারা বন্দিত হয় (তাদের) কেউ কেউ সূত্রান্ত ব্যাখ্যায় নিরত। কেউ আবার চিন্তা ক'রে ক'রে শুখিয়ে যাচ্ছে দেখা যায়। অপরে আবার মহাযানের অনুশীলন করে…… ।'

দোঁহা-রচয়িতারা ছিলেন গুরুবাদী এবং মিষ্টিক। এঁদের শাস্ত্রটাস্ত্র নেই, যা কিছু জ্ঞাতব্য তা গুরুমুখে, এবং যা কিছু বোদ্ধব্য সত্য তা নিজের নির্মলচিত্তে প্রতিফলিত। কোন রকম সাধন-ভজনে অথবা ধ্যান-ধারণায় এঁদের আস্থা ছিল না। এঁরা ছিলেন একাধারে মহাযানমতের শূন্যবাদী এবং ব্রাহ্মণ্যমতের ব্রহ্মবাদী। সেই শূন্যাবস্থা বা ব্রহ্মপ্রাপ্তিকে তাঁরা নির্দেশ দিয়েছেন 'সহজাবস্থা' বলে।

ঝাণেঁ মোক্‌খ কি চাহু রে আলেঁ
মাআজাল কিঁ লেহু রে কোলে।

[১] ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে হাতি-ঘোড়া সাজানো হ'ত।

বরগুরু-বঅণেঁ পড়িজ্জহু সাচেঁ
সরহ ভণই মই কহিঅউ বাচেঁ ॥

'কেন বৃথা ধ্যানের দ্বারা মোক্ষ খুঁজছ? কেন মায়াজাল টেনে জড়াচ্ছ? পূজনীয় গুরুর বচন সত্য ব'লে নাও। সরহ বলে, (এই) আমি ব'লে দিলুম ॥'

সরহ অনেক দোহা লিখেছিলেন। যা পাওয়া গেছে তার সংখ্যা প্রায় দেড়শ। দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়ায় (১১০১ খ্রীষ্টাব্দে) পণ্ডিত দিবাকর-চন্দ্র সরহের দোহা সঙ্কলন করেছিলেন। কিন্তু তখনই অনেক দোহা লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল।[১] সুতরাং সরহের জীবৎকাল একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের এদিকে নয়।

তিল্লো সরহের পূর্ববর্তী ব'লে মনে হয়। এঁর কয়েকটি দোহা সরহের দোহাকোষেও পাওয়া যায়। এঁর পরিচয় কিছু পাওয়া যায় নি। তিল্লোর দোহাকোষের টীকাকার তাঁকে "মহাযোগীশ্বর তিল্লোপাদ" বলেছেন। তিল্লো যে সৌগত পন্থা ধ'রে সহজভাবনায় পৌঁছেছিলেন তা এই দোহা থেকে বোঝা যায়,

পর অপ্পাণ ণ ভন্তি করু সঅল নিরন্তর বুদ্ধ।
তিহুঅণ ণিম্মল পরমপউ চিত্ত সহাবেঁ সুদ্ধ ॥

'পর ও আপন—এ ভ্রান্তি ক'রো না, সবাই সর্বদা বুদ্ধ। চিত্ত স্বভাবে শুদ্ধ হ'লে ত্রিভুবন (হয) নির্মল পরমপদ।'

কাহ্ন সরহের পরবর্তী। সম্ভবত ইনি দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বর্তমান ছিলেন। কাহ্নের দোহা তিল্লো ও সরহের দোহার মতো সর্বত্র সরল নয়, এবং জ্ঞানগর্ভ। তান্ত্রিক ভাবের প্রকাশ স্পষ্ট। যেমন,

এক্কু ণ কিজ্জই মন্ত ণ তন্ত
ণিঅ ঘরিণি লই কেলি করন্ত।

১ "সমত্তো জহালদ্ধো দোহাকোসো এসো সংগহিও পরমত্থকামেন পণ্ডিঅ-সিরি দিবাকর-চন্দেণেতি।" (প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সম্পাদিত দোহাকোষ।)

ণিঅ ঘরে ঘরিণি জাব ণ মজ্জই
তাব কি পঞ্চবণ্ণ বিহরিজ্জই।

এসো জপ-হোমে মণ্ডল-কম্মে
অণুদিণ অচ্ছসি কাহিউ ধম্মে।
তো বিণু তরুণি নিরন্তর ণেহেঁ
বোহি কি লব্ভই এণবি দেহেঁ॥

'একটিও করে না, না তন্ত্র না মন্ত্র। নিজের গৃহিণী নিয়ে ক্রীড়া করে। নিজের ঘরে গৃহিণী যতক্ষণ না মজে ততক্ষণ কি পঞ্চবর্ণে বিহার করা যায়?

'এই জপ হোম ও মণ্ডল কর্মে, ধর্মে, দিনের পর দিন কেন (ব্যাপৃত) রয়েছ? ওগো তরুণি, তোমার নিরন্তর প্রেম বিনা কি এই দেহে বোধি লাভ করা যায়?'

১৭

প্রত্ন-বাংলা কবিতা

দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে গানের একটি সাহিত্যিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই আদর্শ প্রতিফলিত দেখা যায় জয়দেবের গীতগোবিন্দের (সংস্কৃতে লেখা) গানগুলিতে। কোন কোন বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও যোগ-পন্থী অধ্যাত্মসাধক—এঁদের মধ্যে অনেকে অবহট্‌ঠে দোহাও লিখেছিলেন, তখনকার দিনের মুখের ভাষায় অর্থাৎ প্রত্ন-বাংলায় (বা "প্রাচীন" বাংলায়) কিছু গানও লিখেছিলেন। এই গানগুলির কাঠামো ঠিক গীতগোবিন্দের গানের মতোই। ছত্রসংখ্যা আট থেকে চোদ্দ, গানের শেষে (অনেক সময় মাঝেও) কবির নাম গাঁথা, গানের শীর্ষে রাগিনীর উল্লেখ। গীতগোবিন্দ ও প্রত্ন-বাংলা গানগুলির রাগিনী নামে বেশ মিল আছে। অবহট্‌ঠে লেখা গান অল্পই পাওয়া গেছে। সেগুলির বিশেষত্ব হ'ল যে তাতে কোন ভনিতা অর্থাৎ কবি-নাম নেই। আসলে এগুলি সাধনার বা তান্ত্রিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হ'ত তাই ভনিতা-হীন, নৈর্ব্যক্তিক রূপ। এগুলির রচনাও দোহাকোষ এবং প্রত্ন-বাংলা গানগুলির সমসাময়িক। গীতগোবিন্দের গান সর্বপরিচিত, সুতরাং উদাহরণ উদ্ধার নিষ্প্রয়োজন। অবহট্‌ঠ গানের একটি উদাহরণ দিই। গানটি প্রেমের। গানটিতে রাগিনীর উল্লেখ নেই।

উট্‌ঠ ভড়ারো করুণমণ্‌ পুক্‌খসি মহু পরিণাউ
মহাসুহ-জোএ কাম'মহু ছাড়হি সুণ্ণ-সহাউ।
তোম্‌হা বিহুণে মরমি হউঁ উট্‌ঠহিঁ তুহুঁ হেবজ্জ
ছাড়হি সুণ্ণ-সহাবতা সবরিঅ সিজ্‌ঝউ কজ্জ।
লোঅ ণিমন্তিঅ সুরঅ-পহু সুণ্ণ আছসি কীস
হউ চণ্ডালী বিণ্ণ ণমি তই বিণু উহমি ণ দীস।

ইন্দীআলী তুট্ট তুহুঁ   হউঁ জাণমি তুহুঁ চিত্ত
অম্হে ডোম্বী ছেঅ-মণু   মা কর করুণ বিছিত্ত ॥[১]

'ওঠ, প্রভু, করুণহৃদয়, আমার দুর্দশা দেখ। মহাসুখ যোগে আমাকে কামনা কর। শূন্যস্বভাব ছাড়।'

'তোমা বিহনে আমি মরি। হেবজ্র (অথবা, হে বজ্র), ওঠ তুমি। শূন্য স্বভাব ছাড়। শবরীর (অথবা, সকলের) কার্য সিদ্ধ হোক।'

'হে সুরত-প্রভু, লোক নিমন্ত্রণ ক'রে কেন তুমি শূন্য (অর্থাৎ, সুষুপ্ত) রয়েছ ? আমি চণ্ডাল-নারী, বিজ্ঞ নই। তোমা বিনা দিশা পাই না। ইন্দ্রজাল তোড় তুমি। আমি জানি তোমার চিত্ত। আমরা ডোম্বী, খিন্নমন। করুণা বিক্ষিপ্ত করো না ॥'

বৌদ্ধ-তান্ত্রিক আচারে ব্যবহৃত এই রকম অবহট্‌ঠ গান "বজ্রগীতি" নামে উল্লিখিত। আর প্রত্ন-বাংলায় লেখা গানগুলির নাম "চর্যাগীতি"। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত 'মানসোল্লাস' গ্রন্থের উল্লেখ অনুসারে বলা যায় যে সে সময়ে চার ছত্রের আধ্যাত্মিক ভাবের গান 'চর্যা' নামে বাংলার বাইরেও প্রচলিত ছিল।

প্রত্ন-বাংলায় লেখা চর্যাগানগুলি একটি প্রাচীন সংকলনে পাওয়া গেছে। এই সঙ্কলন-পুথিটি আবিষ্কার করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।[২] এই আবিষ্কারের ফলে বাংলা ভাষার জন্মরহস্য অনেকখানি উদ্ঘাটিত হয়েছে।

চর্যাগীতি-রচয়িতাদের মধ্যে দোহা-রচয়িতা সরহ এবং কাহ্নও আছেন। কাহ্ন নামে একাধিক ব্যক্তি চর্যা লিখেছিলেন। চর্যাগীতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র[৩] দ্রষ্টব্য। এখানে প্রাচীনতম চর্যাকার লুই-পাদের রচনার পরিচয় দিই। গানটির রাগিনী পটমঞ্জরী।

[১] হেবজ্রতন্ত্র থেকে প্রবোধচন্দ্র বাগচী কর্তৃক উদ্ধৃত।
[২] চর্যাগীতি-পদাবলী, শ্রীসুকুমার সেন, তৃ-স ১৯৭৩, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
[৩] চর্যাগীতি-পদাবলী, ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ দ্রষ্টব্য।

ভাব ন হোই অভাব ন জাই
আইস সংবোহে কো পতিআই। ধ্রু।
লুই ভণই বট তুলকৃখ বিণাণা
তিঅ-ধাএ বিলসই উহ [ণ ঠানা]॥ ধ্রু।
জাহের বাণচিহ্ন রূব ণ জাণী
সো কইসে আগম-বেএ বখাণী। ধ্রু।
কাহেরে কিষ ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা
উদক-চান্দ জিম সাচ ণ মিচ্ছা। ধ্রু।
লুই ভণই [মই] ভাইব কীষ
জা লই অচ্ছম তাহের উহ ণ দিস ॥

'উৎপত্তি হয় না, বিনাশও ঘটে না,—এমন বোঝানোয় কে প্রত্যয় করবে? লুই বলছে, ওরে বোকা, চরম জ্ঞান দুর্লক্ষ্য, সে বিলাস করে ত্রি-ধাতুতে, (তার স্থান না) যায় দেখা।

'যার বর্ণ চিহ্ন রূপ জানা নেই, সে কিসে আগমে বেদে ব্যাখ্যাত হয়? কিসের জন্যে (অথবা, কাকে) কিরকম ব'লে আমি সিদ্ধান্ত দেব (সে বিষয়ে যা) জলে চন্দ্রবিম্বের মতো সত্য নয় মিথ্যাও নয়। লুই বলে, (আমি) কিসে ভাবব? যার জন্যে আছি তার উদ্দেশও যে ঠাওর হয় না॥'

খুব প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে অধ্যাত্মতত্ত্ব-কথায় হেঁয়ালীর ব্যবহার চ'লে এসেছিল। চর্যাগানেও হেঁয়ালীর অসদ্‌ভাব নেই। যেমন,

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই।

'কচ্ছপী দুয়ে (সে দুধ) পাত্রে কুলচ্ছে না। গাছের তেঁতুল কুমীরে খাচ্ছে।'

জেতই বোলো তেতবি টাল
গুরু বোধ সে সীস কাল।

'যতই বলা হয় ততই ভুল করা হয়। গুরু বোবা, শিষ্য সে কালা।'

চর্যাগীতিগুলিতে সেকালের অত্যন্ত সাধারণ লোকের সাংসারিক জীবনযাত্রার কিছু টুকরো চিত্র গাঁথা আছে। সেকালের বাঙালী-জীবনের ইতিহাসের পক্ষে এমন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য আর নেই। পরে সে বিষয়ে আলোচনা করছি॥

১৮

লিপি

বঙ্গভূমির লিপিবিবর্তন এখানের প্রত্নলিপি—শিলালেখ ও তাম্রপট্ট—কালানুক্রমে নিরীক্ষণ করলে বোঝা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মহাস্থান শিলাচক্রলিপি সব চেয়ে প্রাচীন। এ লিপির ছাঁদ অশোকের অনুশাসনের লিপির সঙ্গে অভিন্ন। তার অনেক কাল পরে পাই খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দে শুশুনিয়া গুহালিপি। এর অক্ষরের ছাঁদ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তির লিপির অনুরূপ। অশোকের সময় থেকে আগত ব্রাহ্মী লিপির এই দাঁড়িয়েছিল পূর্বভারতীয় ছাঁদ। এই ছাঁদকেই মহাবস্তুতে বঙ্গ-লিপি বলা হয়েছে।[১] বাংলা অক্ষরের বৈশিষ্ট্য ভালো ক'রে ফুটে উঠেছে বিজয়সেনের প্রদ্যুম্নেশ্বর (দেওপাড়া) প্রশস্তি-লিপিতে। বাংলা লিপির প্রাচীনতম পূর্ণবিকশিত রূপ পাই বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে রক্ষিত বিশ্বরূপসেনের তাম্রপট্টে। বাংলা সংখ্যালিপি ও ভগ্নাংশ লেখার রীতির উদাহরণও এই তাম্রপট্টে মেলে॥

[১] এই নামকরণ থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে মহাবস্তু রচনাকালে পূর্বভারতে বঙ্গই মুখ্য দেশ ব'লে গণ্য ছিল।

হস্তশিল্প

সেকালে আমাদের দেশে শিল্প ছিল এখনকার দিনের সংবাদপত্রের ভাষায় যাকে বলে "প্রয়োজন ভিত্তিক"। গৃহনির্মাণে, ব্যবহার্য বিবিধ বস্তুর—যেমন বসন বাসন-কোসন ইত্যাদির—অলঙ্করণে, এবং দেহ সৌন্দর্যের প্রসাধনে শিল্পের প্রধান প্রকাশ প্রথমে ঘটেছিল। তার পর ধর্ম-কর্মে শিল্পের প্রকাশ দেখা দিয়েছিল,—বিশেষ ভাবে উপাস্য দেবতার প্রস্তর অথবা ধাতু কিংবা দারু মূর্তি গঠনে। পরবর্তী কালে পটে চিত্র-অঙ্কন এবং মৃত্তিকায় দেবতামূর্তি নির্মাণ বেশি প্রচলিত হয়েছিল। বঙ্গ-ভূমিতে আবাসগৃহ নির্মাণে কোন বৈচিত্র্যের অবকাশ ছিল না। মাটির দেওয়াল কাঠের বা বাঁশের খুটি, খড়ের চাল—এই দিয়ে সাধারণ লোকের আবাস। ইট-পাথরের দেবগৃহ বিহার-মঠ ইত্যাদি নির্মিত হ'ত, তবে তা সংখ্যায় কম ছিল। তবে স্থাপত্যের নিদর্শন এইগুলিতেই প্রকৃষ্ট ভাবে লভ্য। দুঃখের বিষয় প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন বিশেষ কিছু অনবলুপ্ত নেই। আমাদের দেশের স্থাপত্যশিল্পের ও মূর্তিশিল্পের আলোচনা পণ্ডিতেরা গভীরভাবে করেছেন। সুতরাং সে বিষয়ে আমি কিছু বলছি না। বস্ত্র ও অলঙ্কার শিল্পের সম্বন্ধেও কিছু বলছি না, তবে কৌতূহলী পাঠক 'নিদর্শনে' অধ্যায়ে প্রদত্ত চিত্রাবলী দেখে বুঝে নেবেন।

জীবিকার বাহিরেও চিত্র-অঙ্কণ শিল্প পূজা-কার্যে অথবা পুস্তক-অলঙ্করণে বিশেষ ভাবে অনুশীলিত হ'ত বজ্রাসন নালন্দা বিক্রমশীল পাণ্ডুভূমি প্রভৃতি মহাবিহারগুলিতে। এখানে ধাতুশিল্পের ও সোনার জলের কাজও হ'ত। মহাবিহার ও অপর বিদ্যাস্থানগুলিতে হস্ত-লিপিরও শিল্পবিদ্যারূপে চর্চা ছিল।

প্রয়োজনের বাইরে, বিশুদ্ধ আর্টের—অর্থাৎ শুধু কৌতূহল মেটাবার উদ্দেশ্যে তক্ষণ-শিল্পের এবং দগ্ধমৃত্তিকা-শিল্পের ব্যবহার ছিল। মন্দির-ভিত্তির অলঙ্করণে তার ভালো উদাহরণ মিলে॥

সমাজে সংসারে

১

নগর ও রাজধানী

গ্রাম ও নগর দুটি পৃথক্ শব্দ, সংজ্ঞাও পৃথক্। কিন্তু প্রাচীন কালে এদেশে গ্রাম ও নগরের মধ্যে কোন মৌলিক ভিন্নতা ছিল না। প্রাকার অথবা পরিখা (পরবর্তী কালে 'গড়') থাকলেই নগর ; নতুবা গ্রাম। রাজধানী এবং দেবধানী (অর্থাৎ যেখানে দেঁউল থাকত), তাও নগর।[১] মুসলমান অধিকারের আগে কোন কোন প্রত্নলিপিতে বা তাম্রপট্টে 'নগর' ও 'নগরী' নাম দু-একবার পাওয়া যায়। মহাস্থান শিলাচক্রলিপিতে 'পুডনগল' (পুণ্ড্রনগর) ও মদনপালের শাসনপট্টে 'শ্রীরামাবতী নগর' আর বৈগ্রাম শাসনপট্টে 'পঞ্চনগরী' ("পঞ্চনগর্যা ভট্টারকপাদানুধ্যাতঃ") আছে। এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে পুণ্ড্রনগর পরে পৌণ্ড্রবর্ধন হয়েছিল। স্থাননামে "বর্ধন" খুবই অদ্ভূত ঠেকে। মনে হয় কোন কারণে পুণ্ড্রনগর বিনষ্ট হওয়ায় ভুক্তির নাম পুণ্ড্রবর্ধন (=যেখানে খুব আখ হয়) থেকে নামটি গড়া হয়েছিল। পঞ্চনগরী বোধ হয় পৌণ্ড্রবর্ধনের বর্ধিত পরিণতি। 'নগর' নাম অপসৃত হ'লেও পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয়ের অধিকরণে 'নগর-শ্রেষ্ঠী' উল্লিখিত আছে।

নগরের তুলনায় 'পুর' ও 'পুরী' প্রাচীন শব্দ, তবে সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দ, লৌকিক ব্যবহারে পাই না। তবে বহু গ্রামনামে এই শব্দ যুক্ত দেখা যায়। গুপ্তদের আমলে যথার্থ নগর বলতে একটি স্থানই ছিল, পাটলীপুত্র। পাটলীপুত্রের তখন চলতি নাম ছিল বোধ হয় 'নগর'। (হয়ত এই নগর থেকেই নাগরী লিপি নামের উদ্ভব।) সরকারি

---

[১] ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম তাঁর সাকিম ও মোকাম দু স্থানকেই 'নগর' বলেছেন। দামিন্যা "নগর" কেন না সেখানে চক্রাদিত্য দেবতার অধিষ্ঠান। আরড়া ও "নগর" কেন না ব্রাহ্মণভূমির রাজার নিবাসস্থান।

দলিলে, অর্থাৎ শাসনপট্টে, পাটলীপুত্র অনেক সময়—বিশেষ ক'রে শেষের দিকে—"শ্রীনগর" নামেই উল্লিখিত।

সেকালে রাজাদের মূল বাসস্থান নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু রাজধানী ব'লে সে সব স্থানের উল্লেখ বড় হ'ত না। রাজা যেখানে থেকে ভূমিদান আজ্ঞা দিতেন সে স্থান শাসনপট্টে প্রায়ই "জয়স্কন্ধাবার" (অর্থাৎ বিজয়ী সেনার ছাউনি) ব'লে উল্লিখিত। সুতরাং সেগুলিকে ক্যাম্প রাজধানী বলা যেতে পারে। জয়স্কন্ধাবারে বা অন্য সাময়িক রাজধানীতে—"বাসক"এ—রাজপ্রাসাদকে 'উপকারিকা' (পরবর্তী কালের 'উয়ারি', অর্থাৎ বহির্বাটী) বলা হ'ত।

এখন উৎকীর্ণ লিপি অনুসারে এদেশের সম্ভাব্য রাজধানীগুলির আলোচনা করি। তালিকা কালানুক্রমিক।

পুডনগল (=পুণ্ড্রনগর): খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী। পৌণ্ড্রবর্ধন দ্রষ্টব্য।

পুষ্করণ (অথবা পুষ্করণা): খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী। এটি রাজধানী অথবা কোন গ্রাম ব'লে মনে হয় না। "পুষ্করণাধিপতেঃ"—এখানে শব্দটি দেশনাম ব'লে নিতে হবে। কোন শাসনপট্টে দেশনাম ছাড়া 'অধিপতি' শব্দের ব্যবহার দেখা যায় নি।

পৌণ্ড্রবর্ধন: খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে। সাধারণত ভুক্তি-নামেই দেখা যায়, এক বার স্থাননামে পাওয়া গেছে ("পুণ্ড্রবর্ধনাৎ")।

বর্ধমান: খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে। ভুক্তিনামেই পাওয়া যায়, স্থাননামে নয়। এ নামে স্থান থাকা খুবই সম্ভব। এখনকার বর্ধমান সহরের টানা ঐতিহ্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তোলা যায়। তার আগে বর্ধমান নগর বা গ্রামের অস্তিত্ব থাকলে তার চিহ্ন আধুনিক বর্ধমানের আশে পাশের, বিশেষ ক'রে দামোদরের ধার ধ'রে পশ্চিম-দিকের, মাটির তলায় গুপ্ত থাকা সম্ভব। আবার দুএকটি পুরানো গ্রামের নামেও তৎসম 'বর্ধমান' শব্দের তদ্ভব রূপ অনুভূত হয়। যেমন সদর মহকুমায় সাতগেছের কাছে বড়োয়া। গ্রামটি

দামোদরের এক প্রাচীন শাখার তীরে অবস্থিত। প্রাচীন বর্ধমান যে প্রাচীন দামোদর-খাতের তীরবর্তী ছিল তাতে বিশেষ সন্দেহ নেই।

পঞ্চনগরী ঃ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী। উপরে নগরের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ক্রীপুর ঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভ। স্থানটি নিশ্চয়ই বড় কোন নদীর ধারে ছিল, যেহেতু বলা হয়েছে "মহানৌহস্ত্যশ্বজয়স্কন্ধাবারাৎ"। নামটি অদ্ভুত, তবে কোন ঐতিহাসিক কৌতূহলী হ'য়ে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন নি। আমি একটু চেষ্টা করছি। প্রথমেই মনে হয়, গোড়াকার যুক্ত অক্ষরটিতে খোদাইকর ভুল করেছেন, 'ত্রি' বা 'ত্রী' লিখতে 'ক্রী' লিখেছেন। তা যদি না হয় তবে নামটি সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উল্লিখিত 'কর্তৃপুর' নামের স্থানীয় রূপ, অথবা 'কর্তৃপুর'ই 'ক্রীপুর'এর প্রসাধিত রূপ। 'ত্রীপুর' (বা 'ত্রিপুর') যদি ভুল ক'রে 'ক্রীপুর' হ'য়ে না থাকে তবে উদ্ভট অনুমান করা যেতে পারে যে উভয় শব্দই 'কর্তৃপুর' (=কর্‌ত্রিপুর) থেকে আগত ঃ (১) 'র্‌ত্' বাদ গেলে হয় 'ক্রীপুর', (২) 'কর্‌' বাদ গেলে হয় 'ত্রিপুর'।

কর্ণসুবর্ণ, কর্ণসুবর্ণক ঃ ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী। "কর্ণসুবর্ণাবস্থিতস্য" মহারাজাধিরাজ জয়নাগের[১] তাম্রশাসনপট্ট; ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রপট্ট ("কর্ণসুবর্ণবাসকাৎ", অর্থাৎ কর্ণসুবর্ণ বাসা থেকে)।

পাটলীপুত্র ঃ অষ্টম-নবম শতাব্দী। ধর্মপালের রাজধানী ?

মুদ্‌গগিরি (=মুঙ্গের) ঃ নবম-দশম শতাব্দী। ধর্মপালের পর পালরাজাদের রাজধানী ?

বিলাসপুর ঃ দশম-একাদশ শতাব্দী। মহীপালের বাণগড় তাম্রশাসন।

রোহিতগিরি (=আধুনিক লালমাই, কুমিল্লার কাছে ময়নামতী পাহাড়) ঃ একাদশ শতাব্দী। চন্দ্র-রাজাদের কুলস্থান।

[১] এঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গেছে।

বিক্রমপুর: একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী। চন্দ্র বর্ম ও সেন-রাজাদের রাজধানী।

ঢেক্করী: আনুমানিক একাদশ শতাব্দী। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর-ঘোষের রামগঞ্জ তাম্রশাসন। স্থানটি সমতটের অন্তর্গত ছিল ব'লে অনুমান হয়।

সিংহপুর। একাদশ শতাব্দী। বর্ম-রাজাদের কুলস্থান।

প্রিয়ঙ্গু: দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। নয়পালের ইর্দা তাম্র-শাসন। স্থানটি বর্ধমানভুক্তির (অথবা বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত দণ্ডভুক্তি মণ্ডলের) অন্তর্গত ছিল। মল্লভূমির অন্তর্গত আধুনিক পেনো গ্রাম-নামটি প্রাচীন প্রিয়ঙ্গুর স্মৃতিবহ হ'তে পারে।

রামাবতী: দ্বাদশ শতাব্দী। রামপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মদন-পালের তাম্রশাসন।

লক্ষ্মণাবতী: দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী। লক্ষ্মণসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নূতন সহর অথবা লক্ষ্মণসেনের নামে অভিহিত—রামাবতীর প্রতিস্পর্দ্ধায়—পুরাতন গৌড় সহরের (অথবা রামাবতীর) নূতন নাম হ'তে পারে। কোন তাম্রশাসনে এ নাম পাওয়া যায়নি। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ছাড়া বাংলা দেশের বাইরে মিথিলায় ও অন্যান্য প্রদেশের প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত আছে।

ধার্যগ্রাম: দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর ও শক্তিপুর তাম্রশাসন। এই স্থান এখন নবদ্বীপের নিকটবর্তী ধাইগাঁ।

দ্বারহটা(ক): ১১১৮ শকাব্দ (=১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দ)। ডোম্মন-পালের রাক্ষসখালি তাম্রশাসন। "পূর্বখাটিকান্তঃপাতি" এই স্থান এখন দ্বারহাটা (হরিপালের কিছু দক্ষিণে)? সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে দ্বারহাটা সুতি বস্ত্র উৎপাদন ও চালানের বড় কেন্দ্র ছিল।

ফল্গুগ্রাম: ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। কেশবসেন ও বিশ্বরূপ-সেনের তাম্রশাসন। এই স্থান সম্ভবত আধুনিক ফরিদপুর জেলার মধ্যে অবস্থিত ছিল॥

২

শাসন-পদ্ধতি

এদেশের তাম্রপট্টে (পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী) কতকগুলি স্থানকে 'বীথী' বলা হয়েছে এবং এই বীথীগুলি কয়েকটি গ্রামের শাসনকার্যের অধিষ্ঠান ব'লে নির্দিষ্ট হয়েছে। সেকালে দেশের শাসনব্যবস্থা ভুক্তি—মণ্ডল—বিষয় (অথবা, বিষয়—মণ্ডল)—বীথী (অনেক পরে, চতুরক) এই-ভাবে পর পর চার থরে পরিচালিত হ'ত, একথা আগে বলা হয়েছে। বীথী বলতে কী বোঝাত তা জানলে সেকালের বাংলা দেশের (তথা পূর্ব-ভারতের) আর্থিক অবস্থার সম্বন্ধে খানিকটা স্পষ্ট ধারণা হবে। তাম্রশাসনপট্ট থেকে বীথীর স্বরূপ জানা যায় না। শব্দটির অর্থ অনুসরণ করলেই তা বোঝা যায়। বীথীর আসল অর্থ হল সারি, তার থেকে পথের দুধারে সারি সারি গাছ বা ঘর অথবা দোকানঘর। আমাদের প্রয়োজনে শেষোক্ত অর্থই খাটে। গ্রামে গ্রামে যে সব দ্রব্য উৎপন্ন হ'ত তার বিক্রয়ের জন্য যে স্থানে সারি সারি দোকানঘর (এবং তৎসংলগ্ন অন্য ঘরবাড়িও) থাকত তাইই ছিল 'বীথী'। সুতরাং বীথী হল একগুচ্ছ গ্রামের সহরবাজার বা গঞ্জ। (এই ভাবে বীথী সেকালের সহরের অভাব খানিকটা মেটাত।) কোন গ্রামের পরিচয় দিতে গেলে দলিল পত্রে অমুক বীথীর অন্তর্গত ("বৈথেয়" অথবা "বীথীপ্রতিবদ্ধ") লিখতে হ'ত। পরবর্তী কালে বাণিজ্য-লুপ্তির ফলে বীথী নামটি অপ্রচলিত হ'য়ে গেলে পর শুধু "প্রতিবদ্ধ" লেখা হ'ত।

ভুক্তি, বিষয় (মণ্ডল), এবং বীথী (—অবশ্য বীথীর বিশেষ গৌরব থাকলে) প্রভৃতির স্থানীয় শাসন ও বিচার ব্যবস্থায় ("অধিষ্ঠান-অধিকরণ") একই নিয়ম ছিল।[১] ভুক্তির প্রধান ছিলেন 'উপরিক', ইনি হতেন 'আয়ুক্তক', অর্থাৎ মহারাজাধিরাজের নিযুক্ত সর্বোচ্চ

---

[১] কোন কোন গ্রামেও "অধিকরণ" ছিল। গ্রামের প্রধান বংশগুলির শীর্ষ-স্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে এই "গ্রামাষ্টকুলাধিকরণ" হ'ত। এই গ্রামাষ্টকুলাধি-করণের উল্লেখ ধানাইদহ তাম্রপট্টে আছে।

কর্মচারী। বিষয়ের (বা মণ্ডলের) প্রধান ছিলেন উপরিকের নিযুক্ত (?) কর্মচারী—'নিযুক্তক'। বীথীরও প্রধান ছিলেন এই 'নিযুক্তক'। এই অধিষ্ঠান-অধিকরণের সভ্য ছিলেন প্রধানত এই চারজন,—'নগরশ্রেষ্ঠী' (দেশের মুখ্য ব্যাঙ্কার বা মহাজন), 'প্রথম সার্থবাহ' (প্রধান রপ্তানি আমদানি-কারক), 'প্রথম কুলিক' (প্রধান অধিবাসী বা শিল্প-উৎপাদক) এবং "প্রথম কায়স্থ' (লেখক ও হিসাব-কারক গোষ্ঠীর মুখ্য ব্যক্তি)। এঁদের কাজে সহায়তা করতেন এক (বা একাধিক) 'পুস্তপাল' (অর্থাৎ মহাফেজখানার অধিকারী)। ইনি সরকারী কর্মচারী।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার হচ্ছে যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এতে স্থান ছিল না। এদেশে ব্রাহ্মণ সেকালে নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সাধারণ সমাজে ব্রাহ্মণ ব'লে গুরুত্বভোগী জাত ছিল ব'লে মনে হয় না। শ্রেষ্ঠী সার্থবাহ অথবা কুলিকদের মধ্যে কেউই যে ব্রাহ্মণ ছিলেন না এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না। কেননা তখন ব্রাহ্মণেরও দাস ঘোষ মিত্র দত্ত পাল ইত্যাদি পদবী ছিল। সুতরাং নাম দেখে ধৃতিমিত্র অব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণ তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। স্মৃতিশাস্ত্রের বোঝা তখন এদেশি ব্রাহ্মণের ঘাড়ে চাপে নি সুতরাং ব্রাহ্মণেরা সে মোট জনসমাজের মাথায় চাপিয়ে দিতে পারে নি। সে কাজ হয়েছিল পরে।

এদেশে গুপ্ত-শাসনপদ্ধতি ক্রমে শিথিল হ'য়ে আসতে থাকে। সে শৈথিল্যের একটা বড় ফল হ'ল শাসন ও বিচার ব্যবস্থায় পূর্বতন পঞ্চায়তী রীতির ধীরে ধীরে লোপ এবং তার স্থানে রাজশক্তির প্রকাশ। গুপ্ত-শাসনের আগে বাংলা দেশে রাজা বলতে যা বুঝি তেমন কিছু ছিল ব'লে মনে হয় না। দলপতি ছিল, দেশ-অধিকারীও ছিল, কিন্তু তারা সর্বেসর্বা ছিল না। এখন স্বাধীন ও স্বাধীনকল্প ভুক্তিপতি বিষয়পতি অথবা মণ্ডলপতিরা সুযোগ মতো মহারাজ উপাধি ধারণ ক'রে নামে মাত্র মহারাজাধিরাজের অধীনতা স্বীকার করতে লাগলেন। এই ব্যাপারে হয়ত তাঁরা প্ররোচনা পেয়েছিলেন নবাগত ব্রাহ্মণদের কাছে।

গুপ্ত-শাসনের সময় থেকে এদেশে প্রথমে ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিমা ("মধ্যদেশ-বিনির্গত") বেদপাঠী ব্রাহ্মণদের আগমন ও উপনিবেশ শুরু হয়। এঁরা অবিলম্বে জনসমাজে প্রভাব বিস্তার করতে লাগলেন এবং পরে শাসক-সমাজের উপদেষ্টা ও মন্ত্রণাদাতা হ'য়ে উঠলেন। সমাজে এঁরা রইলেন প্রধানত কৃষিজীবী হ'য়ে এবং সেই "কুটুম্বী" (অর্থাৎ বড় গৃহস্থ) ভাবে সম্পদ অর্জন করতে থাকলেন। অন্য বৃত্তিও যে তাঁদের সন্তানেরা অবলম্বন করেন নি তা নয় তবে তাঁদের প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল বেদ-বিদ্যাশ্রিত ব্রাহ্মণ্য মর্যাদা। মহারাজ-উপাধিক উপরিকদের অধীনে অধিষ্ঠান-অধিকরণের গৌরব অনেকটা খর্ব হ'ল ষষ্ঠ শতাব্দীতে। গুপ্ত-শাসনের শৈথিল্যেই যে শাসন-বিচার ব্যবস্থায় অধিষ্ঠানাধিকরণের ক্ষমতা হ্রাস হবার কারণ তা পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীগুলির তাম্রপট্ট থেকেই অনুমান করা যায়। কুমারগুপ্তের শাসনকালে প্রদত্ত চারখানি তাম্রপট্টে (৪৩২-৪৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) উপরিক মহারাজ নন এবং অধিষ্ঠানাধিকরণিকের নাম উল্লিখিত। বুধগুপ্তের অধিকারকালে প্রদত্ত দুখানি তাম্রপট্টে উপরিক "মহারাজ" উপাধিতে ব্যক্ত এবং "অধিষ্ঠানাধিকরণ" নামমাত্র উল্লিখিত।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যেই যে রাজপুরুষেরা অধিষ্ঠানাধিকরণের ক্ষমতা ও গৌরব আত্মসাৎ করেছিল তা গোপচন্দ্রের ৩৩ রাজ্যাঙ্কে বিজয়সেন প্রদত্ত তাম্রপট্ট থেকে বোঝা যায়। এখানে ভূমিবিক্রয় অনুমোদনের জন্য সম্বোধন করা হচ্ছে অঞ্চলের সমুদয় আধিকারিককে ("পূজ্যান্ বর্তমানোপস্থিতান্ কার্তাকৃতিক-কুমারামাত্য....")। এঁদের মধ্যে আছেন "কার্তাকৃতিক" (অর্থাৎ যিনি কৃতকে অকৃত করতে পারেন, আপিলে দণ্ড মকুব করতে পারেন), কুমারামাত্য, চৌরোদ্ধরণিক, উপরিক, ঔদ্রঙ্গিক (শুল্ক-সংগ্রহকারী), অগ্রহারিক (যিনি রাজদত্ত ভূমি ভোগ করেন), উর্ণাস্থানিক[১] (রেশম হাটের অধ্যক্ষ), ভোগপতিক[২],

[১] 'উর্ণা' এখানে 'পত্রোর্ণা' অর্থাৎ রেশম। ঐতিহাসিকেরা পশম বলে ভুল করেছেন। বঙ্গভূমিতে পশম উৎপাদন এখন যেমন তখনও তেমনি অভাবনীয় ছিল। [২] কোন ব্যক্তির ব্যবহারে প্রদত্ত ভূসম্পত্তির পরিচালক।

বিষয়পতি, তদাযুক্তক (অর্থাৎ বিষয়পতির নিযুক্ত কর্মচারী), হিরণ্য-সামুদায়িক (সোনা-সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী), পত্তলকাবসথিক (নৌবাণিজ্যস্থানে বসতির ব্যবস্থাকারী), দেবদ্রোণীসম্বন্ধ (বিহার দেবকুল ইত্যাদির কৃষিব্যবস্থায় নিযুক্ত কর্মচারী) ইত্যাদি। এঁদের "বিধিবৎ সম্পূজ্য" গ্রামগুলির মহত্তরেরা[১] বীথী-অধিকরণকে জানাচ্ছেন যে যেহেতু পূজ্য বিজয়সেন তাঁদের জানিয়েছেন যে তিনি গ্রামের কিছু জমি কিনে এক সদ্‌ব্রাহ্মণকে দান করতে চান মাতাপিতার ও নিজের পুণ্য ও যশ বৃদ্ধির উদ্দেশে, তাই তাঁরা উল্লিখিত ভূমি ক্রয় অনুমোদন করছেন।

উপরিক "মহারাজ" হ'লে পর "বিশ্বাস" নামে তাঁর খাস কর্মচারী গ্রামাষ্টকুলাধিকরণের সাহায্য করত (বুধগুপ্তের প্রথম দামোদরপুর তাম্রপট্ট দ্রষ্টব্য)। "বিশ্বাস" পদবীর কর্মচারী এদেশে সুলতানি আমলের শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে।

সেকালে গ্রামের অন্তর্গত অথবা সংলগ্ন পতিত (অর্থাৎ অনধিকৃত) ভূমির দান-বিক্রয়ের অধিকারী ছিলেন গ্রামবাসীরা সমবেতভাবে, রাজা বা ভুক্তির উপরিক নয়। গ্রামের ভূমি দান অথবা বিক্রয়ের অনুমোদন তাই গ্রামবাসী মহত্তরদের অনুমতি নিয়ে করতে হ'ত। পরবর্তী কালে (যেমন ধর্মপালের অনুশাসনেও সেই থেকে আরম্ভ ক'রে) এই অনুমোদন দলিল-পত্রের উল্লেখেই পর্যবসিত হয়েছিল।

শেষের দিকের তাম্রশাসনে যে সব পদিক বা রাজকর্মচারীর গালভরা নাম পাওয়া যায় সেগুলির অধিকাংশই গতানুগতিক অনুবৃত্তি ব'লে মনে হয়। তবে কোন কোন পদিক-নাম নিশ্চয়ই বাস্তব পদাধিকারীর ছিল। 'অন্তরঙ্গ' ছিলেন রাজার খাস চিকিৎসক ও রন্ধনশালাধ্যক্ষ। রাজার বাইরের শক্তির (বহিরঙ্গ) অধ্যক্ষ যেমন সৈন্যসামন্ত, অন্তরের অর্থাৎ দেহের শক্তির (অঙ্গ) তেমনি 'অন্তরঙ্গ' (ঈশ্বর ঘোষের তাম্র-

[১] মহত্তর মানে গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তি।

শাসনে 'অভ্যন্তরিক' ?)। 'খোল' ছিল ছদ্মবেশী চর। 'গমাগমিক' ডাকবাহনের কর্তা। 'হট্টপতি' (ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন) হাটসমূহের তত্ত্বাবধায়ক। ('হট্ট' ছিল কৃষিজাত খাদ্যশস্য প্রভৃতির বিক্রয়-স্থান, ফলফুলুরির বাগানের কাছে অবস্থিত।) 'বৃদ্ধধানুষ্ক' ছিল তীরন্দাজদের প্রধান। 'একসরক' মানে, অনুমান করি, একাকী ভারপ্রাপ্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী (ইংরেজিতে Lone commando)।

গ্রামের (বা কোন ছোট জনপদের) অধিবাসীদের দুরকম শ্রেণীর উল্লেখ আছে তাম্রপট্টে। এক 'কুলিক', আর এক 'কুটুম্বী'। যে বংশ বহুকালের বাসিন্দা সে বংশ (বা গোষ্ঠী) "কুল", সে বংশের (বা গোষ্ঠীর) ব্যক্তি 'কুলিক', সাধারণত বস্ত্র-উৎপাদনকারী। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়-কুটুম্ব ইত্যাদি নিয়ে বৃহৎ সংসারের কর্তা সে 'কুটুম্বী'। গ্রাম-কুটুম্বীদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা অগ্রগণ্য ছিলেন। বংশ অথবা কুটুম্বিত্ব নির্বিশেষে গ্রামের মুখ্যব্যক্তিরা 'মহত্তর' ব'লে নির্দিষ্ট হতেন।

ভূমিবিক্রয় বা ভূমিদান পত্র উদ্দেশ করা হ'ত রাজার উত্তরাধিকারী অমাত্য ও মুখ্য কর্মচারিবর্গ (স্থানীয় কর্মচারিবর্গ) এবং অঞ্চলের ও গ্রামের মুখ্য ব্যক্তিবর্গকে। এঁদের সকলকে জানিয়ে দেওয়া হ'ত যে উল্লিখিত ভূমির হস্তান্তর এঁরা যেন বৈধ ব'লে স্বীকার ক'রে নেন। ব্রাহ্মণেরা চাষী না হ'লে গোড়ার দিকে উল্লিখিত হতেন না। ধর্মপালের তাম্রশাসনে চাষী বামুনের—"ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্"—প্রথম উল্লেখ পাওয়া গেল। লক্ষ্মণসেনের দুটি তাম্রশাসনে দেখি যে ক্ষেত্রকর ব্রাহ্মণের পর ভালো বামুনের—"ব্রাহ্মণোত্তরান্"—উল্লেখ রয়েছে। এই উল্লেখের ধরণ থেকে মনে হচ্ছে যে চাষী বামুনের সামাজিক মর্যাদা তখন যেন কিছু হ্রাস পেয়েছিল। কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে "ক্ষেত্রকরব্রাহ্মণ" নেই, আছে বামুন ও ভালো বামুন ("ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্")॥

৩

শ্রেণীভেদ

তাম্রপট্টগুলিতে ব্রাহ্মণের উল্লেখ ছাড়া জাতিভেদের তেমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। শুধু লোকনাথের তাম্রপট্টে 'করণ' পাওয়া যায়। দৃঢ় জাতিভেদ হয়ত কিছু ছিল তবে তা বৃত্তিগত ছিল, সমাজের মধ্যে উচ্চনীচ স্তর গত ছিল না। বলাবাহুল্য ধনী-দরিদ্র ভেদ চিরকাল ছিল, তখনও ছিল। তার প্রমাণ বুধগুপ্তের প্রথম দামোদরপুর তাম্রপট্টের এই উক্তি—"চণ্ডগ্রামকে ব্রাহ্মণাদ্যান্ অক্ষুদ্রপ্রকৃতিকুটুম্বিনঃ"। "অক্ষুদ্র-প্রকৃতি" হ'ল সম্পন্ন, আর "ক্ষুদ্রপ্রকৃতি কুটুম্ব" (যদিও উল্লিখিত হয় নি) ছিল নির্ধন গৃহস্থ।

এখনকার দিনে বাঙালী হিন্দুর মধ্যে জাতিভেদ বলতে যা বুঝি তা গ'ড়ে উঠেছে মুসলমান অধিকার কালে। তার আগে এর কাঠামো মোটামুটি ভাবে রূপ নিয়েছিল খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে। জাতিভেদের একটা নিয়ম ছিল বৃত্তি অনুসারে, আর একটা নিয়ম ছিল আচরণ অনুসারে। বৃত্তি অনুসারে সামাজিক স্তরভেদ সপ্তম শতাব্দীর আগে শুরু হয়েছিল ব'লে মনে হয় না। দেশের আর্থিক ভর বাণিজ্য ও শিল্প-উৎপাদন থেকে একটু একটু ক'রে স'রে গিয়ে যেমন কৃষিনির্ভর হ'তে থাকে তেমনি ব্রাহ্মণশাসনও সমাজের বিভিন্ন স্তরে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। তার ফলে গ্রামের গৃহস্থেরা সঞ্চয় ও সংস্কৃতি অনুসারে সমাজে নির্দিষ্ট স্থান পেতে থাকে। এই হ'ল জাতিভেদের একটা দিক! তার পর সপ্তম শতাব্দী থেকে জনগণের মধ্যে বৌদ্ধ আচার ও আচরণ ব্রাহ্মণ্য আচার ও আচরণ থেকে পৃথক হ'য়ে পড়তে থাকে। এই সূত্রে জাতিভেদে শুচি-অশুচি লক্ষণ ক্রমশ প্রকট হ'তে থাকে এবং যার ফলে সমাজে উচ্চস্তরের কোন কোন সম্প্রদায়ও অনাচরণীয় গণ্য হ'য়ে যায়। এই হ'ল জাতিভেদের দ্বিতীয় দিক।

ব্রাহ্মণেতর জাতের মধ্যে বোধ করি কায়স্থেরাই সর্বপ্রথম বৃত্তি অনুসারে জাতিগত স্বতন্ত্রতায় চিহ্নিত হয়েছিল। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে নৈয়ায়িক শ্রীধর স্বীয় পোষ্টা পাণ্ডুদাসকে উল্লেখ করেছিলেন "গুণরত্নাভরণ-কায়স্থকুলতিলক" ব'লে। কায়স্থ জাতির স্বীকৃতি এই প্রথম লক্ষ্য করা গেল। কায়স্থেরা গোড়া থেকেই একটি বিশেষ বৃত্তিনিষ্ঠ কমিউনিটি। এঁদের বৃত্তি ছিল দলিলপত্র লেখা ও পড়া এবং হিসাব রাখা। নামটির ব্যুৎপত্তি নিয়ে কিছু কল্পনা জল্পনা হয়েছে। বাংলা দেশের বাইরে, পূর্ব ও উত্তর পশ্চিম ভারতে, সদাগর বেনেদের ব্যবসায় কার্যে এখন পর্যন্ত যে সংক্ষিপ্ত, মাত্রা ও স্বরবর্ণবর্জিত, লিপি ব্যবহৃত হয় তার নাম 'কায়থী'। আকারে তা খরোষ্ঠীবৎ। 'কায়স্থ' শব্দটি যে সংস্কৃত-জাত নয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মনে হয় মধ্য পারসীক (পহ্লবী) থেকে আগত। সম্ভবত মূল শব্দটি ছিল 'কাঘজ্-বস্ত', ফারসীতে 'কাঘজ্ (কাঘিজ্)-বশ্ত্' অর্থাৎ চিঠিপত্রের বা লেখার কাজে নিপুণ। আরও মনে হয় যে কায়স্থেরা তাঁদের দলিল-পত্রের ও হিসাবের কাজে সংক্ষিপ্ত বর্ণমালা ও অঙ্কচিহ্ন ব্যবহার করতেন।

মিশ্র জাতিনাম হিসাবে 'করণ' লোকনাথের তাম্রশাসনে প্রথম পাওয়া গেল। আগেকার তাম্রশাসনে রাজস্ব ও শাসন দপ্তরের কর্মচারী হিসাবে 'করণিক' পাওয়া গিয়েছিল। হিসাবপত্র ও দলিল দস্তাবেজের কাজ সেকালে যাঁরা করতেন তাঁরা 'কায়স্থ' নামে পরিচিত ছিলেন। আর যাঁরা অধিকরণে অন্যান্য কাজের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, এখনকার ভাষায় এক্জিকিউটিভ অফিসার, তাঁরা ছিলেন 'করণিক' বা 'করণ'। কায়স্থ জাতিনামে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে, হয়ত বা কিছু পরে, করণও জাতিনামে পরিণত হয়। এঁরা 'শ্রীকরণ' নামেও পরিচিত ছিলেন। 'শ্রীকরণ' নামটির মধ্যে 'অধিকরণ'-এর সঙ্গে এঁদের আদিম যোগাযোগটি ধরা পড়ে। বঙ্গভূমির অধিকাংশ স্থানে 'করণ' এখন কায়স্থ জাতিরই বিশেষ এক থাক ব'লে পরিগণিত। পশ্চিমবঙ্গে এঁরা 'উত্তররাঢ়ীয়

কায়স্থ' ব'লে পরিজ্ঞাত। বঙ্গে দক্ষিণ পশ্চিম প্রত্যন্তে ও উড়িষ্যায় করণ কায়স্থ থেকে স্বতন্ত্র।

গোড়ার দিকে 'বৈদ্য' বৃত্তিনাম ছিল, জাতিনাম ছিল না। "বাজিবৈদ্য" বা ঘোড়ার ডাক্তার সহদেবের নাম নয়পালের গয়া লিপির রচয়িতা ব'লে উল্লিখিত। বৈদ্য (অর্থাৎ আয়ুর্বেদবিদ্যাদক্ষ) ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সব জাতির ব্যক্তি হ'তে পারতেন। বঙ্গভূমিতে বৌদ্ধরা চিকিৎসাবিদ্যার আলোচনায় অনগ্রসর ছিলেন না। কায়স্থের জাতি-পরিণতির পরে হয়ত বৈদ্য স্বতন্ত্র জাতি রূপে পরিগণিত হয়। এঁদের নামান্তর 'অম্বষ্ঠ' শব্দের মূল অর্থ ছিল প্রসব-সহায়ক (পাণিনি)।

কৈবর্ত সম্ভবত ethnic (অর্থাৎ মূল জাতিগত) নাম। তবে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর আগেই জাতিনামে পরিণত হয়েছিল। সদুক্তিকর্ণামৃতে এক "কেবট্ট" পপীপের রচিত কবিতা সঙ্কলিত আছে॥

৪

বাণিজ্য ও অর্থ

খ্রীষ্টীয় প্রথম পাঁচ ছয় শতাব্দী পর্যন্ত এদেশের আর্থিক স্বচ্ছলতা বাণিজ্য-নির্ভর ছিল। শস্য উৎপাদন তো ব্যাপক ভাবে ছিলই, শিল্প উৎপাদন, বিশেষ ক'রে সুতি ও রেশমি বস্ত্রের উৎপাদন, কম ছিল না। গোড়ার দিকে এদেশি বণিকেরা বিদেশে, বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরের ওপারে, বাণিজ্য কর্মে বেশ তৎপর ছিল। মনে হয় বিদেশি বণিকদের তৎপরতা এবং সেই সঙ্গে জলদস্যু-বৃত্তির আধিক্য আমাদের দেশে বিদেশে বাণিজ্য খর্ব ক'রে দিতে থাকে। রোম আরব ইজিপ্‌ট প্রভৃতি বিদেশের বণিকরা এবং দক্ষিণ ভারতের লোকেরা বাংলা দেশে এসে এখানকার মাল প্রচুর রপ্তানি করতে থাকে। তার ফলে এদেশের পোত-সার্থবাহদের উদ্যম নষ্ট হ'য়ে যায়।

একথা আগেই বলেছি যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর দিকে বাংলা দেশ থেকে বিদেশে পণ্য রপ্তানির কিঞ্চিৎ খবর পাওয়া যায় পূর্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলবাসী নাবিকদের কড়চা বই থেকে।[১] উপযুক্ত অংশ এখানে অনুবাদ করে দিই।

"......কাছেই একটি নদী আছে, নাম গঙ্গা (Ganges), আর এ নদীর উৎপত্তি ও অবসান নীল নদের মতোই। নদীর তীরে একটি হাট-সহর (market town) আছে, তার নাম নদীর নামের সঙ্গে এক, গঙ্গা (Ganges)। এই স্থান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় তেজপাত (malabathrum), মূল্যবান্ সুগন্ধ অঞ্জন (spikenard) এবং মুক্তা ও উৎকৃষ্ট নানারকম মসলিন বস্ত্র যার নাম (আমরা বলি) গাঙ্গেয় ও হাওয়াই বস্ত্র (Gangetic, ventus textilis, nebula)।

[১] *Periplus of the Erythrian Sea* (মূল গ্রীক থেকে অনূদিত) ডাব্‌লু্ এইচ্ শ্রফ (Schroff) অনূদিত, ১৯১২।

লোকে বলে এ স্থানের কাছাকাছি সোনার খনি আছে, এবং একরকম স্বর্ণমুদ্রা চলিত আছে যাকে বলি কলতিস্ (Caltis)...... ।”[১]

পেরিপ্লুসে রেশমি বস্ত্রের স্পষ্ট উল্লেখ নেই। হয়ত ‘গ্যাঞ্জেটিক’ বলতে রেশমি ও সুতি দুরকম সূক্ষ্ম বস্ত্রই বোঝাত। তা যদি না হয় তবে বুঝব এদেশে গুটিপোকার চাষ ও রেশমি সুতার শিল্প খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাপকভাবে চলিত হয় নি। পতঞ্জলি মহাকাব্যে মথুরায় ও কাশীতে রেশমি বস্ত্রের উৎপাদনের উল্লেখ করেছেন, এমন কি সেখানকার সে বস্ত্রের বিশেষত্বও নির্দেশ করেছেন। পতঞ্জলি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক ছিলেন। অনুমান করতে পারি যে বাংলা দেশে রেশমের কারবার গুপ্ত-শাসনের সময় থেকে ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল এবং দু-তিন শ বছরের মধ্যেই রেশম শিল্প এদেশের অর্থ সঞ্চয়ের একটা প্রধান উপায়ে পরিণত হয়েছিল। বিজয়সেনের মল্লসারুল তাম্রপট্টে (ষষ্ঠ শতাব্দী) উচ্চ রাজকর্মচারীদের মধ্যে ঔর্ণাস্থানিকের উল্লেখ আছে। নাম থেকে মনে হয় ইনি রেশমি বস্ত্র ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রে বা হাটে শুল্ক সংগ্রহকারী ছিলেন।

এদেশে মুদ্রার চলন খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না। কাজ চলত প্রধানত কড়ি[২] দিয়ে। যা ছিল তা বণিকদের ছেনিকাটা (punch marked) মুদ্রা। তা রূপার ও তামার, কোন রাজাধিরাজের নামাঙ্কিত অথবা মূর্তিখচিত নয়। এরকম মুদ্রা চালু হয়েছিল বিশেষ ভাবে গুপ্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে। তার আগে কুষানদের মুদ্রা এবং বিদেশী বণিকদের কাছে পাওয়া দীনার এদেশে সাগ্রহে গৃহীত হ’ত। মনে হয় এদেশে বিদেশি বাণিজ্যে দ্রব্যবিনিময় বেশি হ’ত না, মুদ্রা বিনিময়েই বেশি হত। ভারতবর্ষের অন্যত্র করমণ্ডল ও মালাবার

১ অনুচ্ছেদ ৬৩।

২ কপর্দ মানে সূক্ষ্মাধঃ শঙ্খাকৃতি পেঁচালো কড়ি পরে শব্দটি সাধারণ কড়ির অর্থ পেয়েছে।

উপকূলের বাণিজ্যে বাংলা দেশের তুলনায় দ্রব্যবিনিময় (তার মধ্যে বিলাতি মদও ছিল) বেশি হ'ত।

নির্দিষ্ট ওজনের তাম্রখণ্ড রৌপ্যখণ্ড ও স্বর্ণখণ্ড এদেশে বরাবর মুদ্রা রূপে প্রচলিত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে তাম্রমুদ্রার উল্লেখ নেই। পরবর্তীকালের সাহিত্য থেকে ন্যূনতম তাম্রমুদ্রার নাম পাই 'পাই'।[১] শব্দটি সংস্কৃত 'পাদিক' (=চতুর্থাংশ) থেকে এসেছে।[২] ছেনি দিয়ে কেটে তৈরি হ'ত এবং অনেক সময় চিহ্ন অথবা উৎপত্তি স্থানের নাম ছাপ দিয়ে উৎকীর্ণ হ'ত বলে মুদ্রার সাধারণ নাম ছিল 'টঙ্ক'। তবে লোকের ব্যবহারে 'টঙ্ক' শব্দটি রজত মুদ্রাই বোঝাত, কেননা এই মুদ্রাই বেশি প্রচলিত ছিল। এই 'টঙ্ক' শব্দের আর একটি রূপ 'টঙ্কক' থেকে এখনকার 'টাকা' শব্দ উৎপন্ন।

সেকালে 'মুদ্রা' শব্দটি ইংরেজী coin শব্দের অর্থ বোঝাত না। বোঝাত মোহর, অর্থাৎ প্রতীক মূর্তি এবং অথবা লিপিযুক্ত (কিংবা লিপিহীন) ছাপ যা কোন দান অথবা শাসনপত্রকে রাজসম্মত সুতরাং বিধিবদ্ধ জ্ঞাপন করত। সেকালের অধিকাংশ তাম্রপট্টের শীর্ষে শাসন-কর্তৃপক্ষের অথবা রাজার বিশিষ্ট মুদ্রা অঙ্কিত অথবা সংযুক্ত থাকত। পাল চন্দ্র বর্ম সেন প্রভৃতি রাজবংশের বিশিষ্ট মুদ্রা ছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এঁরা হয়ত কেউই coin প্রচলিত করেন নি।[৩] বলতে কি বৈন্যগুপ্ত ও শশাঙ্ক ছাড়া কোন এদেশে রাজাই তা করেন নি। বাঙালী বলতে যা বোঝায় শশাঙ্ক ঠিক তা ছিলেন না। গুপ্ত-বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ থাক বা না থাক তিনি মগধের লোক ছিলেন। শশাঙ্ক ছাড়া আরও দুচারজন রাজার মুদ্রার সন্ধান মিলেছে,—যেমন জয়নাগ সমাচারদেব ইত্যাদি।

১ "পাই লভ্য লয় দিন প্রতি" (মুকুন্দরাম)।
২ "পাদিকং লপ্স্যামহে" (পতঞ্জলির মহাভাষ্য)।
৩ "শ্রীবিগ্র" লিপিযুক্ত রজত ও তাম্র মুদ্রা যদি বিগ্রহপালের তবে অন্য কথা।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর তাম্রপট্টগুলিতে ভূমি-ক্রয়বিক্রয়ের দাম বলা আছে দীনারে। (এর পরে কোন প্রত্নলিপিতে আর জমির দামের কোন উল্লেখ পাই না।) এই উল্লেখ থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমির দামের একটা তুলনামূলক হিসাব এবং জমির উৎকর্ষের একটা হদিস পাই। দামোদরপুর তাম্রপট্ট অনুসারে এক কুল্যবাপ[১] (অর্থাৎ কুড়বা বা বিঘা) জমির দাম তিন দীনার, বইগ্রাম অনুসারে দুই দীনার আর পাহাড়পুর অনুসারে চার দীনার। দীনার হল সোনার মোহর। গুপ্ত আমলে রূপার টাকা ছিল 'রূপ্যক'। বইগ্রাম তাম্রপট্টে রূপকের উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে ৩ কুল্যবাপ ও ২ দ্রোণবাপের দাম ৬ দীনার ৮ রূপ্যক। সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় যে ১ দীনার =১৬ রূপ্যক। দীনারের দর বাঁধা থাকলে বুঝতে হবে পাহাড়পুর অঞ্চলে জমির চাহিদা সব চেয়ে বেশি ছিল এবং বইগ্রাম অঞ্চলে সবচেয়ে কম।

পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে দীনারের চলন দ্রুত ক'মে আসতে থাকে। তার কারণ একাধিক। প্রথমত বহির্বাণিজ্য ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসায় বিদেশি দীনারের আমদানি বন্ধ হয় এবং বহির্বাণিজ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহারও ক'মে আসতে থাকে। দ্বিতীয়ত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকর্মের বিস্তৃতি এবং কৃষিকর্মে দেশের সমৃদ্ধি বাড়তে থাকে। তার ফলে অন্তর্বাণিজ্যে ক্রয়-বিক্রয় হয় বদল নয় স্বল্পমানের ধাতু-মুদ্রা এবং কড়ির মাধ্যমে হ'তে থাকে। তৃতীয়ত দীনার প্রভৃতি স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা অলঙ্কার গঠনে অথবা ঘরে সঞ্চয়ের জন্য সংগৃহীত হ'তে থাকে। মনে রাখতে হবে যে পাল-রাজারা এবং তাঁদের সমসাময়িক ও পরবর্তী রাজারা কেউই স্বর্ণ অথবা অন্য ধাতুর মুদ্রা (coin) বার করেছিলেন বলে কোন দৃঢ় প্রমাণ নেই; তাঁদের 'মুদ্রা' তাম্রপট্টের উপরে ছাপা অথবা সংযুক্ত থাকত। এই সময়ে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দী থেকে এদেশে রাজকীয় মুদ্রার (coin) স্থানে নির্দিষ্ট বিশুদ্ধির ও নির্দিষ্ট ওজনের ধাতুখণ্ড (সোনা, রূপা ও তামা) প্রচলিত ছিল।

সোনার অপেক্ষা রূপার খণ্ডই বেশি চলিত ছিল। সেই জন্যে নির্দিষ্ট ওজনের ও নির্দিষ্ট বিশুদ্ধির যে ধাতুখণ্ডের সাধারণ নাম 'টঙ্ক' তা রৌপ্যখণ্ড বোঝাতেই শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয়।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে এদেশে জমির দরের সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না বটে, তবে দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন-রাজাদের কোন কোন তাম্রপট্টে জমির উৎপাদন-মূল্যের নির্দেশ পাওয়া গেছে। এই নির্দেশ থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে দেশের মুদ্রামান টাকা ছেড়ে কড়িতে দাঁড়িয়েছিল। বিজয়সেনের বারাকপুর তাম্রপট্ট থেকে জানা যায় যে সমতটে প্রচলিত মাপ অনুসারে চার পাটক[১] ভূমির আয় ছিল দু শ পুরাণ-কপর্দক[২]। বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রপট্ট থেকে জানি যে উত্তররাঢ়ে ৭ পাটক[৩] ৯ দ্রোণ ৪০ উন্মান ৩ কাক পরিমাণ ভূমির বাৎসরিক আয় হ'ত ৫০০ কপর্দক-পুরাণ। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া তাম্রপট্ট অনুসারে পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলে সেন-রাজাদের প্রবর্তিত মাপে ("বৃষভশঙ্কর-নলেন") ১ পাটক ৯ দ্রোণ ৩৭ উন্মান ১ কাক পরিমাণ ভূমির বাৎসরিক আয় ধরা হয়েছে ১০০ কপর্দক-পুরাণ। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রপট্ট অনুসারে বেতড্ডচতুরকে (আধুনিক হাওড়া জেলার বেতড় অঞ্চলে) সে অঞ্চলের হাত-মাপে ("তদ্দেশীয়···· হস্তনলেন") দ্রোণ পিছু ১৫ কপর্দক-পুরাণ হিসাবে ৮০ দ্রোণ ১৭ উন্মান জমির আয় ছিল বছরে ৯০০ কপর্দক-পুরাণ। লক্ষ্মণসেনের তর্পণদিঘি তাম্রপট্টে পাই বরেন্দ্রীতে সেখানকার মাপ অনুসারে ("তত্রত্য দেশব্যবহারনলেন") ১২১ আঢ়াবাপ[৪] ৫ উন্মান ভূমির

---

১ ৮ দ্রোণবাপ = ১ কুল্যবাপ, ৫ কুল্যবাপ অর্থাৎ ৪০ দ্রোণবাপ = ১ পাটক।

২ 'পুরাণ' মানে প্রাচীন মূল্যমান, অর্থাৎ 'কর্ষ' (কাহন)। ১৬ পণে এক 'কর্ষ', আর ৮০ কপর্দকে ১ 'পণ'। সুতরাং 'পুরাণ-কপর্দক' = ১২৮০ কড়া কড়ি।

৩ 'পাটক' ও দ্রোণ' এই শব্দ দুটি বস্তুমাপ ও স্থানমাপ দু-ই বোঝাত। শেষ অর্থের বেলায় 'ভূপাটক' ও 'ভূদ্রোণ' ব্যবহৃত হ'ত।

৪ ৪ আঢ়ক (বা আঢ়াবাপ) = ১ দ্রোণ। সুতরাং ১২১ আঢ়াবাপ = ৩০ দ্রোণ ১ আঢ়াবাপ।

বাৎসরিক আয় ১৫০ পুরাণকপর্দক। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রপট্ট অনুসারে বরেন্দ্রীর অন্যত্র অন্যরকম ভূমি-মাপ দেখা যায়। এখানে ১০০ ভূখাড়ি ৯১ খাড়ি[1] জমির আয় বৎসরে ১৬৮ কপর্দক-পুরাণ।

কড়ির হিসাব তখন যেমন ছিল এখনও (অর্থাৎ আধুনিক কালেও) তেমনি। ৪ কপর্দ (আধুনিক "কড়ি" < কপর্দিক) = ১ গণ্ডক (আধুনিক "গণ্ডা"); ৫ গণ্ডক = ১ বোড়ী (আধুনিক "বুড়ি"); ৪ বোড়ী = ১ পণ (আধুনিক "পোণ")। তাম্রপট্টে গণ্ডার উল্লেখ নেই, তবে মহাস্থান প্রত্নলিপিতে যে 'গণ্ডক' উল্লিখিত আছে তা কেউ কেউ গণ্ডা (মুদ্রা বা কড়ি-সংখ্যা) মনে করেন। 'বোড়ী' উল্লিখিত আছে একটি চর্যাগানে ("কড়ি ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করেই"—অর্থাৎ "নাবিক কড়িও নেয় না বুড়িও নেয় না, ভালো ভাবে পার করে দেয়)।

ভূমি-পরিমাপের মানে অঞ্চল বিশেষে ভিন্নতা ছিল। এ ব্যাপার আগে উল্লিখিত হয়েছে।

এদেশে শস্য ও বস্তু বা দ্রব্য মানের (measure of capacity) নির্দেশ পাওয়া যায় সর্বানন্দের টীকাসর্বস্বে। সর্বানন্দ লিখেছেন,

বাহো বিংশতিখারীতি র্ভরিকাস্যাদ্ অনেন তু।
প্রবর্তিঃ পঞ্চখারীভিঃ সস্যমানং প্রবর্ত্ততে॥
নিকুঞ্চং যাবদ্ আখার্য্যাঃ পাদংপাদাবশেষিতম্।
মানো দ্রোণাঢ়কপ্রস্থকুটুবেষু ভবেদিতি॥

অর্থাৎ শস্যমান হ'ল ১ বাহ = ২০ খারী (বা ভরিকা); ১ প্রবর্তি = ৫ খারী; ১ খারী = ৪ নিকুঞ্চ; ১ নিকুঞ্চ = ৪ মান; ১ মান = ৪ দ্রোণ; ১ দ্রোণ = ৪ আঢ়ক; ১ আঢ়ক = ৪ প্রস্থ; ১ প্রস্থ = ৪ কুটুব।

[1] সর্বানন্দের উক্তি অনুসারে ১৬ দ্রোণে এক খারী। মতান্তরে ১৮ দ্রোণে এক খারী। "ভূখাড়ি" সম্ভবত ১০০ খাড়ি।

ভূমি-মাপের মানদণ্ডের নাম ছিল 'নল' (বা 'নাল')। স্থান ও কাল অনুসারে নলের দৈর্ঘ্যের ভিন্নতা হত। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে নলের দৈর্ঘ্য ছিল ৭২ ("অষ্টক-নবক") হাত।

চাষের ভুঁইয়ের সীমা ছিল 'আলি' (অর্থাৎ আল)। এতে জমিতে জল আটক করাও হ'ত। অধিকার-সীমা নির্দেশ ক'রতে আলের উপর 'কীলক' (অর্থাৎ গোঁজ) দেবার উল্লেখ পাই লডহচন্দ্রের প্রথম ময়নামতী তাম্রপট্টে ("গোধানীভূমের্দক্ষিণসীমাল্যারোপিত-কীলকঃ")। মাটির উপরে সীমাচিহ্ন কালক্রমে লুপ্ত হ'য়ে যাবার আশঙ্কা থাকলে ভূমিগর্ভে পোড়া তুষ ছড়িয়ে গণ্ডী টানা হত॥

৫

কৃষি

কৃষিকর্ম এদেশের লোকের প্রধান উপজীবিকা ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে কৃষিকর্ম একমাত্র উপজীবিকা ছিল বললে অন্যায় হয় না। কৃষি বলতে শুধু খাদ্যশস্য উৎপাদন নয়, ব্যবহার্য ও পণ্য অপর বস্তুর উপাদানভূত উদ্ভিজ্জ বস্তুও ধরতে হবে। খাদ্যশস্য—ধান যব মাষ মুগ ঘেসো-মুগ ('কাঠইডা', সর্বানন্দ) মুসুর তিল সর্ষে ইত্যাদি। ধানের ভালোমন্দ ভেদ ছিল। মন্দ ধান যেমন বোরো ('বোরব', সর্বানন্দ), ওড় (বা ওড়ী), কাংনি ('কামণ', সর্বানন্দ)। এই সব খাদ্যবস্তু ছাড়া উৎপন্ন হ'ত কাপাস আখ নীল ('মেচক') পাট। এর সঙ্গে গুটিপোকাও ধরা যায়! ধানের মতো কাপাসের চাষও দেশে সর্বব্যাপী ছিল। কাপাসের তুলো পিঁজে নিয়ে স্থতো কাটা সেকালে প্রধান কুটীরশিল্প ছিল। একাজ বাড়ীর—বিশেষ ক'রে দরিদ্র বাড়ীর মেয়েরাই করত। প্রমাণ—নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোক, কবি শুভাঙ্কের রচনা, রাজপ্রশস্তি।

কার্পাসাস্থিপ্রচয়নিচিতা নির্ধনশ্রোত্রিয়াণাং
যেষাং বাত্যা প্রবিততকুটীপ্রাঙ্গণান্তা বভূবুঃ।
তৎসৌধানাং পরিসরভুবি ত্বৎপ্রসাদাদ্ ইদানীং
ক্রীড়াযুদ্ধচ্ছিন্নরযুবতীহারমুক্তাঃ পতন্তি॥

'যে সব গরীব ব্রাহ্মণদের কুটীরপ্রাঙ্গণে জোরে হাওয়া দিলে কাপাসের বীজ ছড়াছড়ি যেত এখন তোমার অনুগ্রহে তাদের প্রাসাদের প্রশস্ত হাতায় যুবতী মেয়েদের আমোদের হুড়াহুড়িতে হারের মুক্তা (এখানে ওখানে) গড়াগড়ি যায়॥'

উমাপতিধরও একটি প্রশস্তি শ্লোকে বলেছেন যে, বামুনের মেয়েরা মুক্তার ধারণা করত কাপাসের বীজ থেকে।

এদেশে চাষের ব্যবস্থার সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় ই-সিঙের লেখায়। তার থেকে বোঝায় জোতদারি প্রথায় চাষ হ'লে ভূমির অধিকারী বলদ দিতেন এবং উৎপন্ন শস্যের তৃতীয়াংশ পেতেন। ক্ষেত্রের কর্মকরেরাও ফসলের কিছু অংশ পেত॥

৬

ভোজন ও পান

পূর্বভারতে মৎস্যাহার বহুকাল থেকে ব্যবহারসিদ্ধ। শাস্ত্রবিধি যাই হোক না কেন এদেশের ব্রাহ্মণেরাও অনেকে যে মৎস্যাহার করতেন তা পতঞ্জলির মহাভাষ্য থেকে জানা যায়।[১] পূর্বভারতের অধিবাসীরা, বিশেষ করে গাঙ্গেয় উপত্যকার ও গঙ্গার ধারের লোকেরা যে অত্যন্ত মৎস্যাশী ছিল তা অশোকের একটি অনুশাসন থেকে অনুমান হয়। অনেক মৎস্যের শিকার ইনি স্থায়ী অথবা সাময়িক ভাবে—যখন মাছ ডিম ছাড়ে সে মরশুমে—বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

এদেশে মৎস্য ও মৎস্যাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রাচীন অভিধান ও অভিধানের টীকা থেকে সংগ্রহ করা যায়। সর্বানন্দ ইলিস মাছের উল্লেখ করেছেন। বঙ্গাল দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যে শুটকী ও সোরা মাছ খেতে পছন্দ করত তাও বলেছেন।[২] "মধ্যদেশ বিনির্গত" নবাগত "বেদাধ্যায়ী" ব্রাহ্মণদের ব্যাপক উপনিবেশের ফলে এদেশের ব্রাহ্মণ-সমাজে মৎস্যাহার ক্রমশ নিন্দিত আচারে পরিণত হ'তে থাকে। এখনও মিথিলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা মৎস্যাহারী, এদেশের মতো। এর থেকেই বোঝা যায় যে মৎস্যাহার পূর্বভারতের প্রাচীন অভ্যাস।

এদেশের, শুধু এদেশের কেন, সর্বভারতের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, সুতরাং প্রধান শস্য ছিল ধান। যবের চাষ হ'ত। যব খাওয়া হ'ত মণ্ড ক'রে ('যবাগূ', বাংলায় "জাউ"—পরে শব্দটি খুদের মাড়ও বোঝাত) অথবা ভেজে ছাতু ক'রে। এভাবে যব খাওয়া এখনও প্রচলিত আছে। মোহেঞ্জোদাড়োর ভূমিগর্ভ থেকে গম পাওয়া গেলেও এদেশে গমের প্রচলন তেমন ছিল না। ভারতবর্ষের মুসলমানদের আগমনের পর থেকে এদেশে খাদ্যশস্য রূপে গমের প্রচলন বেড়ে যায় উত্তরপশ্চিম ও

৩. ৩. ১ দ্রষ্টব্য।
"সিহুল্লী·········যত্র বঙ্গালবচ্চারাণাং প্রীতিঃ।"

উত্তর ভারতে। বাংলা দেশে গমের চাষ কমই হ'ত ব'লে মনে হয়। কর্ণসুবর্ণের নিকটবর্তী রক্তমৃত্তিকা বিহারের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মাটি খুঁড়ে গম পাওয়া গেছে, সুতরাং গম অজানা ছিল বলা যায় না। সাত রকম ব্রীহির মধ্যে যব দেখান শামা-ধান কঙ্গু ইত্যাদির সঙ্গে গোধূমের উল্লেখ আছে। কলাইয়ের মধ্যে মুগ, 'মুদ্‌গবনী' ও 'কাঠইড়া' (অর্থাৎ আধুনিক বনমুগ ও ঘেসো মুগ), মাষ ও মসুরের উল্লেখ পাই। সর্ষে ঘানিতে পিষে তেল করা হত। তিল তেলের বা অন্য কোন রকম তেলের উল্লেখ নেই। আনাজের উল্লেখ পাই অলাবু (=লাউ), কুষ্মাণ্ড (=চালকুমড়ো), করবেল (=করলা, সর্বানন্দ), ইচ্চড় (=এঁচড়, সর্বানন্দ), বাতিঙ্গন (=বেগুন), পটোল, কর্করী (=কাঁকুড়, সর্বানন্দ), মূলক (=মূলো, সর্বানন্দ), তিন্তিলি (তেঁতুল, সর্বানন্দ) ইত্যাদি। কাপড় কাচায় ব্যবহৃত হ'ত 'হরিঠা' (আধুনিক রীঠা)। গাছের মূল, "করীর" (=ডগা, ফল, কাণ্ড), "অধিরূঢ়" (ভিতরের শাঁস), ছাল, ফুল এবং "কব্বক" (=কোঁড় ও পোয়াল ছাতু ?)—সবই যে আনাজ রূপে রান্না হ'ত তা জানতে পারি সর্বানন্দের উক্ত "শাকং দশবিধং স্মৃতম্" শ্লোকটির ব্যাখ্যা থেকে। সর্বানন্দ বলেছেন, মূল—মূলো, করীর —বাঁশেব কোঁড় (অঙ্কুর), অগ্র—বেত প্রভৃতির, ফল—কাঁকুড় কুমড়া ইত্যাদি, কাণ্ড—তালের মেতি ("তাড়োপল") ইত্যাদি, অধিরূঢ়— তালশাঁস ইত্যাদি, ত্বক্—থোড় ইত্যাদি, ফুল—বঙ্গাসন (=বাকসনা) ইত্যাদি, কব্বক—কোণ্ডুক (বাঁশের কোঁড় ?)। সর্বানন্দ এই খাদ্য শাকগুলি উল্লেখ করেছেন,—'সলুপ্য' (সুলপো), 'শুষ্ঠিআ', 'সুরসুনী' অর্থাৎ শুশুনি, 'হিলমঞ্চী' অর্থাৎ হেলেঞ্চা বা হিংচে।

সমুদ্রের জল শুখিয়ে যে নুন হত তাকে বলত সর্বানন্দের সময়ে 'কড়কচ্চ' (এখনকার "করকচ" নুন)। এই নুন যারা করত জাতিগত বৃত্তি হিসেবে, তারা ছিল 'ওড্র'। এই জন্যে একে 'উড়ি' নুনও বলা হ'ত। এদেশের লোকে সর্ষে শাক খুব পছন্দ করত, সে কথা ই-সিং উল্লেখ ক'রে গেছেন। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোন কবির এক শ্লোকে গেঁয়ো

বঙ্গবাসীর সাধা সিধা অথচ উপাদেয় ভোজন ব্যবস্থার একটি চমৎকার বর্ণনা মিলেছে। প্রসঙ্গ অনুমান করতে পারি যে নববিবাহিত পাড়াগাঁয়ের লোকের সহরে বিয়ে হয়েছে। বউকে সে দেশে নিয়ে যেতে চায়, বউ বোধ হয় তেমন রাজি নয়। তাই সে পাড়াগাঁয়ে খাবার সস্তা সুবিধার কথা বলছে। তখন শীতকাল।

তরুণং সর্ষপশাকং নবোদনং পিচ্ছিলানি চ দধীনি।
অল্পব্যয়েন সুন্দরি গ্রাম্যো জনো মিষ্টমশ্নাতি॥

'কচি সর্ষেশাক, নতুন চালের ভাত, হড়হড়ে দই—প্রচুর। সুন্দরি, গাঁয়ের মানুষ অল্পখরচে ভালো খায়॥'

এখনকার দিনে ভুট্টা খাওয়ার মতো অর্দ্ধদগ্ধ করে শস্য বা শস্যশীর্ষ খাওয়াকে বলত "হাডুস" বা "ভাডুস" (সর্বানন্দ)।

এদেশে পেঁয়াজ খেত না এবং কোন কাঁচা সবজি খাওয়ার রীতি ছিল না। একথা ই-সিং ব'লে গেছেন। রসুনের (রসাউণ, সর্বানন্দ) ব্যবহার ছিল।

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত এক অবহট্ট ছড়ায় সেকালের বঙ্গবাসীর পিচ্ছিল আহারপ্রিয়তার উল্লেখ আছে। (আগেকার উদাহরণে এবং এইখানেও মাষ-কলাইয়ের সূপের উল্লেখ নেই, একটু বিস্ময়ের কথা বটে।)

ওগ্‌গর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা
গাইক ঘিত্তা দুদ্ধ সজুত্তা।
মোইণি মচ্ছা নালিচগচ্ছা
দিজ্জই কন্তা খা পুণবন্তা॥

'ওগরা ভাত (অর্থাৎ ফেনে ভাতে), কলার পাত, গাওয়া ঘি, দুধের সংযোগে, ময়না মাছ, নালতা শাক,—পরিবেশন করে প্রেয়সী, খায় যে পুণ্যবান্॥'

ভোজনের আয়োজনে দুধ এবং দুধ থেকে উৎপন্ন এবং তৈয়ারি বস্তুই সেকালে সবচেয়ে মূল্যবান্ এবং আদরণীয় খাদ্য ব'লে গণ্য ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ায় রচিত বর্ণরত্নাকরে মৈথিল কবিপণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বর নায়কের (রাজার) মধ্যাহ্ন-ভোজনের যে ফিরিস্তি দিয়েছেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

দই[১]-ক্ষীরের অনেক রকম খাবার ছিল, সর্বানন্দ সে বিষয়ে কিছু কিছু বলেছেন। 'খিরিস' ('খিরিসা') সম্ভবত রাবড়ি। 'রসালা' বা 'শিখরিণী' ছিল, এখনকার মহারাষ্ট্রের শ্রীখণ্ডির মতো, চিনি দই ও ঘিয়ের তৈরি। দইয়ের সঙ্গে দুধ দিয়ে হ'ত 'দধিকূর্চিকা'। ঘোলের সঙ্গে ক্ষীর মিশিয়ে হত 'তক্রকূর্চিকা'। ঘন ক্ষীর (?) ছিল 'কূর্চিকা'। এ খাদ্যগুলির ভদ্র অর্থাৎ সংস্কৃত নামই পাওয়া গেছে। বড়লোকের ভোজ্য ছিল, তাই কি।

নয়পালের মন্ত্রী নারায়ণ-দত্তের পুত্র, রাজার "অন্তরঙ্গ" ভানু-দত্তের ছোট ভাই চক্রপাণি-দত্ত (একাদশ শতাব্দী) বিখ্যাত বৈদ্যক গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁর গ্রন্থে সেকালের ধনী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যকর ভোজনের নির্দেশ আছে। রসায়ন অধিকারে চক্রপাণি বলেছেন,—'প্রথমে দুগ্ধ পান করতে হবে, তার পরে ভাল ক'রে সিদ্ধ ঝরঝরে শালি চালের ভাত। তাতে প্রচুর ঘি দিতে হবে, আর পক্ষি-মাংসের সহযোগে খেতে হবে। মাংস যদি না পাওয়া যায় তো নির্দোষ বড় মাছ খাওয়া চলবে। যেমন—মাগুর রুই শোল। এসব মাছ পুড়িয়ে (অর্থাৎ রোষ্ট ক'রে) খেলে প্রায় মাংসেরই মতো (উপকারী)।

'পানিফল কেশুর কলা তাল নারিকেল ইত্যাদি এবং অন্য যে সব বলকারী মিষ্ট ফল—যেমন কাঁঠাল ইত্যাদি—ভালো। কেচুক (=কচু?), ওল ("ওল্ল"), তালের মেথি, বেগুন, পটোল—ইত্যাদি ফল, পাতা, ডাঁটা (?), মুগ, মসুর, আখের রস—এই সব নিরামিষ আনাজ প্রশস্ত। বনফল বৈঁচি ('বহেঞ্চি')-ও খাওয়া চলে। সব

[১] পাতলা দইকে বলত 'দ্রগড়' (সর্বানন্দ)।

রকম শাক পরিত্যাজ্য, তবে রুচির জন্য অল্প স্বল্প 'বাস্তুক' (=বেতো) দেওয়া যেতে পারে। যে সব শাক বিহিত এবং যে সব শাক নিষিদ্ধ তা ছাড়া অন্য শাক মধ্য শ্রেণীর (অর্থাৎ অল্পস্বল্প খাওয়া যেতে পারে) বুঝতে হবে॥'

আখের গুড়ের টুকরো মিছরির (বা পাটালির) মতো মিষ্টান্নের নাম ছিল সর্বানন্দের সময়ে 'খণ্ডশালুক' অথবা 'মৎস্যণ্ডী'। সর্বানন্দ বলেছেন, বিশেষ এক রকম আখের রস থেকে এ জিনিস হ'ত ("ইক্ষু-বিশেষস্য রসপাকে খণ্ডযোগে যা সা সারভূতা গুটিকাকারা জায়তে সা…")।

পূর্ববঙ্গ ও আসাম অঞ্চলে কাঁচা সুপারি ("মজা গুয়া") পচিয়ে খাওয়ার রীতি আছে। এ রীতি আগে অন্যত্রও অজ্ঞাত ছিল না। মৈথিল কবিপণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বর (চতুর্দশ শতাব্দী) লক্ষ্মণাবতীর "সরস পূগ" উল্লেখ করেছেন রাজভোগ্যের মধ্যে।

এদেশে নানারকম পানা বা সরবৎ খাওয়ার রীতি ছিল ভিক্ষুদের মধ্যে। সেকথা ই-সিং বলে গেছেন। তিনি এই পাঁচটি সরবতের নাম করেছেন,—চোচ-পান, মোচ-পান, কুলক-পান, অশ্বত্থ-পান, পরুসক-পান ও খর্জুর-পান। খর্জুর-পান খেজুর গোলা অপেক্ষা খেজুররস হওয়া বেশি সম্ভব। কুলক-পান একরকম কাঁকুড়ের সরবৎ, কুলের পানা ব'লে মনে হয় না। মোচ-পান কোন এক গাছের বা ফলের রস, কলার পানা-ও হতে পারে। চোচ-পান ডাবের জল। পরুসক-পান একরকম গাছের (Grewia Asiatica বা Xylocarpus Granatum ; বন্য দ্রাক্ষা ?) ফলের রস।

মিষ্টান্ন পিষ্টক ইত্যাদিকে বলত 'ছন্দ' বা 'ছন্দক'। যারা ছন্দ তৈরি ক'রত তারা ছিল (সর্বানন্দের উল্লেখ অনুসারে) 'ছন্দবার' (<ছন্দকার)। টাকনা বা চাটনি ধরণের খাদ্যকে বলত 'ওড়শিআ' (<অবদংশিকা ; সর্বানন্দ) ; আধপোড়া যব বা অনুরূপ শস্যের শিষ 'হাত্তুস' বা 'ভাত্তুস'। শুটকি বা সোরা মাছ 'সিহুল্লী'॥

৭

বাসভবন ও গৃহস্থালী

এদেশের লোকের বাসগৃহ ছিল প্রধানত খড়ের ছাউনির ও মাটির দেওয়ালের। ছিটে বেড়ার হ'লে ছোট এবং জালিকাটা, তাই বলত 'জালক'। চালের কাঠামো হ'ত বাঁশের। দরজা কাঠের। জানালা প্রায়ই থাকত না। খড়ের ছাউনি থাকায় বায়ু-চলাচলের সমস্যা ছিল না। পূজার জন্য অথবা সমবেত বহু লোকের কাজের জন্য নির্মিত হ'ত 'মণ্ডপ' অথবা 'শালা'।[১] মণ্ডপে দেওয়াল নেই, বাঁশের খুটির উপর খড়ের চাল, মণ্ডপের আয়তন অনুসারে চার-চালা অথবা আট-চালা। (বাসগৃহ সাধারণত চার-চালা হ'ত।) আট-চালা মণ্ডপের একটি খুব প্রাচীন চিত্র পাওয়া গিয়াছে—খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অঙ্কিত সোহ্‌গৌরা প্রত্নলিপিফলকের শীর্ষ (নিদর্শনে দ্রষ্টব্য)। এই সময়ের মাটির ঘরেরও—ছবি নয় মডেল—পাওয়া যাচ্ছে অশোকের নির্মিত বরাবর পাহাড়ের গুহাগৃহে। মডেল বলছি পাথরের দেওয়ালের জন্যেই নয়, চাল ঠিক চার-চালার মতো করা সম্ভব হয় নি ব'লে। বরাবর পাহাড়ের গুহাগৃহ শুধু পূর্ব ভারতে নয় সমস্ত ভারতবর্ষে তৈরি বাস-ঘরের সব চেয়ে পুরানো নিদর্শন (নিদর্শনে দ্রষ্টব্য)।

মণ্ডপের বৈপরীত্যে বাসগৃহের নাম ছিল 'উপকারিকা' (>উয়ারি)।[২] যে ঘরের ছাদ খড়ে ছাওয়া নয়, মাটির অথবা ইঁটের এবং যে ঘরে একটি মাত্র দ্বার তাকে ব'লত 'কোষ্ঠক' (<কোঠা)। ইঁটের ব্যবহার বরাবরই ছিল তবে দেবালয় বিহার রাজপ্রসাদ ও ইঁদারা প্রভৃতি নির্মাণেই ইঁটের ব্যবহার বেশি হ'ত।

১ 'মণ্ডপ' (>মাড়ো) ব্যবহৃত হ'ত পূজা-স্থান হিসাবে। ঘরের কাজে 'শালা' (> শাল), যেমন ঢেঁকিশাল, পাঠশাল, নাটশাল, হেঁসেল (<হাঁড়ি-শাল), রান্নাশাল।

২ আধুনিক "বারোয়ারি" শব্দ তুলনীয়। অর্থ বাড়ির বাইরের ঘর।

পঞ্চম শতাব্দীর অনুশাসনে (বুধগুপ্ত ; দামোদরপুর) কোটিবর্ষ বিষয়ে "হিমবচ্ছিখরে" কোকামুখস্বামী ও শ্বেতবরাহস্বামীর দেউল ("দেবকুল") কোঠা ঘর (কোষ্ঠিকা") দুটি দুটি নির্মাণের কথা আছে। ধবলগৃহ ছিল ইঁটের বাড়ী। চিলে ছাত 'চূড়াট্টা'। 'জালক' জানালা।

পাথরের মন্দির ও প্রাসাদ কজঙ্গল অর্থাৎ মুঙ্গের-রাজমহল অঞ্চলে নির্মিত হ'ত কেন না এইখানেই পাথর মিলত। অন্যত্র—বিশেষ ক'রে পৌণ্ড্রবর্ধনে পাথর ও ইঁট দুই মিলিয়ে সৌধ নির্মিত হ'ত। 'দেবকুল' ছিল বড় ঠাকুর-বাড়ী, 'দেবগৃহ' (<দেহারা) ছিল দেবতার কোঠা। আবাসগৃহ 'আবাসিনী'। শয়ন ঘর 'বাসঘর'।

ভূমির শ্রেণী বিভাগ ছিল তিন রকম—বাস্তু ভূমি, নাল ভূমি ও খিল ভূমি। বাস্তু ভূমি বাসের অথবা বাসোপযোগী ভূমি, নাল ভূমি চাষের অথবা চাষের যোগ্য ভূমি, খিল ভূমি বাস্তু এবং চাষ ছাড়া অন্য অর্থাৎ সাধারণত পতিত ভূমি। সাধারণ গৃহস্থের বাস্তুর চারদিকে বেড়া অথবা প্রাচীর দেওয়া থাকত, এই জন্যে বলা হত 'বাটি' বা 'বাটিকা' (>বাড়ি)। কোন কোন ফসলের—যেমন কাপাস—ক্ষেতের চার দিকেও বেড়া দেওয়া হ'ত। ইঁটের প্রাচীর হ'লে ব'লত 'প্রাকার' (>পগার ; সর্বানন্দ)। বাড়ির বাহিরে, সংলগ্ন অথবা নিকটে থাকত পুকুর। জলটানের দেশ হলে বাড়ির মধ্যে থাকত কুয়া। সহর অথবা বড় গ্রাম হ'লে গ্রাম মধ্যে সর্বসাধারণের জন্যে থাকত পাথর অথবা ইঁটে বাঁধা ইন্দারা (<ইন্দ্রাগার[১])।

সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে সদর ও অন্দর মহল ভাগ ছিল। সদর মহলের ঘরে বা মণ্ডপে কাজ কর্ম হ'ত ('উপকারিকা'>উয়ারি)। অন্দর মহল ছিল মেয়েদের অধিকারে ("মেহেরি")। বিবাহিত পুরুষ

[১] ইন্দ্রাগার নাম থেকে ইঁদারার আদি উদ্দেশ্য বোঝা যায় যে প্রথমে এ ছিল বৃষ্টির জল ধ'রে রাখবার চৌবাচ্চা। পরে বৃহৎ কূপে পরিণত হয়। আকাশের জল ইন্দ্রের দেওয়া, কূপের জল বরুণের।

দিনে ভোজন ক'রতে ও রাত্রিতে শুতে যেত। রন্ধনশালা অন্দর মহলের মধ্যে ছিল। সদর মহলের সামনে অঙ্গন বা উঠান (<উট্‌ঠান< *উষ্টান ; জমির ফসল ("উট্‌ঠ") তুলে এখানে আনা হ'ত ব'লে এই নাম)। ধান ঝাড়া হ'লে উঠানেই মরাই ('মরাব') বাঁধা থাকত।

বাড়ির সামনে রাস্তা। তাকে বলত 'রথ্যা' (>লাছ, সর্বানন্দ ; আধুনিক "নাছ", "নাছ দুয়ার")। বাড়ির পিছনে বা পাশে থাকত 'খড়কি' (সর্বানন্দ), আধুনিক 'খিড়কি'। সমতটের নদীবহুল অঞ্চলে নৌযাত্রা প্রশস্ততর ছিল ব'লে সেখানে বাড়ির সংলগ্ন পুকুরের সঙ্গে নদীর যোগাযোগ হ'ত খালের দ্বারা। গুনৈঘর তাম্রপট্টে এইরকম "পুষ্করিণ্যা নৌযোগখাত" উল্লিখিত আছে।

সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে গৃহদেবতা পূজিত হ'ত। বৌদ্ধের গৃহে স্তূপ অথবা অবলোকিতেশ্বরের কিংবা মঞ্জুশ্রীর প্রতিমা, ব্রাহ্মণ্যপন্থীর গৃহে বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতার মূর্তি।[১] (শালগ্রাম শিলার বিষ্ণুরূপে পূজা তখনো প্রচলিত হয় নি।)

উঠান এবং ঘরের মেজে মাটির হ'লে ঝাঁট দিয়ে গোবর জল ছড়ানো হ'ত কিংবা গোবর লেপা হ'ত। যে দাসদাসী একাজ ক'রত তাকে ব'লত 'গোল-গোমী' (<*গোল্লগোময়িক, সর্বানন্দ)। জল নির্গমনের প্রণালী ছিল 'নেলক' (<নালা)।

ঘরের চাল হ'ত খড়ের বা উলুখড়ের ছাওয়া। ছাঁচাকে বলত 'ওহালী'।

সাধারণ লোকের ঘরে আসবাবপত্র বেশি কিছু থাকত না। শোবার খাট, বসবার পিড়ি, দুএকটি পেড়া, খুরো দেওয়া চৌকি, সুতির বা কম্বলের আসন, তালপাতার অথবা খেজুর পাতার চাটাই, ও মাদুর। বাসনপত্র বেশির ভাগ মাটির, কিছু কিছু পিতল-কাঁসার। দেবপূজায় তামার

---

[১] ভুসুকুর একটি চর্যাগানে গৃহদাহে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের মূর্তি ধ্বংসের উল্লেখ আছে,—"দাঢই হরি হর বহ্ম ভড়ারা"।

বাসন। কলার পাতা ভোজন-পাত্র রূপে বেশি ব্যবহৃত হ'ত। জলখাবার 'ঘড়ি' (ঘটী) জল রাখবার 'ঘট' (<ঘড়া), জল আনবার 'কলসী, কলস'। হাতে পায়ে জল ঢালার জন্যে 'ঘড়ুলি' (গাড়ু)। খাদ্য দেবার বা রাখবার ছোট পাত্র 'শরাব' (<সরা), বড়পাত্র 'কুণ্ডী' (<কুঁড়ি ; হাঁড়ি কুঁড়ি), ভাত ডাল রাঁধবার বড় পাত্র 'ভাণ্ডী' (<হাঁড়ি), ভাজা সেঁকার পাত্র 'তেলাবনী' (<তেলানি)। রাঁধাবাড়ার কাজ ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহৃত মাটির বড় পাত্র ছিল 'জাড়ি' (সর্বানন্দ)। ছোট পাত্র ছিল 'ভাণ্ড' (<ভাঁড়) ও 'ভাবাড়িআ' (সর্বানন্দ ; ভাড়িয়া ?), কাঠের বড় জলপাত্র ছিল 'দ্রোণী' (<ডুনি)। তেল রাখবার চামড়ার পাত্র 'কুড়ুঅ' (>কুতুপ) মুখ ধোওয়ার বা থুতু ফেলবার পাত্র 'পতিগহ' (>প্রতিগ্রহ)। কাঠের চৌকা পাত্র 'ফরুগ' (আধুনিক ফেরো)। ধাতুনির্মিত হাতা বা বড় চামচ 'তড্ডু' (>তাড়ু), কাঠের হ'লে 'দাবী' (<দর্বী)। ঢাকনি-যুক্ত বাক্স 'পেড়া' (<পেটক), ছোট হ'লে 'পেড়ী'। মূল্যবান্ বস্তু অলঙ্কার ইত্যাদি রাখবার বাক্স 'মঞ্জুষা' (<মাজস)।

হাতিয়ার ছিল—'হাতইড়া' (>হাতুড়ি), 'টঙ্কী' (পাথর-কাটা টাঙ্গী), 'সর্বরী' বা 'সর্বলী' (<সাবল), 'কুড়ারি' (>কুঠার, কুঠারিকা), 'কোড়নী' (<*কুটনিকা)। শস্য কাঁড়বার মূষল, ধান কাটবার 'কাসি' (কাঁচি), ইত্যাদি।

পেড়া বাক্স এবং বাইরে থেকে ঘর বন্ধ করা হ'ত 'কোঞ্চা তাল' বা 'দৃঢ় তাল' দিয়ে। কোঞ্চা তাল থেকে আধুনিক চাবি-তালার সমার্থক "কুঁজি তালা" এসেছে বটে কিন্তু এখনকার মতো চাবি-তালা তখন অজ্ঞাত ছিল। 'কোঞ্চা' মানে হুক আর 'তাল' (<তাড়) মানে জোরে ঘা মেরে জোড় দেওয়া (যার থেকে কাপড়ে তালি দেওয়া, কানে তালা লাগা এসেছে)। স্পষ্টই বোধ হয় ওলক করার মতো লোহার তালি মেরে এই কাজ হ'ত।

সেকালের ব্যবহার্য অনেক পাত্র ও বস্তু বাঁশের শলা অথবা চেঁচাড়ি

('চঙ্গালী') দিয়ে তৈরি হ'ত। যেমন কুলো ('কুল্লক'), চাঙারি ('চাঙ্গিড়'), পাখা ('বিয়নি' <ব্যজনিকা), খারি (জেলেদের ব্যবহৃত মাছ রাখা পাত্র, 'খ্যারিকা', সর্বানন্দ ; আধুনিক "খালুই")[১] ইত্যাদি।

রান্নার কাজে সাধারণত মাটির পাত্রই ব্যবহৃত হ'ত। ভাত সিদ্ধ করবার জন্য হাঁড়ি 'হাণ্ডী'। ভাজা ও পিঠে করবার জন্য 'তেলাবনী' (<*তৈলাপনিক)। হাঁড়ির ধরণের ছোট পাত্র, রান্নার কাজে নয়, বলা হ'ত 'ভাবাড়িআ' (সর্বানন্দ, =ভাঁড়)। হাড়ির মুখে ঢাকা শরা (<শরাব), ফলার খাবার ও ডাল তরকারি রাখবার পাত্র 'কুণ্ডী' (আধুনিক হাঁড়ি-কুড়ির শেষাংশ)। রন্ধন ছাড়া অন্য গৃহকাজে সম্পন্ন সংসারে কাঁসা-পিতলের বাসন ব্যবহৃত হ'ত। দীপ ও দীপদান পিতলের অথবা মাটির হ'ত।

বহুকাল—এমন কি ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী—পর্যন্ত ভোজন ও পান পাত্র হিসাবে লোহার ব্যবহার, অন্তত ব্রাহ্মণের সংসারে ছিল না। রান্নার কাজে লোহার ব্যবহার অবশ্য আগেই চলিত হয়েছিল, তবে কবে থেকে তা বলা যায় না॥

---

[১] সাধারণ কাজে ব্যবহৃত বড় পাত্রকেও 'খারি' বলত। দ্রোণ ও কুম্ভের মতো খারিও বস্তুর পরিমাণ বোঝাত। সর্বানন্দের মতে যোল দ্রোণে এক খারি।

৮

পরিধান ও অলঙ্কার

সেকালে সাধারণ লোকে, পুরুষ ও স্ত্রী, এক বস্ত্র প'রে থাকত। এবং গোড়ার দিকে (আনুমানিক ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত) মেয়ে-পুরুষের পরিধেয় বহরে খাটো ছিল, তবে মেয়েদের কম খাটো। (প্রাচীনতর শিল্প-নিদর্শন থেকে জানতে পারি যে বড় লোকেদের কাপড়ও খাটো মাপের ছিল।) বড়লোক পুরুষের উর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত তবে উত্তরীয় থাকত চওড়া পৈতের মতো। বড়লোক মেয়েদেরও উত্তরীয় থাকত, কখনো কখনো বা তাদের স্তনদ্বয় কাঁচুলিতে আবৃত বা আবদ্ধ থাকত। সূক্ষ্ম-বস্ত্র পরিধান হ'লে বড়লোক মেয়ে-পুরুষে (বিশেষ ক'রে "বিদগ্ধ-স্ত্রী"—কলাবতী নটীরা) হাফ প্যাণ্টের ধরণের জাঙিয়া পরত। (এই অর্ধোরু-বস্ত্রের নাম সর্বানন্দ বলেছেন 'চলন'।[১] যোদ্ধা ও শিকারীরাও 'চলন' (বা 'চেলন') পরত। ভদ্র গৃহস্থ-ঘরের মেয়েরা কাপড়ে গা ঢেকে রাখত এবং বউয়েরা মাথায় কাপড় দিত, একালের মতোই। লক্ষ্মীধরের একটি কবিতায় সে-কালের ভদ্রঘরের মেয়ের চমৎকার ছবি উঠেছে।

> শিরো যদবগুণ্ঠিতং সহজরূঢ়লজ্জানতং
> গতং চ পরিমন্থরং চরণকোটিলগ্নে দৃশৌ।
> বচঃ পরিমিতং চ যন্মধুরমন্দমন্দাক্ষরং
> নিজং তদিয়মঙ্গনা বদতি নূনমুচ্চৈঃ কুলম্॥

'এই যে—ঘোমটা-দেওয়া মাথা স্বাভাবিক লজ্জায় আনত, চলন ধীর, চোখ পায়ের আঙুলে নিবদ্ধ, কথা অল্পস্বল্প ধীর মধুরভাষে,—এতেই যেন এই মেয়েটি উচ্চরবে নিজের কুলমর্যাদা প্রকাশ করছে॥'

এখনকার দিনের মতো ধুতি-শাড়ীর পার্থক্য সেকালে ছিলই না। ধুতি শব্দটি এসেছে 'ধৌতক' পরবর্তী কালে থেকে। মানে ধোয়া অর্থাৎ

[১] দশম শতাব্দীতে লেখা প্রজ্ঞাপারমিতা পুথির ছবি (ফুসের গ্রন্থে) দ্রষ্টব্য।

সাদা, রঙীন বা রঙ করা নয়, কাপড়।[১] "শাড়ি" এসেছে 'শাট' বা 'শাটক' শব্দজাত ক্ষুদ্রার্থক 'শাটিকা' থেকে। 'শাট, শাটক' মানে ছিল ফালির মতো সরু আয়ামের জোড় দেওয়া বস্ত্র, সাধারণত পশম রেশম অথবা পাট থেকে, সুতরাং মোটা এবং শক্ত। প্রাচীনকালে চওড়া আয়ামের বস্ত্র তৈরি করবার মতো তাঁত উদ্ভাবিত হয় নি। তাই শাট (শাটক) জোড় দিয়ে পরবার ও গায়ে দেবার বস্ত্র এবং বসবার আস্তরণ রূপে তৈরি হ'ত। (যেমন এখনও খেজুর পাতার চাটাই ও শীতলপাটি হয়)। মেয়ে পুরুষ সকলেই এইরকম শাট (শাটক) পরত। পুরানো স্থাপত্যমূর্তিতে ও আঁকা ছবিতে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। পরবর্তীকালে যখন বড় আয়ামের বস্ত্র বোনা হ'তে লাগল তখন পুরাতন পদ্ধতির শাট (শাটক) অনুকরণ ক'রে ডুরে কাপড়ের সৃষ্টি হ'ল (কাপাসের ও রেশমের সুতায়)। শাটকের পাড় বেশি মোটা হ'ত।[২] রেশমের এবং সুতির কাপড় নানা রঙের হ'ত। পতঞ্জলি তিন রঙের রেশমি বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন, সাদা ("শুদ্ধ ধৌতক"), শিউলি ফুলের বোঁটার রঙ ("শৈফালিক") এবং মাঝামাঝি রঙ ("মাধ্যমিক")। কাপড়ে ফুল বুটি ইত্যাদি নানারকম কাজ করা হ'ত এবং রঙিন ও কাজ-করা বস্ত্র নারীপুরুষ নির্বিশেষে সম্ভ্রান্ত লোকে ব্যবহার করত।[৩] আগেই বলেছি যে বিদগ্ধ স্ত্রীলোকে (অর্থাৎ কলাবতী নটীরা) অন্তর্বাস ইজের ('চলন') অথবা সেইরকম ছাঁদে ছোট কাপড় ("চণ্ডাতক") পরত। বৌদ্ধ দেবীর প্রতিকৃতিতে ভীষণাকৃতি মারমুখী (অর্থাৎ যোদ্ধা) কোন কোন দেবী ইজের-পরা আঁকা আছে।

কাপড়ের পাড়কে বলত 'দশতী' (সর্বানন্দ)।

---

[১] এই অর্থে শব্দটি পতঞ্জলি ব্যবহার করেছেন ("অন্যেন শুদ্ধং ধৌতকং কুর্বন্তি" ৫.৩.২।)

[২] স্থাপত্য মূর্তি ও ছবি দ্রষ্টব্য। "পাড়" শব্দটির আসল মানেই তাই। তুলনীয় পুকুরের পাড়, কুয়ার পাড় (বা পাট)। সংস্কৃত 'পাট(ক)'।

[৩] ফুসেব গ্রন্থে চিত্র দ্রষ্টব্য।

এদেশের স্থুতি ও রেশমি বস্ত্রের চাহিদা দেশের অন্যত্র ও বিদেশে খুবই ছিল, সে কথা যথাস্থানে বলেছি। বাংলা দেশে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট বস্ত্রের বিবিধ নাম ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর মৈথিল কবি পণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণ(ন)রত্নাকরে সে নাম কিছু কিছু পাওয়া যায়। রেশমি ও সূতি কাপড়ের মধ্যে 'গঙ্গাসাগর', আর স্থুতি কাপড়ের মধ্যে 'গাঙ্গৌর' (<গঙ্গাপুর=গঙ্গাজলি), 'সিলহট্টি', 'দ্বারবাসিনী', এবং নির্ভূষণ (অর্থাৎ কাজ-না-করা) কাপড়ের মধ্যে 'বঙ্গাল', 'কমরুবাল' ও 'কাঠিবাল' (অর্থাৎ কড়িয়াল) এদেশের উৎপন্ন বলেই বোধ হয়। সর্বানন্দ বলেছেন 'মমল্ল' ক্ষৌম দুকূল এবং 'রাল্ল' কম্বল। 'রুগুপট্ট' কম্বল-উড়ানি বা শাল। এখনকার জামার পকেটের স্থানে সেকালে ছিল 'গঞ্জা' (আধুনিক 'গেঁজে'), কোমরে বেল্টের মতো বাঁধা হ'ত।

কারুকার্য করা বড় টুপিকে বলত, এখনকার বরের টোপরের মতোই, 'টোপর' (সর্বানন্দ)। আর শিরোবেষ্টন ছিল এখনকার কনের সিঁথি-মউড়ের মতোই 'মউড়' (সংস্কৃত 'মুকুট' থেকে।

সেকালে মেয়ে পুরুষে সমান অলঙ্কারপ্রিয় ছিল। পায়ের পাইজোর ছাড়া (—নটেরা তাও পরত—) এখনকার দিনে মেয়েলি ব'লে পরিচিত সব গয়নাই সেকালে ধনী ও বিলাসী পুরুষেও পরত। তার অজস্র প্রমাণ আছে স্থাপত্যে চিত্রে এবং সাহিত্যে। সোনারূপা দুর্লভ ছিল, স্থুতরাং সাধারণ ঘরের মেয়েরা পিতলের গয়না পরত। কানে কচি তালপাতার বালা পরা সেকালে এদেশের মেয়েদের একটা বিশেষ রুচি ছিল। এদেশের আর একটা বিশেষ নারীভূষণ ছিল সরু, স্থুতলি হার ("সুতের হার")। কণ্ঠলগ্ন হার ছিল 'কণ্ঠিকা' (<কণ্ঠী, কাঁঠি)। লম্বা হারের ছড়ার সংখ্যা অনুসারে নাম—দোসরি, তেসরি, সাতসরি (<সপ্তসরিকা, পরে এর থেকে হয়েছে "শতেশ্বরী")। আরও বেশি ছড়া হলে বলত 'দেবচ্ছন্দ'। লকেটের মতো স্বর্ণমুদ্রা ('নিষ্ক',

'দীনার') লগ্ন থাকত। কানে কুণ্ডল[১], উপরের হাতে "তাড়" ('তাড়ঙ্ক', কেয়ূর) অথবা 'বাহুখড়' (=বাহু-খাড়ু), এবং প্রকোষ্ঠে বালা (পুরুষ হ'লে) অথবা বালা ও চুড়ি (মেয়ে পুরুষ দুইয়েরই বেলা)। চুড়ি এখনকার মতোই নানারকমের ছিল।[২] সোনার গয়নায় হীরা মুক্তা পলা ইত্যাদি বসানো হ'ত। নিতান্ত গরীব পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা কুঁচের হার ("গুঞ্জা-হার") পরত। ঝাঁপটার নাম ছিল 'মুখখণ্ডা' (সর্বানন্দ)। 'হংসপদিকা' সিঁথিপাটী।

চোখে কাজল ও কপালে টিপ দেওয়া হ'ত 'কালিয়া' দিয়ে (সর্বানন্দ)। ধনী ঘরের এবং বিলাসিনী নারীরা খোঁপার ("খোপ্যক") খুব বাহার ফলাত। ভাস্কর্য আর চিত্র থেকে প্রধানত দুরকম ধম্মিল্ল-বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। এক হ'ল বড় ঝুটি করা, কান ঢাকা। পরবর্তী কালে—বাংলা সাহিত্যে—এ খোঁপাকে "কানড়" বা "কানড়ি" খোঁপা বলা হয়েছে। (এ রীতি খুব পুরানো, কর্ণাটের সঙ্গে শব্দটির কোনই সম্পর্ক নেই। শব্দটি এসেছে 'কর্ণপট' থেকে।) আর এক হ'ল মাথায় উঁচু করে ঝুঁটি করা 'শিখণ্ড'। ঝুঁটির উপরে পুঁটে ('আমলক') অথবা ফুল বাঁধা থাকত এবং ফুলের মালা জড়ানো হ'ত। সধবা মেয়েরা যে সিঁদুর পরত (অন্তত দ্বাদশ শতাব্দীতে) তা লক্ষ্মণ-সেনের সভার এক প্রধান কবি-পণ্ডিত গোবর্ধন আচার্যের শ্লোক থেকে জানা যায়।

বন্ধনভাজোঽমুষ্যা শ্চিকুরকলাপস্য মুক্তমালস্য।
সিন্দূরিতসীমন্তচ্ছলেন হৃদয়ং বিদীর্ণমেব॥

'এই নারীর মুক্তামালায় আবদ্ধ কেশপাশ যেন (অবমানিত হ'য়ে) সীমন্তের সিন্দূররেখায় বিদীর্ণহৃদয় হয়েছে॥'

সদুক্তিকর্ণামৃতে সঙ্কলিত অজ্ঞাতনামা কবির একটি শ্লোকে বঙ্গ-বিলাসিনীদের বর্ণনা রয়েছে।

[১] টেপা হ'লে 'তাড়ঙ্ক'। [২] ভাস্কর্য ও চিত্র দ্রষ্টব্য।

বাসং সূক্ষ্মং বপুষি ভুজয়োঃ কাঞ্চনী চাঙ্গদশ্রীর্
মালাগর্ভঃ সুরভিমসৃণৈর্গন্ধতৈলৈঃ শিখণ্ডঃ।
কর্ণোত্তংসে নবশশিকলানির্মলং তালপত্রং
বেশঃ কেষাং ন হরতি মনো বঙ্গবারাঙ্গনানাম্ ॥

'পরিধান মিহি কাপড়, উপর হাতে সোনার তাড়, মাথার উপর গন্ধতৈলে মাখা মসৃণ চূড়া-খোঁপায় মালা জড়ানো, কানে নূতন চন্দ্রলেখার মতো তালপাতার কর্ণভূষণ।—বঙ্গ-বারাঙ্গনাদের এই বেশ কার মনোহরণ না করে॥'

মেয়েরা ললাটে ফোঁটা কাটত চিত্রবিচিত্র ক'রত কাজল দিয়ে। সে কাজলের রঙ ছিল হলদে। তাকেও বলত সর্বানন্দের সময়ে 'কালিয়া' (সংস্কৃত 'কালেয়ক' থেকে)॥

৯

যান-বাহন

মানুষে বোঝা বইত মাথায় ক'রে কিংবা কাঁধে বাঁকে নিয়ে ('বীবধ')। এইভাবে ঘরে ঘরে জিনিস বিক্রি করাও হ'ত, হাট থেকে এনে। ধর্মদাসের একটি ভাষামিশ্র ছড়ায় এ ব্যাপারের ইঙ্গিত পাই।[১] গোরুর গাড়ি ছিল নিশ্চয়ই, তবে নৈসর্গিক কারণে এদেশের সর্বত্র গোরুর গাড়ির উপযোগী পথ ছিল না। সদাগরদের মালবোঝা সাধারণত গোরুর পিঠে ছালায় ক'রে বওয়া হ'ত। মাঠ থেকে ফসলও ঘরে তোলা হ'ত গোরুর পিঠে। লাঙ্গল টানা ভার বহা ইত্যাদি কাজের জন্য ষাঁড় বাছুরকে নপুংসক করা হ'ত। তাকে বলত 'দাম্বোড়' (সর্বানন্দ; আধুনিক দামড়া)।

যানবাহনের মধ্যে নৌকা ছাড়া উল্লেখ পাওয়া যায় এই কটির,—'ঝাঁপান' (অর্থাৎ পাল্‌কি ; < * যাপ্যযান, অর্থাৎ সুখে যাওয়ার যান) এবং নারী-বহনযোগ্য 'কোল্লীয়ক' ও 'ঢল্লরিকা' (=ঢাকা ডুলি ? সর্বানন্দ)। রথের উল্লেখ মাত্র আছে একটি চর্যাগানে (১৪)।

সেকালে দূর পাল্লার প্রধান যান ছিল নৌকা। নৌকার অনেক রকম ভেদ ছিল আকৃতি-প্রকৃতি অনুসারে। ছোট নৌকা 'নাবড়ী' (< *নাবটিকা), সমুদ্রগামী নৌকা 'বহিত্র' (পরবর্তীকালে "বুহিত")। মাস্তুল 'গুণরুক্‌খ' (< গুণবৃক্ষ)। মাস্তুলের শীর্ষে চামরের মতো ধ্বজা থাকত।[২] হাল ও দাঁড় একত্র—'কাণ্ড', শুধু হাল—'নাহি' (<নাভি), 'পতবাল' (< পাত্রপাল ; চর্যা)—পাল, ইত্যাদি।

[১] "হাণ্ডীকুণ্ডী আনেসি ন বড়া কীস অঙ্কার অথং" ('ওরে বেটা, কেন আমার জন্যে হাড়িকুঁড়ি আনিস নি ?')। আগে পৃ ২৩৯ দ্রষ্টব্য।

[২] নিদর্শনে দ্রষ্টব্য। মুকুন্দরামের কাব্যে সমুদ্রগামী ডিঙ্গার মাস্তুলে চামরধ্বজের উল্লেখ আছে।

অগভীর জলে অথবা সঙ্কীর্ণ খালে নৌকা গুণে টানা হ'ত (চর্যা ৩৮) পোতাধ্যক্ষ 'নিজাবা' বা 'নিজিরা' (সর্বানন্দ; < নির্যামক)। দূর সমুদ্রগামী পোতে কাক নেওয়া হ'ত নিকটে স্থল আছে কিনা জানবার জন্যে ("বোহিঅ-কাউ", দোহাকোষ)। নিকটে স্থল থাকলে কাক ফিরে আসত না, না থাকলে পোতে ফিরে আসত। নদীর এপার ওপার সৈন্য অথবা বহু লোক চলাচলের জন্যে পাশে পাশে নৌকা সাজিয়ে সাঁকো করা হ'ত। তাকে বলত 'নৌবাটক'॥

১০

আমোদ-প্রমোদ

সেকালে বাজনা বাদ্য অনেকরকম ছিল। শুষির অর্থাৎ মুখবাদ্য ছিল বাঁশী, শাঁখ, সিঙ্গা, 'কাহল' (সর্বানন্দ), 'কসাল' (চর্যাগান)। তন্ত্রীবাদ্য ছিল সপ্ততন্ত্রী 'সবরসিআ' (সর্বানন্দ), চণ্ডালবীণা 'কিন্দরা' (সর্বানন্দ) এবং একতারা। একতারা বীণার বর্ণনা আছে একটি চর্যাগানে (১৭)। আতোদ্য অর্থাৎ চর্মাচ্ছাদিত বাদ্য ছিল অনেকরকম।—ডমরু, বড় ডমরু 'চুচুঙ্ক' বা 'মড্ডু' (সর্বানন্দ), ছোট ডমরু 'ডমরুলি' (চর্যা); ডিণ্ডিম 'ডেঙ্গুরী' (বা 'ডেঙ্গুনী'), দুন্দুভি ('দুন্দুহি'), পটহ (পড়হ), মর্দল ('মাদলা'); গানে তাল দেবার ঢোল বা মৃদঙ্গ—'হুডুক্ক' ("গায়ন-পটহ" সর্বানন্দ); 'করড়', 'করণ্ড' করতাল; ঘণ্টা, 'ঘাঘরী' ("ক্ষুদ্রঘন্টিকা"), ইত্যাদি।

সেকালেও লোকে ঢাকঢোল বাজিয়ে বর নিয়ে যেত বিবাহ দিতে। তার বর্ণনা আছে এক চর্যাগানে (১৯)। বর্ণনাটি এই,

ভবনিব্বাণে পড়হ-মাদলা
মণপবণ বেণি করণ্ড-কসালা।
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ্ উছলিআঁ
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিলা।

সেকালের খেলাধূলার কোন বর্ণনা এমন কি হদিসও পাওয়া যায় না, হরিণশিকার অথবা মল্লক্রীড়া ছাড়া। তবে তার শুধু ইঙ্গিত মাত্র পাই। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই হয়ত শিকারের জন্যে কুকুর পোষার ফেশন শুরু হয়েছিল। সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লোকে তার উল্লেখ আছে।

অবসর বিনোদনের জন্য লোকে চতুরঙ্গ ও পাশা খেলত। পাশা-খেলা আমাদের দেশে শকদের আমল থেকে (?) প্রচলিত হয়েছিল। চতুরঙ্গ সম্ভবত আমাদের দেশের মৌলিক ক্রীড়া। একটি চর্যাগানে চতুরঙ্গ খেলার ভালো বর্ণনা আছে (১২)। সর্বানন্দ বলেছেন যে কোন কোন অঞ্চলে দাবার পিঁড়িতে পাশাও খেলা হয়॥[১]

[১] "দেশান্তরে চতুরঙ্গস্যৈব পীঠিকায়াং শকদ্যূতকমপি প্রবর্ততে।"

নিদর্শনে

১

অশোক নির্মিত গুহাঘর (গয়ার নিকটে বরাবর পাহাড়ে)। দরজার কাঠামো ও নক্‌সা লক্ষণীয়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে দরজার কারুকার্য পরবর্তী কালের সংঘটন। পূর্বভারতে মনুষ্য গৃহাবাসের সবচেয়ে পুরানো নিদর্শন। অশোকের মতো তাঁর নাতি দশরথও এখানে কয়েকটি গুহাঘর করিয়েছিলেন 'আজীবিক' (অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন) সন্ন্যাসীদের বর্ষা-যাপনের জন্যে। একথা গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ আছে।

২

পাহাড়পুরের নিকটে মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত শিলাচক্রলেখ। প্রাপ্তিস্থান —প্রাচীন পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত ছিল। লিপির ছাঁদ অশোকের অনুশাসনের মতো। সুতরাং খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর। বঙ্গভূমিতে প্রাপ্ত প্রাচীনতম লেখ। ভাষা অশোকের সমকালীন প্রাচ্য প্রাকৃত।

৩

গোরখপুর জেলায় সোহ্‌গৌরা গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রপট্টলেখ। বিষয় মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত শিলালেখের অনুরূপ। লেখের শীর্ষের চিত্রগুলি কৌতূহলোদ্দীপক। বাঁশের খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত খড়ের আটচালার ছবি দুটি লক্ষণীয়। বৃক্ষ-পূজার নিদর্শনও লক্ষিতব্য। লিপিছাঁদ স্পষ্ট, মনে হয় তাম্রলেখটি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর কিছু আগেরও হ'তে পারে। (বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির ১৮৯৪ সালের কার্যবিবরণী থেকে।)

৩

৪

বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়া পাহাড়ের উপরদিকে গুহাচিত্র ও লিপি। পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মা এই গুহায় বিষ্ণুচক্র উৎকীর্ণ ক'রে দেবত্র ক'রেছিলেন। বিষ্ণুচক্রের ছবি দ্রষ্টব্য। লিপিছাঁদ অনুসারে কাল চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী। পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত প্রাচীনতম প্রত্নলেখ। (শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁকুড়ার পুরাকীর্তি থেকে।)

৫

বর্ধমান জেলায় গলসীর নিকটে মল্লাসারুল গ্রামে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রপট্টের মুদ্রা (পঞ্চম শতাব্দী)। পিছনে কাল-রথচক্র, সম্মুখে অশ্বের পিছনে ধর্মসূর্যমূর্তি। (সাহিত্য পরিষৎপত্রিকা থেকে।)
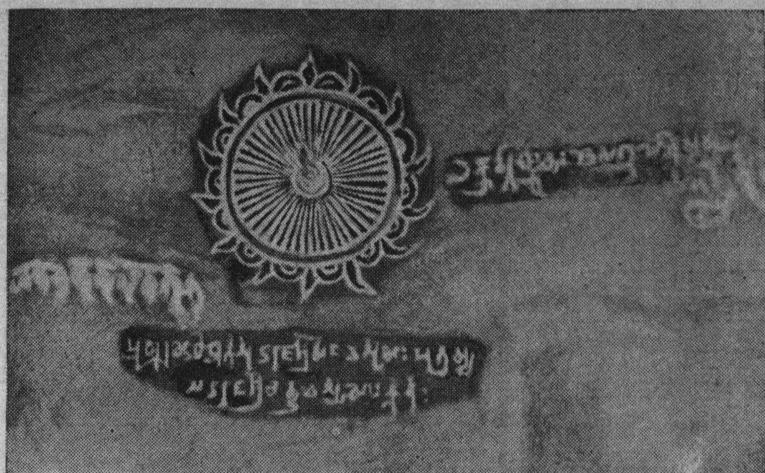
৪

৫

৬

আধুনিক বাংলাদেশের সিলেট জেলায় মৌলবীবাজার মহকুমার অন্তর্গত কালীপুর গ্রামে প্রাপ্ত মরুণ্ডনাথের তাম্রপট্টের মুদ্রা (সপ্তম শতাব্দী)। প্রস্ফুট পদ্মের উপর দণ্ডায়মান গজলক্ষ্মীর মূর্তি, দুটি হাতি দু'দিকে অভিষেক করছে, দু'পাশে উপবিষ্ট দু'সেবক পূজা ও সেবা করছে। তলায় মুদ্রালিপি "কুমারামাত্যাধিকরণস্য"। দক্ষিণে উপবিষ্ট মূর্তির পিঠে গোল করা গর্ত্তের মধ্যে উপরে উপবিষ্ট বৃষলাঞ্ছন, তার নীচে লিপি "শ্রীমরুণ্ডনাথস্য"। বোঝা যাচ্ছে কুমারামাত্যাধিকরণের উপরিক বা নিযুক্তক স্বাধীন হ'য়ে সেই মুদ্রা ব্যবহার করেছিলেন। (গুপ্তের কপারপ্লেট্‌স্ অব্ সিলেট থেকে।)

৭

শ্রীহট্টে ময়নামতীতে প্রাপ্ত লডহচন্দ্রের অন্যতম তাম্রপট্টে ধর্মচক্র-প্রবর্ত্তন মুদ্রা। এই রকম মুদ্রা বৌদ্ধ রাজবংশগুলির বিশিষ্ট লাঞ্ছন। মুদ্রায় রাজার নাম আছে, "শ্রীলডহচন্দ্রদেব"। দশম-একাদশ শতাব্দী। (সরকারের এপিগ্রাফিক ডিস্‌কভারিজ ইন্ ইষ্ট পাকিস্থান থেকে।)

৬

৭

৮

তর্পনদিঘিতে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের তাম্রপট্টে সদাশিব মুদ্রা। সদাশিব অষ্টভুজ, প্রসন্নমূর্তি। এই মুদ্রা ছিল সেন-বংশের লাঞ্ছন। দ্বাদশ শতাব্দী। (মজুমদারের ইন্‌স্‌ক্রিপ্‌সন্‌স্‌ অফ্‌ বেঙ্গল থেকে।)

৯

বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত চৈতনপুরে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তি (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে রক্ষিত)। দেবতার পরিহিত খাটো বহরের "শাটক" মূর্তিটির প্রাচীনত্বের দ্যোতক। এদেশে উৎপন্ন বস্ত্রের সবচেয়ে পুরানো নিদর্শনের ছবি ব'লে মূল্যবান। নীচে পাশের মূর্তি দু'টি হ'ল গদা (নারীরূপে) ও চক্র (পুরুষরূপে)। (ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইতিহাস প্রথম খণ্ড থেকে।)

৮

৯

১০

মালদহ মিউজিয়মে রক্ষিত চতুর্ভুজ লোকনাথ মূর্তি। পরিধানে বড় বহরের "শাটক" লক্ষণীয়। অলঙ্কারগুলিও দেখবার মতো। নবম-দশম শতাব্দী। (শ্রীমান্ সুনীল ওঝার সৌজন্যে।)

১১

বরিশাল জেলার হবিবপুরে প্রাপ্ত পিত্তলের শিবমূর্তি। দেবতার উষ্ণীষের উপরে ধ্যানী-বুদ্ধ (বা লোকনাথ) মূর্তি লক্ষণীয়। বৌদ্ধ মতকে বাইরে স্বীকার ক'রে ভিতরে ভিতরে ব্রাহ্মণ্য মতের প্রসারের এক ভালো উদাহরণ। একাদশ শতাব্দী ব'লে অনুমিত। (আশুতোষ মিউজিয়মের সৌজন্যে।)

১০

১১

১২
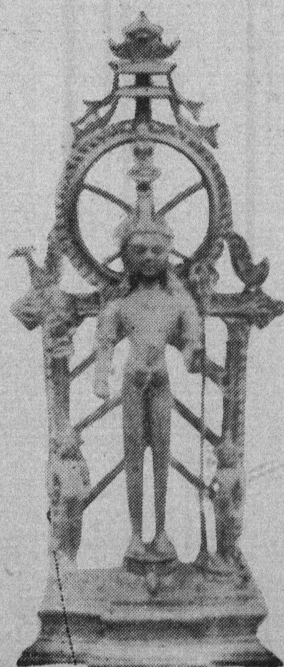
রাজসাহী দেওপাড়ায় পত্নমসর থেকে প্রাপ্ত ভগ্ন গঙ্গামূর্তি। মনে হয় বিজয়সেন প্রতিষ্ঠিত প্রত্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের এক অলঙ্করণ ছিল এই মূর্তিটি। এখন রাজসাহী মিউজিয়মে রক্ষিত। মূর্তিতে অলঙ্কারের পারিপাট্য লক্ষণীয়। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার হ'ল দৃঢ় কুচবন্ধনী (কাঁচুলী বেল্ট্) আর নথ। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী। (ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইতিহাস প্রথম খণ্ড থেকে)।

১২

১৩-১৪

পাহাড়পুরের স্তূপ (বিধ্বস্ত সোমপুর বিহার) থেকে প্রাপ্ত যোগীর মূর্তি। যোগী শীর্ণকায় কঙ্কালসার। মাথায় দীর্ঘকেশ কুণ্ডলী করা, দাড়ি, কান লম্বা ফাটা, গলায় হাড়ের মালা, উপবীতের মতো পরা যোগপট্ট (প্রথম চিত্রে), কোমরে কৌপীন (দ্বিতীয় চিত্রে)। প্রথম ছবিতে যোগী উপবিষ্ট, পুথি পঠন অথবা ব্যায়ামরত। দ্বিতীয় ছবিতে যোগী ভারবোঝা কাঁধে নিয়ে চলেছেন, হাতে "দ্বাদশ" (অর্থাৎ যোগীর দণ্ড)। অষ্টম-নবম শতাব্দী। (ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইতিহাস প্রথম খণ্ড থেকে।)

১৩

১৪

১৫

পাহাড়পুরের স্তূপে প্রাপ্ত কৃষ্ণের যমলার্জুনভঙ্গের চিত্র। কৃষ্ণের কণ্ঠে শিশুজনোচিত "ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি" হার দ্রষ্টব্য। মাথায় ঘোড়চুলও লক্ষণীয়। অষ্টম-নবম শতাব্দী। (দীক্ষিতের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে মেময়ার্‌স্ থেকে।)

১৬

পাহাড়পুরের স্তূপে প্রাপ্ত, একটি গল্পের চিত্ররূপ। রাজসভায় সুকণ্ঠ গায়ক গান করছিল। সেই সময়ে সন্নিকটে কূপে এক নারী কোলের ছেলেকে নিয়ে জল তুলতে এসেছিল। গানে তন্ময় হ'য়ে সে কলসীর গলায় দড়ি না বেঁধে ছেলের গলায় দড়ি দিয়ে কূপে নামিয়েছিল। এই গল্প সেকশুভোদয়ায় আছে। অষ্টম-নবম শতাব্দী। (দীক্ষিতের গ্রন্থ থেকে।)

১৬

১৫
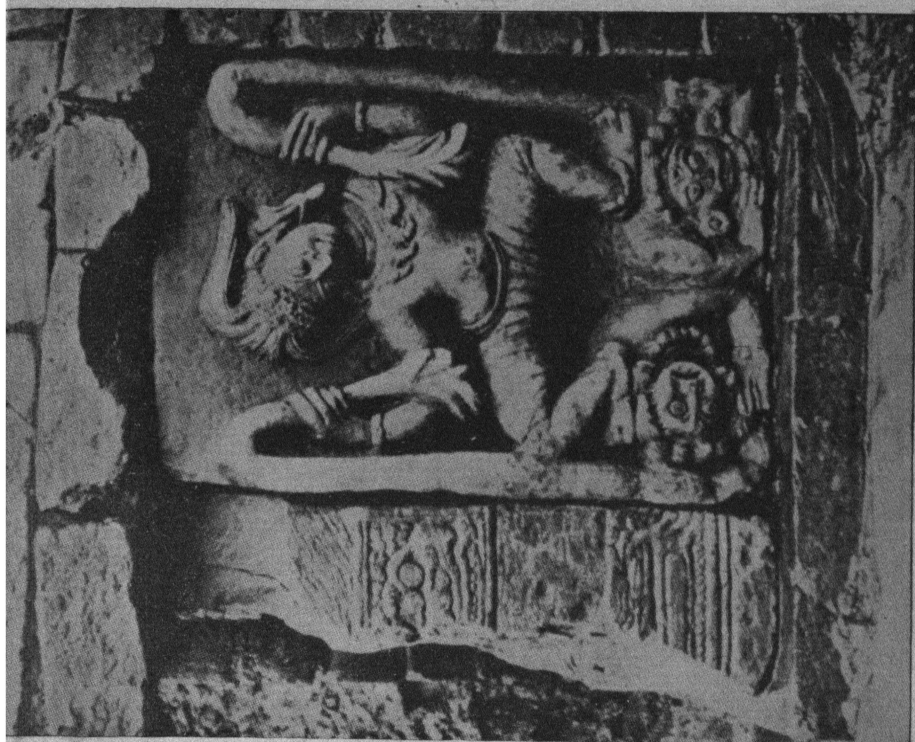
১৭

পৌণ্ড্রবর্ধনে ত্রিশরণ (বুদ্ধ) ঠাকুরের ছবি। মাহাত্ম্য ও মর্যাদা অনুসারে এই স্থান দ্বিতীয় ("দ্বিতীয় আরিষস্থান")। মূর্তির পিছনে মন্দিরের সম্মুখভাগ লক্ষণীয়। দশম-একাদশ শতাব্দী। (ফুসে-র এত্যুদ্ স্যুর্ ল্-ইকনগ্রাফী বুধিস্তিক্ দ ল্ এঁ্যাদ থেকে।)

১৮

বরেন্দ্রীতে মৃগস্থাপন স্তূপ। স্তূপের দু'পাশে উপাসক-ভিক্ষুদের পরিধেয় লক্ষণীয়। দশম-একাদশ শতাব্দী। (ফুসে-র গ্রন্থ থেকে।)

১৯

রাঢ়দেশে কন্থারাম গ্রামে (অথবা' ভিক্ষুণী বিহারে) লোকনাথ। দেবতামূর্তি গৃহমধ্যে অদৃশ্যপ্রায়, স্তূপই প্রধান দ্রষ্টব্য। দেবগৃহের (অথবা বিহারশালার) চিত্র সেকালের ধনী ব্যক্তির বাসগৃহের অনুরূপ। দশম-একাদশ শতাব্দী। (ফুসে র গ্রন্থ থেকে।)

১৭

১৮
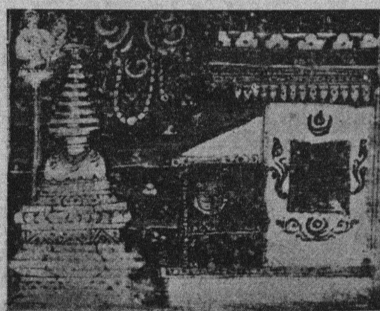
১৯

২০

তুলাক্ষেত্র বর্ধমান স্তূপ। "আরিষ" স্থান। দশম-একাদশ শতাব্দী (ফুসে-র বই থেকে।)

২১

পট্টিকেরে মনোরম মন্দিরে বৌদ্ধ মহাযান তান্ত্রিক মতে উপাস্য দেবী চুন্দার ছবি। দেবীর ষোল হাত। পরিধান কাজকরা বসন দ্রষ্টব্য। দশম-একাদশ শতাব্দী। (ফুসে-র বই থেকে।)

২২-২৩

চব্বিশপরগনায় বসিরহাটের দিকে বেড়াচাঁপায় ও ডায়মণ্ড-হারবারের দিকে হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত মাটির মুদ্রায় ছাপা সমুদ্রগামী নৌকার চিত্র। লিপি আছে, পড়া যায় নি। প্রথম চিত্রে মাস্তুলের আগায় চামর বাঁধা আছে বায়ুপ্রবাহের দিক্‌নির্ণয়ের জন্য। দ্বিতীয় চিত্রে মাস্তুলের দড়াদড়ি লক্ষণীয়। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী? (আশুতোষ মিউজিয়মের সৌজন্যে।)
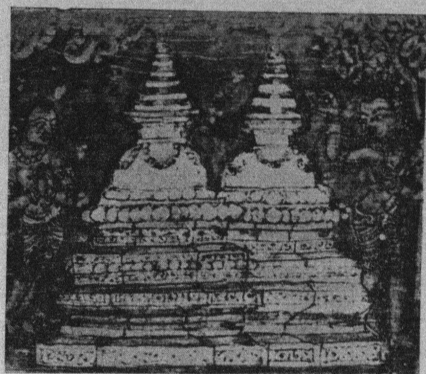
২০

২১

২২

২৩

২৪

ময়নামতীতে খনন ক'রে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ বিহার থেকে প্রাপ্ত ভিক্ষুদের ব্যবহৃত শিল-নোড়ার চিত্র। নবম-দশন শতাব্দী। (পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত ময়নামতী পুস্তিকা থেকে।)

২৫

ময়নামতীতে আবিষ্কৃত, ভিক্ষুদের ব্যবহৃত মাটির তিজেল। নবম-দশম শতাব্দী। (উক্ত ময়নামতী পুস্তিকা থেকে।)

২৬

ময়মামতীতে আবিষ্কৃত, ভিক্ষুদের কক্ষে প্রাপ্ত মাটির দেরখো ও প্রদীপ। নবম-দশম শতাব্দী। (উক্ত ময়নামতী পুস্তিকা থেকে।)

২৭

বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে মশাগ্রাম রেলষ্টেশনের অনতিদূরে আজাপুর গ্রামের নিকটবর্তী দেউলে (বা সাত-দেউলে) গ্রামে অবস্থিত ইষ্টক-নির্মিত প্রাচীন ভগ্ন-মন্দির। দশম-একাদশ শতাব্দী? (শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের সৌজন্যে।)
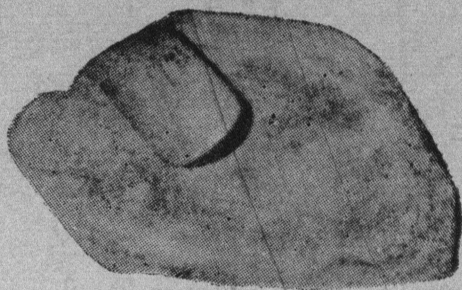
২৪
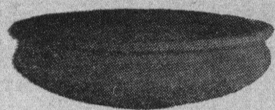
২৫

২৬
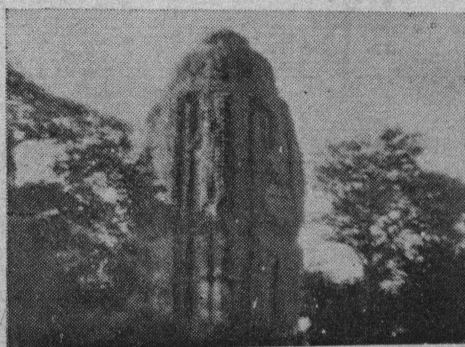
২৭

সংযোজন-সংশোধন

পৃষ্ঠা ৮

উনিশ ছত্রে 'পৌণ্ড্রবর্ধন' স্থলে 'পুণ্ড্রবর্ধন' পড়তে হবে। পুণ্ড্রবর্ধন নগরের নাম। দেশের নাম 'পৌণ্ড্রবর্ধন' অর্থাৎ পুণ্ড্রভূমি। পরবর্তী কালে 'পৌণ্ড্রবর্ধন' নগর ও দেশ দুই বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

পৃষ্ঠা ৩২

পাদটীকার দ্বিতীয় ছত্রে 'ছিল' স্থলে 'হ'ল' পড়তে হবে। 'ধুতি' পরবর্তী কালের শব্দ, প্রাচীন (সংস্কৃত) রূপ ছিল 'ধৌতিক' অর্থাৎ যা মাঝে মাঝে ধুতে বা কাচতে হয়। বোঝা যাচ্ছে যে 'শাটক' কাচা হ'ত না—রঙীন ও শক্ত বুননি ব'লে।

পৃষ্ঠা ৫১

ইতিমধ্যে পঞ্চম শতাব্দীর আর একটি প্রত্নলিপি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়েছে, সুতরাং অষ্টম ছত্রে 'চোদ্দ' স্থানে 'পনেরো', দশম ছত্রে 'তিনটি' স্থানে 'চারটি' এবং একুশ ছত্রে 'তেরোটিই' স্থানে 'চোদ্দটিই' আর 'আটটি' স্থানে 'নটি' পড়তে হবে।

পৃষ্ঠা ৫২

চতুর্থ ছত্রের পরে এইটুকু যোগ হবে,—'২ক ১২৮ গুপ্তাব্দে জগদীশপুর (রাজশাহী) তাম্রশাসনপট্ট।'

এই তাম্রশাসনটি দ্বিতীয় তাম্রশাসনের প্রায় সমকালের এবং সমস্থানবর্তী। এতে দুটি জৈন বিহারে ও একটি সূর্য ঠাকুরের দেবকুলে ভূমিদানের কথা আছে। (শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকারের *Epigraphic Discoveries in East Pakisthan,*

পৃষ্ঠা ৫৯

দ্বিতীয় পাদটীকায় '১১ পাটক=৫৫ বিঘা' পড়তে হবে।

পৃষ্ঠা ৬৩

দ্বাবিংশ ছত্রে 'বপ্পঘোষবাট' পড়তে হবে।

পৃষ্ঠা ৭৮

নবম পঞ্চদশ ও একবিংশ ছত্রে 'সংঘারাম' পড়তে হবে।

পৃষ্ঠা ৮০

দশম ছত্রে 'নির্গ্রন্থ' পড়তে হবে।

পৃষ্ঠা ১১৪

সপ্তম ছত্রে 'ত্রিভুবনপাল অথবা দেবপাল' পড়তে হবে।

পৃষ্ঠা ১৩৬

পাদটীকায় 'মুহম্মদ বখ্‌ত্যার' পড়তে হবে।

পৃষ্ঠা ১৩৭

দ্বিতীয় পাদটীকা বর্জনীয়। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ হাজরা আমাকে জানিয়েছেন যে মঙ্গলকোটের কাছে অজয়ের সন্নিকটে ব্রাহ্মণী নদীর ধারে প্রাচীন সাঁকোনা গ্রাম আছে। এ গ্রাম পুরানো ও মুসলমান অধ্যুষিত। এই সাঁকোনা Sankanat হ'তে পারে। মঙ্গলকোটে প্রাচীন সৌধের ধ্বংসস্তূপে রাখালদাস 'চন্দ্রসেন' রাজার নামযুক্ত প্রস্তর-ফলক খণ্ড পেয়েছিলেন। সুতরাং এখানে সেন-বংশের যোগাযোগ ছিল। লক্ষ্মণসেন সম্ভবত গঙ্গার উজানে অজয় ধ'রে চলে এসেছিলেন।

১৯৮

ভট্ট ভবদেব বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বিজয়সেন করেছিলেন শিবমন্দির। প্রতিষ্ঠান দুটিতে সুন্দরী বারবিলাসিনী নিয়োগ সম্বন্ধে প্রশস্তিদ্বয়ে যে উল্লেখ আছে তা বিবেচনার যোগ্য ব'লে এখানে উদ্ধৃত করছি।

ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তিকার বাচস্পতি লিখেছেন,

এতস্মৈ হরিমেধসে বসুমতীবিশ্রান্তবিদ্যাধরী-
বিভ্রান্তিং দধতীঃ শতং স হি দদৌ শারঙ্গীশাবীদৃশঃ।
দগ্ধস্যোগ্রদৃশা দৃশৈব দিশতীঃ কামস্য সংজীবনং
কারাঃ কামিজনস্য সঙ্গমগৃহং সঙ্গীতকেলিশ্রিয়াম্॥

'সেই চিদাত্মা হরিকে তিনি দান করেছিলেন শতসংখ্যক তরুণহরিণাক্ষী যারা মর্ত্যে অবতীর্ণ বিদ্যাধরীর ভ্রান্তি উৎপাদন করে, রুদ্রনেত্রে দগ্ধ কামকে যারা কটাক্ষেই উজ্জীবিত করতে পারে, যারা কামুকদের বন্দীশালা, যারা সঙ্গীত-কলাবিলাসের মিলনবাসর॥'

বিজয়সেনের প্রশস্তি-রচয়িতা উমাপতিধর লিখেছেন,

উচ্চিত্রাণি দিগম্বরস্য বসনান্যর্ধাঙ্গনাস্বামিনো
রত্নালংকৃতিভি বিশেষিতবপুঃশোভাং শতং সুভ্রুবঃ।
পৌরাঢ্যাশ্চ পুরীঃ শ্মশানবসতে র্ভিক্ষাভুজোঽস্যাক্ষয়াং
লক্ষ্মীং স ব্যতনোদ্ দরিদ্রভরণে সুজ্ঞো হি সেনান্বয়ঃ॥

'দিগম্বর যিনি, অর্ধনারীর স্বামী, বসতি যাঁর শ্মশানে, ভিক্ষা যাঁর জীবিকা,—তাঁকে বিচিত্র বসন, শতসংখ্যক রত্নালঙ্কারভূষিত সুন্দরী ও পরিজনপূর্ণ পুরী দিয়ে ঐশ্বর্যবান্ করলেন সেনবংশীয় রাজা। দরিদ্রকে ভরণ করতে তিনি অভিজ্ঞ॥'

নটী-দেবদাসীরা কালিদাসের কালে যেমন বাচস্পতি-উমাপতির কালেও তেমনি পণ্যস্ত্রী ছিল।

পৃষ্ঠা ২১৮

বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে অবগত হ'য়ে মিন্হাজুদ্দীন লিখেছেন যে লক্ষ্মণসেন অত্যন্ত সহৃদয় ও দানশীল রাজা ছিলেন। তাঁর কাছে চেয়ে কেউ কখনো প্রত্যাখাত হয় নি। লক্ষ্মণসেনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মিন্হাজ পরলোকে কাফের রাজার শাস্তি যাতে কম হয় তার জন্যে আল্লার কাছে প্রার্থনা করেছেন।

পৃষ্ঠা ২৪০

জুমর-নন্দী সম্ভবত কোন গোয়ীচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র ?) রাজার ‘ঔত্থিতাসনিক’ ছিলেন। বিশিষ্ট কোন কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি রাজসভায় আগমন করলে রাজা সিংহাসন থেকে উঠে সংবর্ধনা জানাতেন। রাজসভায় যাঁরা এই সম্মানের অধিকারী হ’তেন তাঁদের বলত ‘ঔত্থিতাসনিক’। এই অভিধেয়টি পরবর্তী কালেও প্রচলিত ছিল। ধর্মঠাকুরের গাজন-অনুষ্ঠানে যাঁরা অংশগ্রহণ ক’রতেন, তাদের নামে সেকালে রাজ্যসভার অনেক পদিকের অভিধেয় দেখা যায়। তাঁদের একজন হ’লেন ‘উঠ্যাসিনী’ (<ঔত্থিতাসনিক)।

পৃষ্ঠা ২৬৪

সর্বানন্দের টীকাসর্বস্বে উদ্ধৃত একটি শ্লোক অনুসারে বলা যায় যে সেকালে পুতুল-নাচ হ’ত এবং নাচের ও খেলনার পুতুল তৈরি হ’ত কাঠ কাপড় হাতির দাঁত চামড়া ও মাটি দিয়ে॥

বিশিষ্ট শব্দ-সূচি

তারকা-চিহ্ন পাদটীকার নির্দেশক

অক্ষুদ্র-প্রকৃতি ৬২*
অম্বষ্ঠ ২৭৮
অগ্রহারিক ৫৮*
আযুক্তক ৫৫
উপরিক ৫৪
ঔখিতাসনিক ৩৩৫
ঔর্ণাস্থানিক ৫৯
কজঙ্গল ২৯
করণ ৯২, ২৭৭
কল্তিস্ (Caltis)
৪৫-৪৬
কায়স্থ ৬৫, ২৭৭
কাহলিক ২০৯
কুটুম্বী ৬১
কুলিক ৫৫
কুল্যবাপ ৫৬*
খিল ৫৬*
গঙ্গারিদই ১২*
গাঙ্গে ৪৪
ঘোষ ৩০
চতুরক ৫৫*
টঙ্ক ৪৫-৪৬
দীনার ৬১, ৬৬
দীনারিকা ৬১
দ্রাগড়িক ২০৯
ধুতি ৩২*
নগর ৩০, ২৬৭
নবকর্ম ২১০
নব্যাবকাশিকা ৫৪
নিযুক্তক ৫৪
পাটিক ৫৯
পারশব ৫২*
পার্শ্ব ৬১
পুস্তপাল ৫৬, ৬৫
বঙ্গ ৯
বঙ্গাল ১২*, ১৫
বল্লাল ১৩০
বারিক ২১০
বাসক ৯৪
বীথী ৩০, ৫৫*, ২৭১
বেট্টিক ২০৯
বৈন্য ৫৯*
ব্যবহারিক ৬৩
ভুক্তি ১৪, ৫১
ভ্রাজ ৩১
মহত্তর ৫৬
মহাসামন্ত ৬০
রাঢ়া ৯, ১৭
শাটক ৩২*
সপ্তগ্রাম ৪৫
সমাশ ৩১
সংবাহ ৩০
সাদ্গাঁও ৪৪
সুহ্ম ৯
হট্ট ১৬*
হরিকেল (হরিকাল) ১৬

নির্ঘণ্ট

অঙ্গ ৮
অধিষ্ঠানাধিকরণ ৫৫, ২১১
অনিরুদ্ধ ২০৪-০৫
অবতার-পূজা ১৭৫, ১৭৬
অবলোকিতেশ্বর মূর্তি ৮৫
অভয়ঙ্কর-গুপ্ত ১২০
অভিনন্দ ১১৪
অশোক ২১, ২২, ৩৩
অশ্বঘোষ ১১৩
অষ্টকুলাধিকরণ ৬২*
অষ্টনাগের পূজা ১৭১
আদর্শ ২৯
আর্যভাষা ৩৮-৩৯
আর্যাবর্ত ২৯
আর্যাসপ্তশতী ২১৮-১৯
ই-সিঙ ৮৭-৯১
ইব্‌নে বতুতা ৪৪
উড্ড, উড্র ১৫
উৎকল ৫
উত্তর-রাঢা ১৭
উদীর্ণখড়্‌গ ৯৫
উদ্দাকা ১১৬
উন্মত্তগঙ্গ ১৮
উমাপতিধর ১২৬, ১৩৪, ২১৮,
২৩৩-৩৪, ৩৩৫
একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী ১১৫-৩২
কঙ্কগ্রাম-ভুক্তি ৫১
কজঙ্গল ১৫, ২৯, ৮২
কবিতা-সঙ্কলন ২২০-২১
কর্ণ ১১৬
কর্ণ-সুবর্ণ তাম্রপট্ট ৬৩
কলিঙ্গ ৩
কলিঙ্গ অনুশাসন ১৪৬
কল্কি-অবতার ১৪১, ১৯৫
কল্যাণচন্দ্র ১০৯
কহ্লণ ৯৭
কাদম্বরী দেবকুলিকা ১৫২
কান্তিদেব ১৬*
কামরূপ ৬, ৭৯
কালকবন ২৯
কালরাত্রি ১৭৯, ১৮২
কালাপুর তাম্রপট্ট ৯২-৯৩
কালিদাস ১২, ৩৬
কাহ্নুরদেব ১১৯
কুমারপাল ১২৩
কুমার-রাজ ৭০
কৃষি ২৮৬-৮৭
কৃষ্ণকথা ২৪২-৪৫
কেশবসেন ১২৮, ১২৯, ১৩৯
কোকামুখস্বামী ৬০
কৌতুক-রস ২৩৮-৪১
ক্ষেমেশ্বর ১২০
খড়্‌গ-বংশ ৯৩, ১০৮
খড়্‌গোদ্যম ৯৪, ১০৮
খারবেলের অনুশাসন ৩৬
খেলনার ও নাচের পুতুল ৩৩৬
খ্রীষ্টপূর্ব কাল ২০-৩৩, ১৪৫-৪৯
গঙ্গ(া)রিদই ১১, ১২*
গজলক্ষ্মী ১৭১, ৩১০
গল্পকথা ২৪৮, ৩২২
গাঙ্গে ১২, ১৯, ৪৪
গাঙ্গেটিকা ১২
গাঙ্গেটিকুস ১২
গাঙ্গেয় ৪৪
গাঙ্গেয় বস্ত্র ৪৩
গাঙ্গেয়দেব ১১৫
গুনৈঘর তাম্রপট্ট ৫৯-৬০
গুপ্ত-সংবৎ ৫১*

গুরবমিশ্র ১০৫, ১০৬, ১০৭
গুহাবাস ২৩, ৩০৮
গোপচন্দ্র ৫৩
গোপাল (১) ৯৭-৯৯, ১০১
গোপাল (২) ১০৮
গোপাল (৩) ১২৩
গোবর্ধন আচার্য ১৭১
গোবিন্দচন্দ্র ১০৯
গোবিন্দস্বামী ৬১
গোয়ীচন্দ্র ৩৩৫
গৌড় ৯
গৌতম-দত্ত ১৪১, ১৪৫
গ্রাম-দেবদেবী ১৭০
চক্রপাণি-দত্ত ২০৬
চণ্ডার্জুন ১১৯
চণ্ডী মনসা ও গঙ্গা পূজা ১৭৮-৮৩
চণ্ডেশ্বর ১২০
চন্দ্র ৪৭-৫০
চন্দ্রগুপ্ত (৩) ৬৪
চন্দ্রগোমী ৮৯-৯০, ১১৩, ২০০
চন্দ্রচূড়চরিত ২১৩
চন্দ্রদাস ২০০*
চন্দ্রপুরী বিহার ১১৪
চন্দ্রবর্মা ৪৬-৪৮
চন্দ্রযোগী ৯০
চন্দ্রসেন ১৩৮, ৩৩৪
চন্দ্রাদেবী ১৩৯
চর্চিকা (চর্চা) ১৭৯, ১৮০-৮১
চিত্রমতিকা ১২৩
চুন্দাদেবী ৩২৬
জগদীশপুর তাম্রশাসন ৩৩৩
জয়গুপ্ত ৬৪
জয়দেব ২১৪-১৭
জয়নাগ ৬৩
জয়পাল ১০৫
জয়সিংহ ১১৯
াড় ৯৭
জলচন্দ্র ২৪৬
জলচল ২৯-৩০
জাগদ্দল বিহার ১২০
জাতখড়্গ ৯৪, ১০৮
জাতবর্মা ১১৮, ১২৪
জীবনের প্রতিচ্ছবি ২৩০-৩৫
জীমূতবাহন ২০৫-০৬
জুমর-নন্দী ২৪০, ৩৩৫
জৈন বিহার ৬৬, ১৫৫, ৩৩৩
জৈন মত ৩৫, ৪১, ১৫৫-৫৯
ডোম্মনপাল ১৩৯
তপশ্চর্যা-যান ১৬৯
তবকাৎ-ই নাসিরি ১২৮, ১৩৩
তা-চেঙ-তেঙ ৮৭
তাডাদেবী ১৩৯
তারনাথ ১১১, ১১২, ১১৩, ১২০
তীরভুক্তি ৮
তৈর্থিক ১১৩
তৈলকম্প ১২০
ত্রয়োদশ শতাব্দী ১৩৩-৪২
ত্রিভুবনপাল ১০৪, ৩৩৪
ত্রৈলোক্যচন্দ্র ১০৮-০৯, ২১৩
দক্ষিণ-রাঢ়া ১৭, ১৮
দণ্ড-ভুক্তি ৫১
দামোদরদেব ১৪১
দামোদরপুর তাম্রপট্ট ৫৬-৫৭, ৬২
দিবাকরমিত্র ৭৪, ৯০-৯১
দীপঙ্করশ্রী-জ্ঞান ১১৫
দুর্ঘট-বৃত্তি ২১৬
দেদ্দদেবী ৯৯
দেবকুল-ব্যবস্থা ১৯৬
দেবখড়্গ ৯৪, ১০৮
দেবদত্ত ৮১, ১৬১
দেবপাল ১০৪-০৫, ১১৪, ৩৩৪
দেবপূজা ১৫০-৫৪

দেবরক্ষিত ১১৯
দেবসেন ৩৭
দেশনাম ৩-১৯
দেশান্তরীয় মঠ ২০৯
দ্বোরপবর্ধন ১১৯
ধর্মদাস ২৩৮-৪০
ধর্মপাল ৯৭, ১০০-০৪, ১১১
ধর্মাদিত্য ৫৩
ধোয়ী ২১৪
নগর ও রাজধানী ২৬৭-৭০
নগরশ্রেষ্ঠী ৫৫
নন্ননারায়ণ ১৫১
নবম-দশম শতাব্দী ১০০-১৪
নবাগত ব্রাহ্মণ্য দেবতা ১৭০-৭১
নয়পাল (১) ১০৮
নয়পাল (২) ১১৫-১৬
নরসিংহগুপ্ত ৬৪
নরসিংহার্জুন ১১৯
নরেন্দ্রগুপ্ত ৭৪*, ৭৭
নাটকলক্ষণরত্নকোশ ২৫০
নাট্য-রচনা ২৫০-৫১
"নাথ"-পন্থা ১৬৮
নারায়ণপাল (১) ১০৫, ১০৬, ১০
নারায়ণপাল (২) ১০৮
নারায়ণ-ভদ্র ৬৩, ৬৪
নালন্দ বিহার ১১১
নিদ্রাবলী ১২৯
পঞ্চনগরী ৬১
পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী ৫১-৬৬
পট্টিকের ১৬, ১৭, ১৪০, ৩২৬
পতঞ্জলি ১৮, ২৮-৩৩, ৩৪
পবনদূত ২১৪
পরিধান ও অলঙ্কার ২৯৮-৩০২, ৩১৪, ৩১৬, ৩১৮, ৩২২, ৩২৪
পরিহাস কেশব ৯৭
পাটলীপুত্র ১৮
পাণ্ডুভূমি বিহার ৮৫, ১১২
পালকাপ্য ২০৭
পাল-বংশ ১০০, ১০৯-১০
পীঠী ১১৯
পুণ্ড্র ৮, ৯
পুণ্ড্রনগর ৮
পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি ৫১
পুরখল, পুরস্থল ১৯
পুরুষোত্তমসেন ১৩৯
পুষ্যমিত্র ২৮
পেরিপ্লুস ৪৩-৪৪, ৪৫
পোর্তলিস ১৮
পৌণ্ড্রবর্ধন ৩৫, ৩৩৩
পৌষ-পার্বণ ২২
প্রত্ন-বাংলা কবিতা ২৫৯-৬২
প্রথম চার খ্রীষ্টপর শতাব্দী ৩৪-৫০.
প্রতাপসীহ ১১৯
প্রদ্যুম্নেশ্বর ১২৬
প্রাকৃত প্রত্নলিপি ৬৬
প্রাগ্‌জ্যোতিষ ৪
প্রাসিআ ১১
প্রাসিওই ১১
ফা-হিয়েন ৪২, ৬৪
বঙ্গ ৩, ৮, ৯*
বঙ্গভূমি ২, ৩
"বঙ্গাল" ১৬, ২০৭, ২২৬
বঙ্গাল মঠ ২০৯
বজ্রভূমি ১০
বরেন্দ্রভূমি, বরেন্দ্রী ১৭, ৮৬
বর্ধমান-ভুক্তি ৫১
বল্লালসেন ১২৬
বসন্তপাল ১১৫
বসুকল্প ২২২-২৫
বসুধারা ১৯৩
"বাক্‌কূট" ২৩৭
বাক্‌পাল ১০৫

বাচস্পতি ২১২, ৩৩৫
বাজিবৈদ্য ২০৭
বাণভট্ট ৩৬, ৬৮, ৭৬, ৯০
বাণিজ্য ও অর্থ ২৭৯-৮৫
বাসভবন ও গৃহস্থালী ২৯৩-৯৭, ৩২৪, ৩২৮
বিক্রমরাজ ১১৯
বিক্রমশীল বিহার ১১১, ১১২
বিগ্রহপাল (১) ১০৫, ১০৬
বিগ্রহপাল (২) ১০৮
বিগ্রহপাল (৩) ১১৬
বিজয়রাজ ১১৯, ১২৯
বিজয়সেন ৫৮, ৫৯
বিজয়সেন ১২৪, ১২৫-২৬, ৩৩৪-৩৫
বিত্তপাল ১২০
বিদগ্ধমুখমণ্ডন ২৩৮
বিলাসদেবী ১২৪
বিশ্বরূপসেন ১২৯, ১৩৯
বিষয়াধিকরণ ৫৫
বিষ্ণুগুপ্ত ৬৪
বীথী ২৭১
বীথ্যধিকরণ ৫৫
বীরগুণ ১১৯
বীরশ্রী ১১৮
বুদ্ধ-অবতার ১১০
বুদ্ধজ্ঞানশ্রী-মিত্র ১১২-১৩
বুদ্ধবাদীর কাহিনী ১৫৬-৫৯
বৈদিক ধর্মমত ১৪৫
বৈদ্যদেব ১০২
বৈন্যগুপ্ত ৫৯, ৬৪
বৈষ্ণব মত ১৯৪-৯৫
বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য মতের মিলন ১৭২-৭৫, ৩১৬
বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত ১৮৪-৮৫
বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবতা ১৮৫-৯৩
বৌদ্ধ দেবস্থান ১৬৫-৬৬, ৩২৪-২৭
বৌদ্ধ মত ৩৫, ৪১, ১৬০-৬৬
ব্রাহ্মণ্য মত ৩৪, ৪০
ব্রাহ্মণ্য মতে নবাগত দেবতা ১৭০-৭১
ভ-র-হ বিহার ৮৯, ১৬১
ভট্ট ভবদেব ২০৩-০৪, ৩৩৪-৩৫
ভাগ্যদেবী ১০৭
ভাদু-পরব ২২
ভানু-দত্ত ২০৬
ভাবদেবী ১০৫
ভাস্করবর্মা ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৫, ৭৯*
ভাস্করবর্মার তাম্রপট্ট ৭১-৭২, ৮৩
ভীম ১১৮, ১২০
ভীমযশাঃ ১১৯
ভূরিশ্রেষ্ঠী ১৮
ভৈরব ১৮৬
ভোজবর্মা ১২৪
ভোজন ও পান ২৮৮-৯২১
মগধ ৮
মণ্ডল ৫৪
মথন ১১৬, ১১৯, ২২১
মদনপাল ১২৩-২৪
মদনাবতী ১৩৪
"মধুকূট" ২৩৭*
মনসা ১৭০
ময়গলসীহ ১১৯
ময়নামতী ১৪০
মরুগুনাথ ৯২-৯৩
মল্লসারুল তাম্রপট্ট ৫৮-৫৯, ৩১০
মহন ১১৬, ১১৯, ১২১
মহাবীর ৪১
মহাস্থান শিলালেখ ২৩-২৬, ৩০৮
মহীপাল (১) ১১৫
মহীপাল (২) ১১৬, ১১৭
মহেন্দ্রদেব ১০৮
মাধব-কর ২০৩
মিন্‌হাজুদ্দীন সিরাজ ১২৮, ১৩৩, ৩৩৫

মুদ্রা ২৮৯-৮৪
মুহম্মদ বখ্‌ত্যার ১৩৬*
যশোধর্মা ৯৬
যান-বাহন ৩০৩-০৪, ৩২৬
যুবরাজদেব ১১৪
যোগী মত ৪০-৪১, ১৬৭-৬৯
যোগী সাধকের চিত্র ১৬৭, ৩২০
যোগেশ্বর ২৩০
যৌবনশ্রী ১১৮
রণবঙ্কমল্ল ১৪০
রণ্ণাদেবী ১০৪
রাজতরঙ্গিণী ৯৬-৯৭
রাজরাজ (ভট্ট) ৯৪
রাজশেখর ৩৯
রাজেন্দ্র চোল ১০৯, ১১৫
রাজ্যপাল ১০৪
রাজ্যপাল (১) ১০৭
রাজ্যপাল (২) ১১৭
রাজ্যশ্রী ৭৪
রাঢ়দেশ ১৭
রাঢ়ভূমি ১৭
রামকথা ২৪৯
রামচন্দ্র কবিভারতী ১৪২, ১৭৩-৭৪
রামচরিত ১১৪, ২১২
রামচরিত ১১৬, ২১৩
রামপাল ১১৬-২৩
রাম-ভজনা ১৭৬-৭৭
রায় লখ্‌মনিয়া ১২৯, ১৩৫
রুদোক ১১৮
রুদ্রশিখর ১১৯
লক্ষ্মণসেন ১২৬-২৯, ২১৩, ২১৭-১৮, ৩৩৫
লক্ষ্মীশূর ১১৯
লখনাওতী ১৩৪
লজ্জাদেবী ১০৬
লভহচন্দ্র ১০৯, ২১৩, ৩১২
ললিতাদিত্য ৯৬-৯৭
"লাল" ৯
লিপি ২৬৩
লোকনাথ ৯১, ৯২, ৩১৬, ৩২৪
লোকনাথের তাম্রপট্ট ৯১
"লো-চো-বেই-বেই" বিহার ১৬১
লোহিতগঙ্গ ১৮
লৌকিক কবিতা ২৫৫-৫৮
শকুন-বিদ্যা ২০৭
শশাঙ্ক ৬৭-৭৭
শান্তিদেব ৫৯
শাস্ত্র ও প্রয়োগ ৯৯-২০৭
শিক্ষা ২০৮-১০
শাসন-পদ্ধতি ২৭১-৭৫
শিবকথা ২৪৬-৪৭
শিবরাজদেব ১১৯, ১২০
শীলভদ্র ৯৬
শুশুনিয়া গুহালিপি ৪৬-৪৭, ৩১০
শূরপাল (১) ১০৫
শূরপাল (২) ১১৬, ১১৭
শূরপাল ১১৯
শ্রীচন্দ্র ১০৯, ১১৪
শ্রীধর ২০৩
শ্রীধরদাস ১২৭
শ্রীনগর ১৮
শ্রীহট্ট ১৬, ১৭
শ্রেণীভেদ ২৭৬-৭৮
শ্বেতবরাহস্বামী ৬০
সঙ্কনাত ১৩৬, ১৩৭, ৩৩৪
সঙ্কলন ত্রুটির কবি ২৩৬-৩৭
সঙ্ঘমিত্রের বিহার ৯৫
সদানীরা ৬
সদুক্তিকর্ণামৃত ১২৭, ২২০-২১
সন্ধ্যাকর-নন্দী ১১৬
সপ্তগ্রাম ৪৪-৪৫
সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী ১৩৩-৪২

সমতট ১৪
সমাচারদেব ৬৪
সর্বানন্দ ২০০-০১
সংক্ষিপ্তসার ২৪০, ৩৩৫
সংস্কৃত কবিতা ২৯১-১৯
সামলবর্মা ২২৪
সিদ্ধাচার্য বিরূপ ১২১
সিদ্ধিরথু, সিদ্ধিরস্তু ৮৯, ২০৮
সি-যু-কী ৭৭
সিংহবর্মা ৪৬, ৪৮
সুবর্ণদেব ১১৯, ১২৩
সুম্ভভূমি ৯
সুভাষিতরত্নকোশ ২২০
সুস্থিতবর্মা ৭১
সূর্য-পূজা ১৫১, ৩৩৩
সুহ্ম ৮, ১৯
সূর্যসেন ১৩৯
সেঙ-চি ১৬২
সেকশুভোদয়া ১২০, ১২১, ১২৪, ১২৮, ১২৮, ২০৫, ৩২২
সেন-বংশ ১২৪-২৫
সেন-বংশের লাঞ্ছন ৩১৪
সেন-রাজসভা ২২৭-২৯
সোমপুর বিহার ১১১
সোহ্‌গৌরা তাম্রপট্ট ২৬-২৮, ১৪৮
স্তূপ-পূজা ৩২৪; ৩২৬
স্থিরপাল ১১৫
হরি ১২০
হরিকাল ১৬
হরিকালদেব ১৪০*
হরিকেল ১৪০
হরিকোল ১৬
হরিবর্মা ১২৪
হরিভদ্র ১১২
হর্ষবর্ধন ৬৮, ৭২, ৭৩
হলায়ুধ ১৩০, ২০৫
হস্তশিল্প ২৬৪, ৩২৮
হিউয়েন-সাঙ ৬৮, ৬৯, ৭৩, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭-৮৬, ৯৫
হেমন্তসেন ১২৫